দেশবন্ধু রচনাসমগ্র

সম্পাদক

মণীন্দ্র দত্ত

হারাধন দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

DESHBANDHU RACHANASAMAGRA

প্রথম প্রকাশ

নববর্ষ, ১৩৬২

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত॥ তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : গৌর মজুমদার, শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, ও প্রভাস অধিকারী, স্বপ্না প্রেস, ৩৫/২/১এ, বিডন স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৬ প্রচ্ছদ : তরুণ দত্ত।

[ইংরাজী খণ্ড সহ]

প্রকাশকের নিবেদন

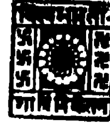
দেশবন্ধু ও দেশগৌরব চিত্তরঞ্জন দাশকে সাধারণতঃ আমরা প্রসিদ্ধ আইন-বিদ্ ও রাজনিতিবিদ হিসাবেই জানতাম। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল ও বিচিত্র অবদান রেখে গেছেন তার প্রতি মনোনিবেশ করলে এ-কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে তাঁর জীবনকাল আরও দীর্ঘায়িত হলে তাঁর রচনাসম্ভারে আরও বেশী করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যকৃতির মূল্য কতখানি ও তার মধ্যে চিরায়ত সাহিত্যের কোন অক্ষয় উপাদান আছে কিনা সেকথা বিচার করবেন সমালোচকরা। আমরা শুধু এই কথা ভেবে বিস্মিত হই যে তাঁর জীবনকালের স্বল্পতা ও অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এত সৃষ্টি সম্ভব হলো কি করে তাঁর পক্ষে।

এ বিষয়ে কিছুকাল আগে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে আমি দেশবন্ধুর প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী সকল রচনা প্রকাশের এক কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করি এবং নানাবিধ অসুবিধা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সে কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হই। আশা করি সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকবর্গের সহৃদয় আনুকুল্যে আমার এই মহতী প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে। দেশবন্ধুর সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোন রচনা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি এবং সেই সম্ভাব্য ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে পূর্ব হতেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে অশোক উপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদনার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—এ জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। আমাদের প্রকাশনার কাজে নানাভাবে যাঁরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী সুবিমল মিশ্র, বন্দিরাম চক্রবর্তী, শান্তিময় মিত্র, শংকরলাল ভট্টাচার্য্য, যামিনী আদক, সুনীল দাস, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল পাল, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ও বীরেন নাগ।

নিবেদন ইতি—নববর্ষ, ১৩৬৪

—কল্যাণব্রত দত্ত

VISVA BHARATI
SANTINIKETAN INDIA



১লা জুলাই
১৯২৫

আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্য-পালনের আদর্শমাত্র নহে; তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী মহাপ্রাণতা যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র (বাংলা)

প্রথম খণ্ড ঃ গল্প, কবিতা, গান

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রবন্ধ

কাব্যের কথা

বিবিধ প্রবন্ধ

৩য় খণ্ড ঃ রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতাবলী

দেশের কথা

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

বক্তৃতাবলী

বিবিধ

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারে ঃ
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস রজনী করে উন্মাদ আমারে !
গাহে পাখী, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে ঃ
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে !
তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ঃ
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের !
হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায় !

শেষ

ওগো আর নাই, এই শেষ !
মালঞ্চের পুষ্পরাজি
সকলি দেখেছ আজি
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ—
এই শেষ !



জন্ম : ৫ই নভেম্বর, ১৮৭০ মৃত্যু : ১৬ই জুন, ১৯২৫

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি' গেলে দান!'

—রবীন্দ্রনাথ

ডালিম

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত, কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন্ আরম্ভ হইল, কখন্ শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত। সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত, আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটি?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি,

চোখে এমন গদ্ গদ্ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয়, আর কখনও দেখিবও না।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটি খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সাম্‌নেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই শাণ-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই হাল্‌কা মনে ফুরতি করিতে গিয়াছি। সে দিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও।" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, দাদা আ—গিয়া।" একজন বলিল, "দাদা, এই লাও এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর এক জন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল— "কাঁটা বনে তুল্‌তে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল। ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল।" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, "দেখ্‌লে তারে আপন-

হারা হই।" আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন, "দাদা, হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়, কি জানি কখন্ সন্ধ্যা হয়।" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, সারেঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তবলার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোক আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতিবাগানের সুরী, পুতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক;—কিন্তু সে দিন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল "ডালিম।" একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাস্, ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা তো ওর নয়। ও যে এক কোণে স'রে ব'সে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি ক'রে লোক ধরে।" আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে-ও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনিতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল, সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দু'টি যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম একটা গাও।" আর একজন বলিল, "ডালিম ভাল গাইতে পারে না।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল,—"আমি ভাল গাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও না?" সে একটু সরিয়া আমার সাম্‌নে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সে গানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল, ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়া ছিল। চোখের জলে ভেজা

ভেজা সেই স্বর, স্বরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জলিতেছিল। সেই স্বরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল :—

"কেমন ক'রে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে॥
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখো বঁধু হিয়ায় হিয়ায়।
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্‌ব শুধু, রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে ;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখনও গান শিখেছিলে ?" সে বলিল, "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—"আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক ?" সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই গানটি আমাকে একলা এক দিন শুনাইবে ?" সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম—"এ সব তোমার ভাল লাগে ?" তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। এক জন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—"আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতা-মণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে"

আমার ত এমন কথনও হয় নাই।" সে বলিল—"ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম, তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম—"তুমি ত আমাকে চেন না।" তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল—"তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম—"জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল, ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। এ কি সেই আমি? আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এইমাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের, আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—'হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস, তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি।' কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল, যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম,—"শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে।

সে বলিল:—"আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখনও ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা

বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বয়স, তখন তিনি মারা যান। তার পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয়, ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দু'এক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির-বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ছিল। আমার শ্বাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ীর তাহা সহিল না। এক দিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিন মনে স্থির করিলাম, এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটি ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সে দিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—'আমাকে মামার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার?' সে বলিল—'কত দূর?' আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—'নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে।' আমি বলিলাম—'যতক্ষণই লাগে, আমাকে

লইয়া যাও।' এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—'আচ্ছা, তুমি এইখানে ব'স, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।' সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম, এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়া ছিল, আমার মনে হইতেছিল, তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি আমি সেখানে আর যাব না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও।' মামী কর্কশস্বরে বলিলেন, 'পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?' আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এর সঙ্গে।' মামী বলিলেন—'এ কে?' আমি বলিলাম—'জানি না।' মামী বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না।' 'আমি কোথায় যাব!' মামী বলিলেন—'গোল্লায়,' বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যে দিকে লইয়া গেল, সে দিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথা যাইবে?' সে বলিল—'কল্‌কাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—'আমাকে রক্ষা কর; আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চল।' সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল, 'আচ্ছা।' কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর

দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—'গোল্লায় যাও।' আমি ফিরিলাম, দেখিলাম, সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্‌নি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার—মনে হইল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর ?

তারপর কলিকাতায় আসিলাম। ভাবিলাম, সে কোন জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

তার পর ?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম! আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজসজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ইলেক্‌ট্রিক্‌ পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারিভরা কাপড়, বাক্সভরা টাকা।

আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু' হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশমাত্র নাই। সেই লতামণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায় ?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল, "তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে ? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না ?

আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে ? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু দিবার নাই।"

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—"আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম, জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম ? মনে হইতেছিল, আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সে দিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম, ডালিম আমার কাছে নাই। আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল, "কি বাবা, একেবারে উধাও।" আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া ?" একজন গাড়োয়ান বলিল, "হাঁ্যা বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া।" আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডালিম কোথায় থাকে ?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম, জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটি করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝি বলিল, সে শেষ রাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তে হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে,

তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম :—

"তুমি আমাকে খুঁজতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও, আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণসর্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

—ডালিম।"

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

তাহার নাম ছিল আশালতা—তাহাকে কেহ লতা, কেহ লতি বলিয়া ডাকিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার পিতা অতি শৈশবেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, ছয়মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়। আমাদের পাড়াতেই তার বাপের বাড়ী—সে সেখানেই থাকিত। দুই বৎসর বয়স হইতেই সে মাতৃ-হারা—মা কেমন সে কখনও জানে নাই। তাহার এক বৃদ্ধা বিধবা পিসীমা সেই বাড়ীতেই থাকিতেন, তাঁর কাছে থেকে সে যথেষ্ট আদর যত্ন পাইত, কিন্তু ঘোলে কি মেটে দুধের তৃষ্ণা?

বড় অভিমানী মেয়ে। আদর পাইলে গলিয়া যাইত, কিন্তু কেহ 'অলুক্ষণে' বলিয়া গালি দিলে, সে এক দৌড়ে পিসীমার কাছে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিত। কখনও কখনও বিনা কারণে হাসিত ও বিনা কারণে কাঁদিত।

তাকে কেউ বুঝিতে পারে নাই। পাড়ার সকলেই তাকে শুধু মেয়ে বলিয়াই জানিত। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। সকল রকম

দুষ্টুমিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত—ছেলেদের চেয়েও ঢের বেশী ওস্তাদ। তাহার দৌরাত্ম্যতে সকলেই কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। ভোর হইলেই একদৌড়ে তাহাদের বাড়ীর কাছে পেয়ারা বাগান, সেই বাগানে গিয়া পেয়ারা গাছের ডালের উপর উঠিয়া আর একটা ডালে ঠেসান দিয়া পেয়ারা খাইত, আর গুন্ গুন্ করিয়া গান করিত। কোথা হইতে গান শিখিল কেহ জানে না, কিন্তু গলা বড় মিঠে বড় প্রাণভরা। সমস্ত সকালটা এমনি করিয়া গাছে গাছে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। যেখানেই যাউক, একটা না একটা গণ্ডগোল হইতই হইত, কাহাকেও ভেঙচাইত, কাহাকেও কান মলিয়া কাঁদাইয়া আসিত, কাহারও সঙ্গে খুব গলা ছাড়িয়া ঝগড়া করিত; কখনও হাত কাটিয়া, কখনও কাপড় পোড়াইয়া বাড়ী ফিরিত।

আসিয়াই পুকুরে স্নান—ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিত। চিৎ, উপুড়, কাঁথা সেলাই—এইরূপ নানা রকমের সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে গলা ছাড়িয়া গান—মাঝে মাঝে আমরা অবাক্ হইয়া শুনিতাম।

তারপর দুপুরে চোখে ঘুম নাই, কেবল দুর্দ্দান্তপনা—বাগানে বাগানে একদল ছেলে লইয়া কেবল দস্যুবৃত্তি—কাঁচা আমের দিনে টোপরে একরাশ আম আর হাতে নুণ লইয়া ঘুরিত, সকল দুষ্টুমির মধ্যে চাটুনির মত কাঁচা আম দাঁতে ছিলিয়া নুণ লাগাইয়া কচ্ কচ্ করিয়া চিবাইয়া খাইত। ভাত খাবার সময় খুব কমই খাইত, কিন্তু কাঁচা আমের বেলায় একেবারে রাক্ষসী! তার পিসীমা বলিতেন, "ভাত রোচেনা রোচে মোয়া।" তিনি বড় একটা রাগ করিতেন না—মা-হারা বিধবা মেয়ে, বড় মায়া হইত। মাঝে মাঝে যখন আর সহ্য করিতে পারিতেন না, তখন বলিয়া উঠিতেন, "ওরে তুই ছেলে হলি না কেন?" চাটুয্যে মহাশয়দের বাড়ীতে একবার গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়, তারপর থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের পাড়ার বাগানে বাগানে রোজ যাত্রা হইত। কান ঝালা পালা হইয়া গেল, সকলেই জানিত দস্যি মেয়ের দল, কেহ বড় একটা ঘাঁটাইত না।

কিন্তু এমন দুর্দ্দান্ত মেয়ে সন্ধ্যা হলেই একেবারে কাবু, কখনও পিসীমার বুকে লুকাইত, কখনও ছাদের উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কি একটা অভাবনীয় করুণ রসে যেন তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। কখনও আপন মনে প্রাণ-কাঁদান গান গাহিত, কখনও চুপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

॥ ২ ॥

তখন আমার প্রায় বিশ বৎসর বয়স, শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন, আমার সংসারে আর কেহই ছিল না। একেবারে একা থাকিতাম। বাবা যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাতেই আমার চলিয়া যাইত। ছেলেবেলা হইতেই ছবি আঁকিতাম, গান বাজনাও খুব ভাল বাসিতাম, কিন্তু ছবি আঁকার মধ্যেই আমার মনটা পড়িয়া থাকিত। কেহ আমাকে শেখায় নাই, আমি আপনা-আপনিই শিখিয়াছিলাম, সমস্ত দিনই ছবি আঁকিতাম। আমার ছবি জ্ঞান ছবি ধ্যান ছিল। পাড়ার প্রবীণেরা বলিতেন, "ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল, এত লেখাপড়া শিখে একটা পাশও দিলে না, অমূল্য বাঁড়ুযোর ছেলে শেষকালে নাকি পটুয়া ? ছিঃ !" আমার তাহাতে কোনও কষ্ট হইত না, প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা একটা গর্ব, একটা আনন্দ অনুভব করিতাম। সর্ব্বদাই মনে হইত যেন কোন দেবতার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, এক রকম সন্ন্যাসীর মতনই থাকিতাম, কোন ভোগেই আমার বড় একটা আসক্তি ছিল না। সংসারে একমাত্র বন্ধন লতার পিসীমা ও লতা। লতার পিসীমাকে মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে ছেলের মতই স্নেহ করিতেন, দিনান্তে একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গোবিন্দ দাসের করচা ও বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম, আর চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেন। লতা তখন ছেলে মানুষ, মাঝে মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—আর আস্তে আস্তে প্রদীপের শলিতা বাড়াইয়া দিত। লতা বড় দুষ্টু মেয়ে কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিত। তাহার সকল দুর্দ্দান্তপনার মধ্যে যেন রসের খেলা দেখিতে পাইতাম, ভাল করিয়া বুঝিতাম না, তবুও ভাল লাগিত।

কত ছবি আঁকিতাম, নরনারী জীবজন্তু তরুলতা পাহাড় পর্ব্বত সকলই আঁকিতাম। যাহারা ছবি ভালবাসিত তাহারা বলিত—এ অনেক জন্মের তপস্যার ফল। আমার প্রাণ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইত, এই রূপ-রস-গন্ধভরা বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিরাট অচল, অটল, অনন্ত সুন্দরের প্রাণতরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যে ভাব, মনে হইত যেন ইহা আমারি আর কাহারও নহে, একমাত্র আমিই এই সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী। মনে করিতাম, এই প্রাণতরঙ্গকে বর্ণ-বন্ধ করিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া রাখিয়া দিব। তখন যে সেই প্রাণসুন্দর প্রাণারাম আমার মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেন, আমি কি ছাই দেখিতে পাইতাম ?

॥ ৩ ॥

লতা দিনে দিনে বাড়িতেছিল। একদিন তাহার সকল দুর্দ্দান্তপনার অবসান হইল, সে আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে না, বাহিরের কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না। তাহার চরণের চঞ্চলতা শুধু নয়নে নহে তরঙ্গের মত সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু কি গভীর নিশ্চল চঞ্চলতা, কি স্থির তরঙ্গের মূর্ত্তি! কিজানি কেমন জল জল দোল দোল ভাব। তাহাকে দেখিলে সে সুন্দর কিনা, কি কতখানি কি, কি রকম সুন্দর, এরকম কোন প্রশ্নই মনে উদয় হইত না। গৌর-বর্ণ, দুটি টানা টানা ডাগর চোখ সুগোল সুললিত বাহুযুগল, মাথায় এক রাশ চুল কোমর ছাড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। একবার দেখিলে চোখ ফিরান অসম্ভব, আবার দেখিতেই হইবে।

সে এখন আস্তে আস্তে কথা বলিত, কিন্তু কথায় যেন সুধা বর্ষণ করিত। এখন আর সে গলা ছাড়িয়া দিয়া গান করিত না, সর্ব্বদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিত; কিন্তু কি মন-গলান স্বর! কি প্রাণ গলান সুর! কি মধুর ভাব-স্রোত! এখন যে তাহার "যৌবন নিকুঞ্জ বনে গাহে পাখী"।

তার শরীরের শিরায় শিরায় যেন শত শত রাগ রাগিণী বাজিয়া উঠিত, সে যেন সচকিত হইয়া তাহাই শুনিত! তাহার আশে পাশে যেন শত সহস্র ফুল ফুটিয়া থাকিত, সে যেন তাহারি গন্ধে বিভোর হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত জীবন যাপন করিত! তাহার প্রাণের মধ্যে কে যেন দোলনা বাঁধিয়া দুলিত, সে যেন তন্ময় হইয়া সেই ঝুলন দেখিত! একটা অভাবনীয় ভাবে সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, সে যেন শুধু সে ভাবেরই মধ্যে অন্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

একটা দুর্দ্দমনীয় স্রোত যেন সর্ব্বদাই তাহার বুকের ভিতর বহিয়া যাইত—সে যেন সে স্রোতেরি মধ্যে গা ভাসাইয়া দিয়া কখনও ভাসিয়া যাইত, কখনও হাবু-ডুবু খাইত! আমি অবাক হইয়া দেখিতাম! মাঝে মাঝে চোখে জল আসিত, কিন্তু তাহার চোখে সে সময় জল দেখি নাই। সে যে লাবণ্যের ফুল স্রোতের তরঙ্গ, সে যে আগুনের ঝলক, ঝড়ের ঝাপ্‌টা। নিখিল বিশ্বের প্রাণে সে যেন একটা পাগলা সুর—কিছুতেই যেন স্বর গ্রামে সুর তান লয় ব্যক্ত হইয়া গীত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে যেন একটা পাগলা পাখী, দিবারাত্র পাখা ঝাপ্‌টাইত, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার উড়িবার আকাশ খুঁজিয়া পাইত না।

॥ ৪ ॥

আমার যে ছবি জ্ঞান, ছবি ধ্যান, আমি যে সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী। তোমরা হাসিও না, আমি যে তখন সত্য সত্যই তাই মনে করিয়া অপার আনন্দ পাইতাম। যেখানে ফুলটি ফুটিত, ফলটি দুলিত, গিরিশৃঙ্গ আপন মহিমায় হাসিয়া হাসিয়া উঠিত, গগনে জলদপুঞ্জ, আপনার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাকে আবৃত করিয়া ফেলিত, যেখানে সাগর আপনারি তরঙ্গের মালা আপনারি বুকে দোলাইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বহিয়া যাইত, আমি যে সেইখানে তখনই তাহাদের ছবি আঁকিয়া লইতাম। কত শিশু, বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, কত তরলিত-রত্নহারা পীবর-যৌবন-ভারাবনত দেহা, কত তন্বি-শ্যামা শিখর-দশনা-পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠি, কত জীবন মধ্যাহ্নের প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, জীবন অপরাহ্নের বৃদ্ধ বৃদ্ধা, আমার চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া বিরাজ করিত। কত সন্ন্যাসী, কত সন্ন্যাসিনী, কত দেব দেবী, কত বর্ণে বর্ণে আমার চিত্র-ফলকে ফুটিয়া উঠিত। আমি যেন স্থাবর জঙ্গম, জীব জন্তু সকলেরই প্রাণ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম। আমি মনে করিতাম আমার হৃদয় অনন্ত সুন্দরের পূজার মন্দির, আর জগৎ সংসারের রূপরাশি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ মাত্র। আমি ছবি আঁকিয়া সেই পূজার মন্দিরে অনন্ত সুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতাম।

উন্মাদের মত সমস্ত দিন ধরিয়া ছবি আঁকিতাম। ক্রমে ক্রমে মনের ভাব আরো গাঢ় হইয়া পড়িল ; কি আঁকিতাম নিজেই জানি না, তন্ময় হইয়া ছবি আঁকিতে আঁকিতে দিনগুলি কাটিয়া যাইত। মাঝে মাঝে কখনও দিনমানে একবার কখনও দুইবার কখনও বারে বারে লতাদের বাড়ী যাইতাম, আবার ফিরিয়া আসিয়া ছবি আঁকিতাম।.কি জানি কেমন একটা নেশার মধ্যে আঁকিতাম, আমার যৌবনের সকল আগ্রহ অকাতরে বিনা চেষ্টায় ছবি আঁকার মধ্যেই ঢালিয়া দিতাম।

একদিন নিশাশেষে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম—আমি যেন একটা শ্যামল বৃক্ষ আর লতা যেন সোনালি রঙ্গের লতার মত আমাকে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতেছে। তখনই প্রভাত হইল, চম্‌কাইয়া উঠিলাম, দেখিলাম আমার বুক কাঁপিতেছে, কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘরের চারিদিকে দেখি শুধু লতারি ছবি। অনেক দিন ধরিয়া শুধু লতারি ছবি আঁকিতেছিলাম। আমি ত জানিতাম না যে শুধু লতারি ছবি আঁকিতেছিলাম, যত কল্পিত মূর্ত্তি আঁকিতে-ছিলাম সব লতারি মূর্ত্তি, লতা শো'য়া লতা বসা লতা দাঁড়ান, প্রভাত সূর্য্য-করে বিভাসিত লতারি মুখমণ্ডল। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে বাগানে বেড়া ঠেসান দিয়া

দাঁড়াইয়া আছে লতা! মৃদু মধু স্বপ্নের চন্দ্রালোকে চুল এলাইয়া দিয়া, পুকুরের সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে লতা। অপরাহ্নে স্নান করিয়া জলদেবীর মত পুকুরের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে—সেও লতা! আবার দিবা দ্বিপ্রহরে সুশীতল ছায়া ঘেরা পল্লবকুঞ্জে ফুলেব পাতার উপর অর্দ্ধশায়িতা—সেও লতা! লতা যে আমাকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ছিল, আমি ত বুঝিতে পারি নাই! ঐ যে দেখি লতা ধ্যান, লতা জ্ঞান, চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হে অনন্ত-সুন্দর একি করিলে? আমি যে তোমার সন্ন্যাসী।" তখনি মনে হইল, লতাই যে সেই প্রাণ-সুন্দরের পূর্ণ বিগ্রহ! একি প্রেম ভালবাসা? ছিঃ! আমার মনে তো লতার জন্য কোন বাসনা ছিল না। একি স্নেহ? তাহাও নহে। লতা আমার অপূর্ব্ব শ্বেত-শতদল, মধুর নিষ্কলঙ্ক-কাম-বিহীন! আমি এই অপূর্ব্ব ফুলে অনন্ত সুন্দরের চরণযুগল সাজাইতেছিলাম, আমি যে আর সকল বিগ্রহ ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই নব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। তাই লতা ধ্যান, লতা জ্ঞান, আমি সেই প্রাণসুন্দরেরই সন্ন্যাসী। তোমরা হাসিও না, আমি যথার্থই তাই ভাবিতাম।

॥ ৫ ॥

লতাদের বাড়ীতে আসাযাওয়া আমার সেই রকমই চলিতে লাগিল। লতার আরও অনেক ছবি আঁকিলাম। মনে করিলাম এ দুরকমের বিগ্রহ! লতা যেন একেবারে জাগ্রত বিগ্রহ, আর ছবিগুলি যেন একই বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কখনও মনে হইত জাগ্রত, চিত্রিত—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই যেন প্রাণ-সুন্দরের ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ। আবার কখন মনে হইত এই সব মূর্ত্তিগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটি মূর্ত্তি হইয়াছে, আর তাহারই মধ্যে আমার হৃদয়-মন্দিরে যেন অনন্তসুন্দর প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে আমার প্রাণের মধ্যে আমার প্রাণ-সুন্দরের পূজা চলিল। সেই ছবিগুলি কাহাকেও দেখাইতাম না, লতাকেও দেখাই নাই। সেগুলি যেন আমার গোপন মন্ত্র। আমি যে সাধক, মন্ত্র-গুপ্তি না শিখিলে কি সাধনা সফল হয়? এক একবার খুব ইচ্ছা হইত যে শুধু লতাকেই এই ছবিগুলি দেখাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বাসনা দমন করিতাম।

লতা এতদিন একটু একটু করিয়া নিজেনিজেই লেখাপড়া শিখিত। কখন কখন আমার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইত। আমি তাহাকে পড়া বুঝাইয়া দিয়া ও তাহার ছবি আঁকিয়া পরম আনন্দ পাইতাম। জীবনটা বড় মিঠে লাগিত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

লতার পিতা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বাড়ীতে থাকিতেন, কিন্তু কাহারও সহিত বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। আমি ত রোজই সেই বাড়ীতে যাইতাম, কিন্তু দুই একবার ছাড়া কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একদিন লতা বলিল, "বাবার খুব জ্বর, বোধ হয় আর বাঁচবেন না।" আমি তাঁর ঘরে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ জ্বরে অচৈতন্য—একেবারে হুঁস্ নাই। লতার গহনা বিক্রয় করিয়া তাহার পিতার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। লতা আর কাহাকেও কিছু করিতে দিত না, সে নিজেই সেবার সব ভার লইল। স্নান আহার ঘুম সব ছাড়িয়া প্রাণ দিয়া পিতার সেবা করিতে লাগিল। এরূপ অদ্ভুত সেবা আমি আর কোথাও কখনও দেখি নাই। এ যে লতার এক নূতন মূর্ত্তি! ধীর, শান্ত, হাসি-হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করিত। আমি দেখিলাম যেন এক নবীন সন্ন্যাসিনী কোন এক কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপে প্রায় একমাসকাল কঠিন পীড়ায় ভুগিলেন। একদিন ভোর বেলা তখন তাঁর জ্ঞান ছিল, কথা কহিবার শক্তি ছিল না, লতা ওষুধের গেলাস মুখের কাছে ধরিলে তিনি মাথা নাড়িলেন, খাইলেন না। লতাকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন। তাহার মাথার উপর কোন রকমে যেন মনের জোরে আপনার শীর্ণ হাতখানি রাখিলেন। পরমুহূর্ত্তেই প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

লতার পিসীমা মাটিতে পড়িয়া "আমার লতির কি হবে গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লতা দেখিলাম বেশ শান্ত ধীর গম্ভীর। চোখে জল আসিলেই আঁচল দিয়া চোখ পুঁছিয়া ফেলে। তাহার মুখে চোখে একটা নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম। তাহার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল।

লতা পিতার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেল, ধীর শান্তভাবে মুখাগ্নি করিল। তারপর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সে কয়েকদিন লতার বড় একটা খোঁজ পাই নাই। সে যেন একটু তফাত তফাত থাকিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত তাহাকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু কাছে গেলে কোন ছুতায় সে সরিয়া যাইত। মনে হইত সে ধরা দিতে চাহে না—যেন সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন নিজের মনের ভিতর জীবনের সমস্ত আগ্রহভরে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এ'ও এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি।

শ্রাদ্ধের পরে একদিন দুপুর বেলা লতাকে যেন একটু অস্থির দেখিলাম। তাহার পিসীমা ও আমি একখানে বসিয়াছিলাম, সে সেইখানে আসিয়া বসিয়া পড়িল। সে আমাকে ছেলেবেলা হইতেই 'তুলিদাদা' বলিয়া ডাকিত।

বলিল, "তুলিদাদা, আমি কি করব? আমি ত কিছুতেই মন বাঁধতে পারছি নে—সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।" মা বলিলেন, "মা গো, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া আর কি আছে?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম; লতা মৃদুহাস্য করিল। বলিল, "আমিও কোন দিন সধবা ছিলাম না, বিধবা হইলাম কি করিয়া? আমি সধবাও নয় বিধবাও নয়, আমি যে অধবা।" সেই হাসির মধ্যে একটা অসীম বেদনার আভাস পাইলাম। তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন একটা প্রাণস্পর্শী বিদ্রূপ, একটা মর্মান্তিক বেদনার ভাব জাগিয়াছিল। আমি অবাক হইয়া নীরব রহিলাম। লতাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, "তুলিদাদা, আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শেখাও।" আমি বলিলাম, "তুমি ত লেখাপড়া জান। তুমি ত বাঙ্গলা বই সবই পড়িতে পার।" সেই বলিল, "আমি ইংরাজী সংস্কৃত সব শিখিতে চাই—আমি ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌ব।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা আমি যতটা পারি তোমাকে শেখাব।"

তারপর তাহাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইতে লাগিলাম। সে খুব সহজেই শিখিয়া লইতে লাগিল। এই রকম করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন দেখিলাম আমার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি এখনও সেই সুন্দরেরই পূজা করি, শুধু আমার চিত্রিত বিগ্রহগুলি সহজে অনায়াসে মন্দিরচ্যুত হইয়া পড়িল। এখন প্রাণসুন্দরের জীবন্ত বিগ্রহ—লতা ও তাহার নব নব মূর্তি।

॥ ৬ ॥

আমি তখন দিবানিশি মূরতি-স্রোতে ভাসিতেছি। লতার শৈশবের, প্রথম যৌবনের শত শত মূর্তি আমাকে বিভোর করিয়া রাখিত। আমি নব নব ভাবে, নব নব মন্ত্রে, নব নব বিগ্রহে আমার সেই প্রাণসুন্দরেরই পূজা করিতাম। এখন আমার অধিকাংশ সময় লতাদের বাড়ীতেই কাটিত।

একদিন বিল্বমঙ্গল নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। লতা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পড়া শেষ হইলেই বলিল, "তুলিদাদা আমাকে থিয়েটারে লইয়া যাও—আমি অভিনয় দেখিব।" সেই সঙ্গে সঙ্গেই মা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও যাইব।" আমি দুইজনকে লইয়া বিল্বমঙ্গল দেখিতে গেলাম। লতা অতি সহজেই অনেক কথা ও গান আদায় করিয়া লইল। বলিল, "কি চমৎকার! আমি আবার যাব।" তারপর অনেকবার তাহাদের লইয়া থিয়েটারে গিয়াছিলাম। লতা যাহা দেখিত তাহাই অভিনয় করিত। সব চরিত্রগুলিই একেবারে জীবন্ত-

ভাবে ফুটাইয়া তুলিত। মনে হইত লতা যেন লতা নয়, যাহা অভিনয় করিতেছে তাই। সে একেবারে তন্ময় হইয়া তাহাদেরই মধ্যে ডুবিয়া যাইত। কি অদ্ভুত সৃষ্টি! কি অপূর্ব্ব রসের স্ফূর্তি! কি জাগ্রত জীবন্ত অভিনয়! আমি সেই নব নব রসমূর্তির মধ্যেই যেন জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "হে প্রাণসুন্দর, তোমার কি মূর্ত্তির অন্ত নাই!" পরক্ষণেই মনে মনে ভাবিলাম, আমার প্রাণসুন্দর যে অনন্ত সুন্দর, তাঁহার যে অনন্ত মূর্ত্তি!

একদিন সূর্য্য ডুবু ডুবু। লতা ও আমি একখানি নূতন প্রকাশিত পুস্তক পড়িতেছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম, লতা দেখিতেছিল আর শুনিতেছিল! তখনও সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালান হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বাভাস কোমল ছায়ার মত ভাসিতেছিল। কেমন করিয়া জানি না আমাদের হাতে হাত ঠেকিল। মৃদুমন্দ মধুর বাতাসে লতার চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া আমার মুখে চোখে পড়িতে লাগিল। আমার শরীরের রক্তস্রোত যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। লতার মাথা আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল—আমি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই চৈতন্য হইল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "এ কি করিলে প্রাণসুন্দর—বাসনা কি এমন অন্তঃসলিলা হইয়া লুকাইয়া থাকে? আমার যে পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল!" লতার চক্ষু দেখিলাম—একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। শরীর অসাড়, নিশ্বাস পড়ে না। কে আমার কানে কানে বলিল "পালা, পালা।" আমি আপনাকে ছিঁড়িয়া লইয়া একদৌড়ে বাহির হইয়া পড়িলাম। চক্ষে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না, কোনরকমে একেবারে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘরে দেখিলাম প্রদীপ জ্বালা, সন্ধ্যা হইয়াছে। আমার প্রাণে অনন্ত অন্ধকার। আমি না সাধক? আমি না সন্ন্যাসী? লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এ প্রাণ আর রাখিব না। কতক্ষণ কাটিয়া গেল জানি না কোথা হইতে প্রাণে একটা বল আসিল। উঠিলাম—সব ছবিগুলি আগুনে পুড়াইলাম। কত যত্নে আঁকা কত সাধের ছবি! প্রাণসুন্দরের কত কত বিগ্রহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমি পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। তারপর প্রাণে প্রাণে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; সূর্য্য ওঠে নাই—কিন্তু তাহার রঙ্গীন আভাস বুকে করিয়া আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কোথায় গেলাম কেমন করিয়া বলিব? যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকেই চলিলাম। কত দেশ পর্য্যটন করিলাম, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিলাম। কত

পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইলাম, কত তীর্থস্থানে সন্ন্যাসী সাজিয়া বাসা বাঁধিলাম। কই যাহাকে ছাড়াইতে চাই সে ছাড়ে কই? সে যে আমার শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে নাচিয়া উঠে, সে যে আমার প্রাণে প্রাণে প্রত্যেক ভাবের মধ্যে হাসিয়া উঠে। এত বাসনা, এত চুম্বন পিপাসা, এত আলিঙ্গন লালসা, কেমন করিয়া আমার প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া ছিল আমি ত জানিতাম না! চোখ মেলিলেই সব অন্ধকার দেখিতাম, চক্ষু বুজিলেই সে যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিত! আমি যতই নিবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া নিবৃত্ত হইতে চাহিলাম, ততই যেন সাপের মত জড়াইয়া জড়াইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিত! মুখে মুখ লাগাইয়া আমার হৃদয়-শোণিত পান করিত, আমি বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতাম। আমি মুখে যতই দেবতা দেবতা বলিয়া ডাকিতাম, প্রাণের মধ্যে ততই কে যেন লতা লতা বলিয়া ডাকিয়া উঠিত, আর তাহার প্রতিধ্বনি লতা লতা বলিয়া আমাকে উপহাস করিত। সে যে রাক্ষসীর মত আমার দেহ মন প্রাণ সব গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন করিয়া একটি বৎসর চলিয়া গেল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রাণসুন্দরকে ডাকিতাম। বলিতাম "হে প্রাণসুন্দর! আমার কি কোন উপায় নাই?" কোন সাড়া পাইতাম না। আকাশে বাতাসে শুধু 'নাই নাই' ধ্বনি শুনিতাম! কষ্টে, দুঃখে, নিরাশায়, অনশনে, অনিদ্রায় আমার দেহ মন একেবারে শুখাইয়া উঠিল। আমার হৃদয় তখন শ্মশান, মহাশ্মশান! লতা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত আমার হৃদয়-শ্মশানে দিবানিশি বিকট হাস্য করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে মনে ভাবিতাম, কেন আসিলাম, আমার যে সব শ্মশান হইয়া গেল, আমি ফিরিয়া যাই! পারিলাম না, মনে মনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম প্রাণসুন্দর আমাকে লইলেন না, আমি এ নিরর্থক প্রাণ আর রাখিব না—তাঁহারই চরণে বিসর্জ্জন দিব। তখন বৃন্দাবনের কাছে একটা জায়গায় কুটীর বাঁধিয়া থাকিতাম। অদূরে যমুনা। সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, কেন আর বৃথা ভার বহন করি? গভীর রাত্রে উঠিয়া যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। কে যেন পিছন থেকে বলিল, "পাগল!" আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "পাগল!" চমকিয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কে তুমি?" আবার শুনিলাম, "পাগল!" আমি কি পাগল? এ-তো স্বপ্ন নয়! কল্পনা নয়! আবার শুনিলাম, "পাগল! পাইয়া ছাড়িতেছিস? লতা যে সত্য সত্যই প্রাণ-সুন্দরের বিগ্রহ। লতাই তোর ইষ্ট মন্ত্র। ফের, ফের, জপ কর,

ধ্যান কর।" আমি নতজানু হইয়া ডাকিলাম। বলিলাম, "তুমি যেই হও, আমার সঙ্গে প্রতারণা করিও না। এস এস আমার চোখের কাছে এস, আমি তোমাকে একবার দেখিব!" কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার সর্ব্ব শরীর তখন কাঁপিতেছিল। দূর হইতে একটা হাসির রব ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছিল।

কোথা হইতে প্রাণে বল আসিল জানি না—কে যেন আমাকে হাতে ধরিয়া ফিরাইয়া লইল। কুটীরে ফিরিলাম। লতা-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম—লতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। পাঁচ বৎসর যেন এক রাত্রির মত কাটিয়া গেল। কোথা হইতে আহার আসিত জানি না, কে খাওয়াইত জানি না, কে দেখিত জানি না। কি দেখিলাম? কি পাইলাম? কেমন করিয়া বলিব? আমি যে সব দেখিলাম, সব পাইলাম।

মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনেকদিন কাটিয়া গেল। শেষে দেখিলাম মন্ত্র দিবারাত্র আপনি চলিতেছে। একটা বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম। দেখিলাম দিনে দিনে আমার বাসনাগুলি শুষ্ক পত্রের মত আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। তারপর ধ্যান আরম্ভ করিলাম। লতার শত শত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। দিবারাত্র মূর্ত্তি-ধ্যান। চোখে আর কিছুই ভাসে না, মনে আর কিছুই আসে না, শুধু লতার শত শত মূর্ত্তি! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ছায়াময় হইয়া যাইতে লাগিল। একটা অগাধ অনন্ত ছায়া—আর তার মধ্যে যেন আমি আর শত শত লতা! ক্রমে ক্রমে সেই শত শত মূর্ত্তি মুছিয়া গেল। শুধু একটি অপূর্ব্ব আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখা দিল! সে কি লতা? সে কি দেবতা? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড টলমল করিয়া উঠিল—মন-সাগরে স্বপ্নবৎ ভাসিতে লাগিল! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ সব লুপ্ত হইয়া গেল! শরীর খসিয়া পড়িল! আমি আর আমার দেবতা, আর কেহ নাই, আর কিছু নাই! কত ভাব, কত অনুরাগ কত রসের খেলা! শুধু ভাব, শুধু রসলীলা! শুধু আনন্দে জড়াইয়া আমি আর তুমি! তুমি—কৃষ্ণ, আমি—রাধা, আমি—কৃষ্ণ, তুমি—রাধা! কি মধুর সম্ভোগ, কি অনন্ত বিরহ, কি আনন্দের লীলা! তখন বলিলাম হে প্রাণসুন্দর! কেন আমি তুমি? কেন আমি, কেন তুমি? কেন তুমি, কেন আমি? কেন এক হইয়া ব্যবধান! আমি ডুবিব ডুবিব! আমাকে তোমার মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দাও!

তারপর কোথায় গেল আমি, আর কোথায় গেল তুমি! আমি ত ডুবিলাম, প্রাণসুন্দরও ডুবিয়া গেল! শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ! আমি নাই তুমি নাই, কেহ নাই, শুধু আনন্দ! শুধু প্রেম, প্রেম, প্রেম!

সেটা কি? কেমন করিয়া বলিব? সে যে মহাভাব? দেখিতেছ না, আমার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া আছে? চোখ স্থির হইয়া আসিয়াছে? আমি যে এখনি ডুবিয়া যাইব! এই মহানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলাম। কখন একেবারে ডুবিয়া যাইতাম, কখন আমি তুমি হইয়া ভাসিয়া উঠিতাম! আমিই এক হইয়া প্রেম হইয়া যাইতাম, আবার লীলানন্দে মাতিয়া দুই হইতাম! আবার ধীরে ধীরে আপনাকে নামাইয়া আনিতাম, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় এই নিখিল বিশ্বের লীলাতরঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ পাইতাম! স্থাবর জঙ্গম জীবজন্তু সবই যে আমার মধ্যে! সকল লীলা যে আমারই লীলা! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

একদিন প্রভাতে শুনিতে পাইলাম লতা আমাকে ডাকিতেছে। দেখিলাম লতা অভিমান করিয়া আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। মনে মনে বলিলাম, "মানময়ি, আর আত্মহারা হইয়ো না—জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়ো না, আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি।

লতা যে আমার প্রাণসুন্দরের জাগ্রত বিগ্রহ।

॥ ৭ ॥

কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম "লতা দেবী" সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়ের নামজাদা অভিনেত্রী। তাহার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইল না—বরানগরের কাছে গঙ্গার ধারে। সন্ধ্যার আগেই তাহার বাড়ীতে গেলাম। লতার গলা শুনিতে পাইলাম, সে বারাণ্ডায় বসিয়া গান গাহিতেছিল। দ্বারোয়ান আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া আটকাইল না। বলিল, "খবর দেগা?" আমি বলিলাম, "নেহী"। সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলাম। গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে লতার স্বর মিশিয়া যাইতেছিল। আমি আস্তে আস্তে গিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলাম। লতা একমনে গাহিতেছিল, অনেকক্ষণ আমাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়া গান বন্ধ করিয়া দিল। বলিল, "আপনি কে? বসুন।" আমি বলিলাম, "আমি সন্ন্যাসী।" আমার পা দুখানি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলাভরা দেখিয়া লতা একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "ইনি মুখ হাত ধোবেন। এঁকে নিয়ে যা।" আমি তার সঙ্গে চলিলাম। দু'তিন খানি ঘর পার হইয়া হাত পা ধোবার ঘর—সেই ঘরে গেলাম। দেখিলাম লতার বাড়ী বাস্তবিকই বিলাস-ভবন। বাড়ীর নামও "বিলাস-ভবন"—যেমনি নাম তেমনি বাড়ী। মুখ হাত পা ধুইয়া আবার সেই বারাণ্ডায় আসিলাম। লতা গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল, আমি তাহার কাছে

একখানা চেয়ারে বসিলাম। খানিকক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করিয়া ছিলাম আমি হঠাৎ বলিলাম, "লতা আমাকে ডাকিয়াছ কেন?" সে অবাক হইয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর "তুলিদাদা তুলিদাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জল লইয়া তাহার মুখে চোখে ছিটাইলাম তার কপালে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে সে চোখ মেলিল। আবার চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমাকে ছুঁয়োনা, আমি অপবিত্র। আমি আত্মঘাতি হইতে বসিয়াছি। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে? কেন আমাকে মধুর আস্বাদ দিয়া, আমার প্রাণ-পাখীকে মধুর পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলে? আমাকে যে আধার দেবার কেহ ছিল না! তুমি কি জান না আমি শৈশব হইতে লতারই মত তোমাকে জড়াইয়া জড়াইয়া বাড়িতে-ছিলাম।" দেখিলাম, বলিতে বলিতে সে রাগে অভিমানে একেবারে ফুলিয়া উঠিয়াছে—যেন সহস্র সর্পিণী একাধারে সহস্র ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলাম, "স্থির হও।" লতা মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গের মত মস্তক নত করিল। শয্যা হইতে নামিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "লতা' আমি যে তোমার প্রেমেই সব হারাইতে বসিয়াছিলাম—আবার তোমার প্রেমেই প্রাণসুন্দরের দেখা পাইয়াছি। আমি যে তোমার ডাক শুনিয়া প্রেমের আনন্দ ঠেলিয়া ফেলিয়া তোমাকে আনন্দ দিবার জন্য আনন্দবারতা লইয়া আসিয়াছি।" লতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "অভিমানিনি! আগে তোমার সব কথা বল। তারপর তোমাকে আনন্দধামে লইয়া যাইব।"

লতা বলিতে লাগিল, "তুমি চলিয়া গেলে প্রথম ভাবিলাম আবার আসিবে। দিনের পর দিন গেল, একেবারে একা অসহায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। জীবনটা একেবারে শূন্য হইয়া গেল। খুব যত্নে পিসীমার সেবা করিতে লাগিলাম। ভূতের মত সংসারে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে শূন্য পূরণ করিতে পারিলাম না। আমার কপালগুণে পিসীমাও টেঁকিলেন না—একদিনের জ্বরে চলিয়া গেলেন। তখন তোমাকে কত ডাকিলাম, তুমি আসিলে না। তারপরে একদিন ভোর হইবার আগেই বাহির হইয়া পড়িলাম। যে থিয়েটারে এখন কাজ করি, সেই থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি চাও?" আমি বলিলাম, "আমি থিয়েটারে অভিনয় করিব।" "পারিবে?" আমি বলিলাম, "পারিব।"

তাঁহাকে গান ও দুই একটা অভিনয় করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ। খুব সুন্দর।" তারপর খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মা, এ পথে যে বড় কাঁটা।" আমি বলিলাম, "আমি কাঁটার ঘা খাইতেই আসিয়াছি।" তিনি একটু হাসিলেন।

"তারপর থেকে আমি থিয়েটারের অভিনেত্রী। আমার সমস্ত জীবনযাপন যেন স্বপ্নের মত মনে হইত। শুধু যখন অভিনয় করিতাম তখন জাগিতাম—মনে হইত তোমার কাছে অভিনয় করিতেছি। আবার থিয়েটারের বাতি নিভিলেই সব স্বপ্নের মত মনে হইত। সে স্বপ্নের মধ্যে শুধু একটা ভাব, আগুনের মত জ্বলিত—তোমার উপর রাগ ও অভিমান। আমি প্রমোদে গা ঢালিয়া দিয়াছি। কেন জান? শুধু তোমার উপর রাগ করিয়া। কেন তুমি আমায় ফেলিয়া গেলে?"

আবার দেখিলাম সে অভিমানে ফুলিতেছে, তাহার চোখ জ্বলিতেছে। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আরও শুনিতে চাও? আমি যে তোমার পরশেই ফুটিতেছিলাম। কেন আমার সব ফোটা বন্ধ করিয়া দিলে? কে যেন আগুনের অক্ষর দিয়া আমার প্রাণের মধ্যে লিখিয়া দিল, 'যার জন্য সব রাখিয়াছিলি সে যে তোকে পরিত্যাগ করিয়াছে।' আমি রাগে অপমানে অভিমানে পাগল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলাম। শুধু তোমারই জন্য যাহা ফুটিতেছিল, তুমি তুচ্ছ করিলে আমি কুকুর বিড়ালকে বাঁটিয়া দিলাম। আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া হাসিতে হাসিতে পুড়িতে লাগিলাম। আমার হৃদয় যে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল, কেউ দেখিতে পায় নাই। আমার কথা বিশ্বাস করিও। আমি প্রলোভনে পড়িয়া আত্মহারা হই নাই—আমি অভিমানে আত্মঘাতিনী—কলঙ্কিনী, পাপিষ্ঠা, আত্মঘাতিনী। কিন্তু কে আমার এ দশা করিল? তুমি! আমি ত তোমার কাছে কিছু চাই নাই! আমি যে তোমাকে শুধু দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে জীবন কাটাইতে পারিতাম। এখন—একেবারে অসহ্য হইয়াছে, তাই তোমাকে পাগলের মত ভাবিতেছিলাম।"

লতা নীরব, আর কথা বলিতে পারিতেছিল না। আবার সেই ভাব, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "না, না, তুমি ত কলঙ্কিনী নও! আমি তোমার হৃদয় দেখিতেছি, দুই একটা আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র। তোমার সমস্ত পাপ সমস্ত কলঙ্ক আমি লইলাম। আমি তোমাকে আনন্দের পথে লইয়া যাইব।" লতা যেন অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তাহার জীবনের সমস্ত নৈরাশ্য, সমস্ত তীব্রতা যেন সেই হাসির মধ্যে লাল হইয়া ফুটিয়া

উঠিল। আমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া তার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলাম। লতা চমকিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি সাধক, তোমারই সাধক। তুমি ত আপনাকে পাও নাই, আমি পাইয়াছি। কাল প্রাতে তোমার ছবি আঁকিয়া দেখাইব।"

॥ ৮ ॥

আমি সে রাত্রে ঘুমাই নাই। লতার প্রকৃত মূর্তি ধ্যান করিতেছিলাম। যে মূর্তি আমার ধ্যানের মধ্যে অনেকবার দেখিয়াছি, সে মূর্তি আবার ধ্যান করিলাম। ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল—উজ্জ্বল প্রাণসুন্দর মূর্ত্তি! এই ত প্রাণসুন্দরের বিগ্রহ, কোথায় কলঙ্ক, কোথায় কালিমা?

প্রভাত হইতে না হইতে গঙ্গায় স্নান করিলাম। ছবি আঁকিবার জিনিসপত্র আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম—সেগুলি লইয়া উপরে গেলাম। তখন সেই প্রাণসুন্দর মূর্ত্তি আমার বুকের মধ্যে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল।

লতা স্নান করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি জিনিসপত্রগুলি সাজাইয়া রং ঠিক করিলাম। তুলি হাতে করিয়া বলিলাম, "লতা, আমার দিকে চাও।" সে চাহিল—খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, "আমি যে আর চাহিয়া থাকিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আবার চাও, আবার চাও!" আমার সমস্ত শক্তি দিয়া সেই আনন্দ মূর্তি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চার করিতে লাগিলাম।

তারপর ছবি আঁকা আরম্ভ হইল। রেখায় রেখায় তাহার শরীরের কাঠাম গড়িয়া উঠিল। বর্ণে বর্ণে তাহার রং ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এইবার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলাম। স্নেহ, করুণা, মায়া মমতা, ঝলকে ঝলকে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক একবার লতা চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, "এ-তো আমি নই, এ-তো আমি নই! সন্ন্যাসি, মিথ্যা আঁকিও না! এ যে করুণাময়ী! আমি তো জন্মে কাঁদি নাই।" আমি বলিলাম, "কাঁদ নাই? শৈশবের কথা ভুলিয়া গিয়াছ। কাঁদিয়াছ, আবার কাঁদিবে। তারপর হাসিবে। আমার দিকে চাও। আবার স্থির হইয়া চাও।" তাহার পর পবিত্রতা রেখা ও বর্ণে মিলিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কলঙ্কের ছায়া শুদ্ধ পবিত্র উজ্জ্বল আলোকে মিলিয়া গেল। হৃদয়ের দাগগুলি, যাহা মুখে ছায়া-রেখার মত পড়িয়াছিল, কোথায় ভাসিয়া গেল।

আবার লতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও কি? ও কি? এ যে শুভ্র শুদ্ধ

পবিত্র কুসুম! আমি যে কলঙ্কিনী! এই ছবি যে বৃশ্চিকের মত আমাকে দংশন করিতেছে!" আমি বলিলাম, "তোমার যে সব কলঙ্ক আমি নিয়াছি। তুমি ত আর কলঙ্কিনী নও। আমার দিকে চাও, আবার চাও। তুমি এই ছবিরই মত শুভ্র সুন্দর পবিত্র।"

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "আজ থাক। আবার কাল আসিব।"

তখনও ছবিতে আনন্দমূর্ত্তি ফোটে নাই। সে রাত্রে আবার একনিষ্ঠ হইয়া তাহার আনন্দমূর্ত্তি ধ্যান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া আবার আঁকিতে লাগিলাম। এবার রেখার আঁকে আঁকে, রংএর আভায় আভায় আনন্দ ফুটিতে লাগিল। সেই সুন্দর শুদ্ধচিত্ত পবিত্র মুখের উপরে আনন্দের আভা ভাসিতে লাগিল। সখী-ভাব, দাসী-ভাব, ভক্তের আকিঞ্চন সকলই যেন মূর্ত্ত হইতে লাগিল। সেই করুণার রেখা আজি করুণারূপিণী দেবী হইয়া ফুটিয়া উঠিল! যেন সে করুণার প্রস্রবণে জগৎ ভাসাইয়া দিতে পারে। সেই স্নেহ-মমতা জননীরূপে অনন্ত মহিমায় জাগিয়া উঠিল। যেন তার রক্তের ক্ষীরধারায় জগতের ক্ষুধা মিটাইতে পারে। সেই অভিমান যাহার রেখা পুঁছিয়া দিয়াছিলাম, সেই অভিমানকে নিত্যধামে উঠাইয়া আঁকিলাম, এখন যে লতা বৃন্দাবনের মানময়ী রাধিকা। কোথায় আগের আগুন, কোথায় বিষের জ্বালা! এ যে প্রেমভরা মান, স্বার্থহীন বাসনাবিহীন উজ্জ্বল প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিল। তারপর রাধিকারই গদগদভাব ফুটাইয়া তুলিলাম। প্রেমময়ী রাধিকা অনন্ত-বিরহ-কাতরা—যেন কৃষ্ণ-অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াও কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলিয়া কাঁদিতেছে!

লতা এক একবার 'ও কে? ও কে?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। আমি কিছু না বলিয়া আঁকিতেছিলাম। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তন্ময় হইয়া আমারই ধ্যানের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিলাম। লতার প্রাণের ছবি শেষ হইল। আমি অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলাম। আমার চোখ জলে ভরিয়া গেল! তারপর প্রণাম করিয়া বলিলাম, "লতা ছবি শেষ হইয়াছে, কাছে আসিয়া দেখ, স্থির হইয়া দেখ। আপনাকে দেখিয়া লও।" লতা দেখিল। তাহার চোখে দেখিলাম নূতন ভাব ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। লতা অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "এই আমি আমি? আজি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। এই কি আমি।" তাহার কথাগুলি যেন চোখের জলে ভেজা ভেজা। আমি বলিলাম, "এই ত তোমার প্রাণের ছবি। ওই যে বাঁশীর ডাক। তুমি ত

আমাকে চাও নাই! তুমি যে জীবন ভরিয়া চাহিয়াছিলে মদনমোহনকে। ওই যে মদনমোহন! ওই যে বৃন্দাবন! ওই শুন বাঁশীর ডাক! তোমার যে শেষ অভিনয় ওইখানে!" লতা আবার ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর সেই বারাণ্ডার মেজেতে উপুড় হইয়া শুইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অস্তপ্রায় সূর্য্যের আলো কোমল হইয়া জ্বলিতেছিল। সেই রাঙ্গা কোমল আলো, তাহার চুলের উপর পিঠের উপর পায়ের উপর গৌরবের মত ছড়াইয়া পড়িল।

আমার নয়ন স্থির, তুলি হাতে সেই ছবির কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বোধ হয় আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলাম।

———

মালঞ্চ

উপহার

আসিয়াছ শুধাইতে লয়ে মধু হাসি,
নব বরষের করি মঙ্গল কামনা ঃ
নয়নে এসেছে ল'য়ে সুখ রাশি রাশি,
নির্ব্বাপিতে জীবনের জ্বলন্ত যাতনা।
রাখ মোর হস্ত 'পরে ওগো বরাঙ্গনে!
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্তখানি ;
তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী!
প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি,
সুন্দর মঙ্গলরূপে!—লুব্ধ হৃদয়ের
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অন্ধকার রাশি।
তোমারে কি দিব শুভে! কহ আজ, কহ?
মঙ্গল কামনা শত লহ তুমি লহ!

তোমার প্রেম

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভরে,
ঝলসিছে রবি-করে ;
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ
তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!

তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত!
প্রতি নিশ্বাসেই তার,
বরিষে মরণ-ধার,
আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত!
তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মত!
তোমার ও প্রেম সখি! স্বপন সমান—
সুখশ্রান্ত শশীসম মোহ-ম্রিয়মাণ!
নিশীথের অন্ধকারে,
কুসুমের গন্ধ-ভারে,
অজানিত সুখ করে হিয়া কম্পমান!
তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান!
তোমার ও প্রেম সখি! নিশি আঁধিয়ার!
তমোময় আবরণ আমার, তোমার!
কোন মোহ-আকর্ষণে,
হাতে হাত লয় টেনে—
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার!
তোমার ও প্রেম সখি! নিশি আঁধিয়ার!
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!
হৃদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায়!
তীব্র দুঃখ, তীব্র সুখ,
শান্তিহীন শ্রান্ত বুক,
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায়!
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!
তোমার ও প্রেম সখি! মৃদু মধু আলো!
কুসুম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়ালো।
কোন্ রজনীর তীরে,
কেমনে আসিল ধীরে,

নবস্ফুট প্রাণ-পরে স্বপন রাজিল !
তোমার ও প্রেম সেই মৃদু মধু আলো !
তোমার ও প্রেম সখি ! প্রবাসীর প্রায়,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভাসে কল্পনায় !
অর্দ্ধেক পরাণ হরে,
আর অর্দ্ধ থাকে ভ'রে,
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায় !
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায় !
তোমার ও প্রেম সখি ! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত, মহান্ !
হ'য়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু ;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ !
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভিখারীর প্রায়,
আমার প্রাণের কাছে কাঁদিয়া বেড়ায় !
যা ছিল সকলি খুলে,
সঁপেছি চরণ মূলে ;
তবু সেই আঁখি তুলে, বাসনা জানায় !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভিখারীর প্রায় !
তোমার ও প্রেম সখি ? অমর-জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন !
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলা ভরা ধরণীর ধূলি নিমগণ,
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত-জীবন !
তোমার ও প্রেম সখি ! মরণ সমান—
জীর্ণ শান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ !

কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট 'পর,
জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা আনিয়া নির্ব্বাণ।
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান!
তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন!
অধর, প্রশান্ত ধীর,
আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয়-তীর সৌরভ-স্বপন!
এই কাছে এসে চাও,
ওই দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ-আলিঙ্গন।
সমস্ত হৃদয় তব,
অজানিত নিত্য নব,
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন!
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন!

রাণী

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী:
নিশ্বাসে চন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবনী।
অখণ্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মূরতি,
গীত-গন্ধ বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার!
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
জ্বলন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার!

হৃদয়ের আশা তার, ভ্রমরের মত,
সৌন্দর্য্য সঙ্গীত-পুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি !
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সতত,
জীবন-নিকুঞ্জ বনে যৌবন-মঞ্জরী !
রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্ব স্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন !

জাগরণ

আমার এ প্রেম তুমি রেখ না বাঁধিয়া,
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের ;
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক্ প্রেম মরমের ।
সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ ঃ
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস,
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ ।
আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে ;
আবার লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে ।
প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান ;
আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান !

ওফিলিয়া
(OPHELIA)

বর্ণহীন শুভ্র শোভা! ম্লান মরতের
ওফিলিয়া! তুমি যেন প্রভাত শিশির!
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-ভরা কবিহৃদয়ের
ওফিলিয়া! তুমি যেন স্বপন নিশির!
ওফিলিয়া! মৃদু প্রেম তব মরমের—
কুসুম কোরক সম সুন্দর সুধীর—
শত ছিন্ন, পরশিয়া ক্ষিপ্তপ্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন নিশির!
দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক 'পরে, সুন্দর তরুণ ঃ
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ!
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনি!—
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী!

ঋণী

তুমি চাও স্বপ্ন ভরা প্রেম নিরমল,
তুমি চাও মর্ম্মপূজা রক্ত হৃদয়ের ঃ
তোমার ঐশ্বর্য্য চাই জীবন-সম্বল ;
তুমি চাও স্বর্ণ-মেঘ, ফুল নন্দনের!
ঋণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচন!
বিশ্ব-ভরা ক্ষুধা যেন ফেলেছে ঘিরিয়া—
রিক্তহস্ত, নিরুপায়, অস্থির জীবন!

জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়,
তোমরা ভুলিয়া কর মিছে অভিমান :
ভগ্ন হৃদি, দগ্ধ তনু, ধূলা মুষ্টিমেয়,
জীবন-চরণে রবে মরণের দান !
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব,
তার বেশী বৃথা আশা, মিছে কলরব।

আমার ঈশ্বর

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার !
নিষ্প্রভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; ভাঙ্গিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস ! তাই আজ ডাকিতেছি
বারে বারে, কোথা ওহে নিখিলনির্ভর !
আমার এ অর্দ্ধ অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয়।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি ! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর ? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর নর্ত্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত ?
ওহে দেব ! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু ! স্বর্ণ-করে তব।
শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মত,
কখন দেখিনি দেব ! ঘোর কৃষ্ণছায়া
সৌন্দর্য্যে তোমার। আপনারি শুভ্রতারে
করিয়া নয়ন, পূর্ণ শুভ্র হেরিতাম,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে আকুল সংসার।

প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত
সোনার শৈশব মোর, আকাশের গায়
কনক-বরণে মাখা জলদের মত,
গিয়াছে ভাসিয়া—আমারে রাখিয়া গেছে,
আশা-ভরা ভয়-ভরা পথিকের প্রায়,
জীবনের অর্দ্ধ-আলো অর্দ্ধ-অন্ধকারে!
ওই যে আসিছে আরো গাঢ় অন্ধকার!
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি!
তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তমলয়—
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু! শীতের সমীর
বহিছে ধরণী 'পরে—করিছে কুঞ্চিত
বসন্ত-সঞ্চিত সুখ, জীবন-প্রবাহ,
শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে!
এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে,
তুমি জান জগদীশ! রহস্য তাহার।
তোমারি আদেশ যদি, বল অন্তর্য্যামী!
এর পর-পারে, পড়িবে কি আঁখি 'পরে
সুন্দর—সরস—পুষ্প-পরশের মত,
নন্দনের আলো? সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম দিয়ে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহ ভরে সুবর্ণ স্বপন!
বল দেব! বলে দাও, তিমির-তরঙ্গ
করিছে আকুল মোরে গভীর গর্জ্জনে!
বল দেব! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্ন ভরা নবীন হৃদয়
নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা.; কিন্তু ওহে দেব!

আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর অপূর্ব্ব স্বপন!
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান!
আকুল অন্তরে কত সুধায়েছে দাস—
করনি উত্তর দান! মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশুসম, সেই সে কাহিনী
আবার উঠেছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধারে
কোন্ মোহ ভরে, কোন্ পাপপুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা এক বিন্দু!
দুরন্ত অনল-ভরা বিদ্রোহ অসীম,
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূটরূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে। তারি বিষে মোর
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি,
লুণ্ঠিত চরণে তব দীনের বেদনা,—
দয়া কর আজ!
বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু! তৃষ্ণার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিছে ফিরায়ে তব লৌহ বক্ষ হ'তে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রু-সিক্ত লজ্জা-নত আঁখি!
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মত।
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের

মর্ম্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে।
কেমনে শুনিবে ?—তুমি সুখের সম্রাট !
স্বর্গের রাজন্ ! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যাপ্ত
চির সুখ চির গর্ব্ব আনন্দ উজ্জ্বল !
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম
করুণাবিহীন তুমি, অনন্ত নিষ্ঠুর।
তবে সেই ভাল ; সংশয়শঙ্কিত প্রাণ,
দুরু দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা,
ছায়া-অন্ধ নিশিথের মর্ম্ম-অশ্রুজল,
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনো ব্যথা ঃ
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিষ্ঠুর সত্য ভাল
শতগুণে ! তবে সেই ভাল ; জীবনের
ভেঙ্গেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস,—
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন !
গেছ যদি, ভাল করে যাও, মুছে দাও
অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন।
তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয় তলে, গভীর—গভীর !—
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন !
তার পরে, শেষে, আনন্দ উজ্জ্বল ক'রে,
করুণা মলিন ক'রে সর্ব্ব প্রাণ ভরে',
যত্ন-করে গ'ড়ে তুলি আমার ঈশ্বর !
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

স্বপ্ন

সেই সে তামসী নিশি নির্দ্দয় নির্জ্জন,
ভাষাহীন অনন্তের রহস্যের মত ঃ
ভাঙ্গিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন,
অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত।

সহসা স্বপন সম সুন্দর নির্ম্মল,
ভাসিল আঁধার-মাঝে মানস-মূরতি ঃ—
অপূর্ব্ব অধরখানি চন্দ্র করোজ্জ্বল,
আঁখি দুটি সন্ধ্যা দীপ মঙ্গল-আরতি।

কহিল না কোনো কথা, নীরব নিশ্চল
নির্দ্দয় দেবতা সম ছিল দাঁড়াইয়া,
ভয়হীন ভাষাহীন চির-হাস্যোজ্জ্বল ;
সকল আকাঙ্ক্ষা মোর উঠিল কাঁপিয়া।

চলে গেল ঃ ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার
আকাশে আঁকিয়া গেল ঘন অন্ধকার।

প্রাণের গান

দুরাশা-কম্পিত সুরে কি গান গাহিব আর,
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বারবার।

ধ্বনিত বসন্ত তানে অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা শক্তিহীন ছিন্ন-তার।

কি যেন শুনা'তে চাই, কি যেন ফুটা'তে চাই
জন্মভরে যেন সখি ! ফুটা'তে পারি না তাই

শত পুষ্প পড়ে ঝরে', শত গীতি যায় মরে' ;
হৃদয়ের গান রহে' আমারি হৃদয় ভরে'।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
স্তম্ভিত বিজন গীতি, শুনা'তে পারি না তাই।

ধরণীর আলো লেগে, লাজে গীতি ফিরে যায়,
আপনা আবরি রাখে—যত ডাকি 'আয় আয়।'

অপূর্ব্ব বাসনা আর গীতভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলোভরা হৃদয়-মন্দির ম্লান।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর,—গাহিতে পারি না তাই।

ঘুম-ঘোর

আমি তো সঁপিনি হৃদি,
আপনি পড়েছে ঢুলে
নিশীথের ঘুম-ঘোরে
তোমারি চরণ মূলে!
মরণেরে দেব বলে
পরাণ খুঁজিনু হায়!
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
সে প্রাণ তোমারি পায়।

দিবসে

দিন্ গেল, আন সাকী! প্রমত্ত মদিরা
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র! করিলে চুম্বন—
ম্লানমুখী এ দিবসের আলোক সুধীরা
আরক্ত চঞ্চল হ'য়ে ভরিবে জীবন!

আসে পাশে যাবে ভেসে কুসুমসৌরভ,
বসন্তসঙ্গীত যাবে বন উজলিয়া ঃ
অধরে বাড়িবে তত লাবণ্য-গৌরব,
কুন্তল-ভুজঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া !
দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস ;
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ ;
কাঁপিয়া উঠিলে মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ, কোথা দুখ !
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভাল,—
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুরা ঢাল।

অহঙ্কার

তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর !
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো ! কোন্ শূন্য হতে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান ?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্ ঃ
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্ !
রক্তহীন রিক্তহস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার !
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন মরণ
চরণে দলিয়া করে মহা অত্যাচার !
কোন্ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার ?
মুছে ফেল আঁখি হ'তে মোহ-অন্ধকার ।

আকাঙ্খা

যদিও তোমারি কথা আমার জীবনে,
বসন্ত রাগিণী সম উঠেছে বাজিয়া—
যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
হৃদয়ের রক্তফুল উঠেছে ফুটিয়া !—

এ প্রাণের প্রতি ভাব-প্রমত্ত-ভ্রমর
যদিও তোমারে ঘিরি' আনন্দে গুঞ্জরে—
বসন্ত-পরশ সম স্বপনে তোমার,
যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে !—

আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে।
মধু দেহে সুখ স্পর্শ রহস্য গভীর,
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে ঃ

কোথা তুমি ? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন !

প্রেম-চতুষ্টয়

১

আজি এ তামসী নিশি ধরণী আঁধার !
কম্পিত কামনাভরে প্রমত্ত হৃদয় ঃ
মদিরার মোহ সম, ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময় !
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল তুলিছে,
তোমার কুন্তলভরা কুসুমের গন্ধ ঃ
বসন্ত-পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে,
কত কি মাধুরী তব লাজ বাস-বন্ধ !

আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,—
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ ঃ
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।
শোননা আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন ?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন।

২

শুননা কম্পিত বাণী পুষ্পিত ছলনা
কুসুমের গন্ধভরা অন্ধ হৃদয়ের !
এ নহে সুবর্ণ সুখ নন্দন-মগনা,—
এ যে শুধু অন্ধ তৃষা পূর্ণ আঁধারের !
জান না কি দেবতার আশীর্ব্বাদ-ছায়ে'
ফুটেছে অপূর্ব্ব এই প্রেম দু'জনায় ?
পরিম্লান ধরণীর ধূসর ধূলায়
এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আধার।
এ মোর স্বর্গের আশা সুন্দর দুর্ব্বল !
বাসনা-নিঃশ্বাস তুমি ফেলিও না তায় ঃ
ভয় হয়,—পাছে মোর জীবন-সম্বল
দেবতার অভিশাপে দগ্ধ হ'য়ে যায় !
যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই পা'ক্,
আঁধিরা রজনী তবে পোহাইয়া যা'ক।

৩

বসন্ত-সুন্দরতনু তরুণ দেবতা !
এসেছ জীবনতটে, লও উপহার—
প্রণয়কম্পিত দেহ মধু পুষ্প লতা,
সঘন গম্ভীর নিশি মোহান্ধ-আঁধার !

ওগো আমি আঁখিহীন, নিশীথ মন্তরে
দেখিতে পাই না তব সুখ-ভরা মুখ।
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে
রক্তসুখ রাশি রাশি, রাশি রাশি দুখ!
আমার হৃদয় দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক-অঙ্গুলি:
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,—
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়ো' না কাতরকণ্ঠে, লও সব লও!

৪

তুমি তো এসেছ কাছে অনলের মত,
সঙ্গে লয়ে' জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত ক্ষমতা!
জ্বলিছে তরুণ দেহ হৃদয় সতত,
তোমার ও প্রেমে প্রভু! নাহি কি মমতা?
আমার এ পিঞ্জরের নাহি করি ভয়,
লোকলজ্জা কলঙ্কের আছে কিবা ডর?
ভুল ক'রে বুঝিও না রমণী-হৃদয়,
মর্ম্মহীন অপমানে বাঁধিও না ঘর!
এ প্রেম আমার চক্ষে অনন্ত সুন্দর
চির পুষ্প-তনু হীন অনঙ্গের প্রায়:
ও রূপ আমার বক্ষে মদন-মন্তর
মোহ ভরে কম্পমান সবি ভেসে যায়!
তবে যে তরাসে কাঁপি এত কাছে কাছে?
এ রুদ্র রক্তের জ্বালা রহে' যায় পাছে।

ঈশ্বর

ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন !
জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া :
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন !
হায় ! হায় ! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে :
ঠেলে' ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্ত্তনাদ শুনি না শ্রবণে !
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি, মনে মনে।

স্মৃতি

সে আছিল আমাদের শান্তির স্বপন,
অতি দূর নন্দনের সৌন্দর্য্য-কাহিনী ;
রবিকর-মুখরিত প্রভাত-মগন,
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী।

আরো কত ছিল তার সৌন্দর্য্য অপার,
বলিতে অন্তর কাঁপে সুখ-দুঃখ-ভারে :
অমৃত-পরশে তার ভুলি শতবার
বুঝিতে পারি নি কভু চিনি নাই তারে।

আজ সে চলিয়া গেছে। ভাসিতেছে তার,
শান্তিভরা সুখভরা সুন্দর নয়ন।—
নবস্ফুট বসন্তের মাধুরী অপার,
শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন।

আজ সে গিয়াছে চলে'; স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব অঙ্গে ফুটিতেছে নব নব শোভা ঃ
ফুলে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার
চাঁদে চাঁদে ভাসিতেছে তারি মধুপ্রভা।

সুখ

সুরাপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্রে করেছি চুম্বন,
বুঝিয়াছি সুখ বিনা সকলি তো ফাঁকি!
আজ আমি খুলে দিব জীবন-বন্ধন ঃ
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি
অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া,
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান ঃ—
তোমার কুন্তল পাশে আমারে বাঁধিয়া,
হৃদয় ভরিয়া কর গুন গুন গান।
মধু-হস্তে ধরি' পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ মদিরা মোরা আরো করি পান ঃ
নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান!
অপেক্ষায় সুখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়া,
দেবতারা হাসে শোন গগন ভরিয়া।

ভুল

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা!
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরাণ পাগল পারা!
বিশ্ব যায় ভেসে ওরে!
কত বল্ রাখি ধরে’ ঃ
কেমনে বা রাখি ধরে’
আমি যে আপনাহারা!
আকাশে যখন চাই
শশীতারা কিছু নাই—
শুধু জাগে ওই, ওই,
তোর নয়নের তারা।

তৃষা

তোমার সৌন্দর্য্য আর মোর ভালবাসা,—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ছুই তুলনা-বিহীন ঃ
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন!
আমার সকল অঙ্গ তৃষা জর জর,
তোমার পরশে পাবে বারি বৃষ্টিদান ঃ
আমার সকল মনে শুষ্ক মর মর,
তোমার ও প্রেম হবে বসন্তের গান।
ওগো! তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায় ঃ

যদি তুমি নাই এস, সুদূরে হাসিয়া
বরিষ স্বপন ধারা সুদীর্ঘ-সন্ধ্যায় !
আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।

সান্ধ্য সাগরে

আজ কেন মনে আসে
দুটি আঁখিভরা বাসে
মধুর মূরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া ?
কে তুমি ডাকিছ মোরে,
সমস্ত হৃদয় ভ'রে ?
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।
কে তুমি এসেছ কাছে,
হৃদয়ের পাছে পাছে
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান ?
আজি কেন, আজি কেন
আকুল পরাণ হেন ?—
শত ধারা ভাঙ্গি' যেন যাইবে ছুটিয়া !
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।

চিরদিন

রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেম ভরা অশ্রু ভরা বিষাদ-চুম্বন :
সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছে চিরস্মৃতি সজল নয়ন।

সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে ধূসর গগন,
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ;
পরিপূর্ণ শুভ্র রাত্রি জোছনা-মগন,
তোমারি মলিন ছায়ে হাসি যায় থেমে।
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে।
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতন :
সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন।
দুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু-স্মৃতি স্বপনের ভুল।

পূর্ণিমা

সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার !
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার !
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙ্গেছ জীবন বাঁধ
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার !
সতত সরস হাসি অধরে তোমার !

সতত সরস হাসি বসন্ত আমার !—
পুষ্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার
আমি গীতি তুমি ছাঁদ—
পেতেছ মোহন ফাঁদ,—
বেঁধেছ কুসুম-ডোরে জীবন আমার !
সতত সরস হাসি নয়নে তোমার।

ও মধু সরস হাসি শরদ প্রভাত !
তুলেছি কুসুমরাশি ভরিয়া দু'হাত !
মধুর সরস গানে
মাধুরী ভাসিছে প্রাণে,
মরম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত !
তোমার সরস হাসি শরদ প্রভাত !

হায় প্রিয়ে ! হাস হাস ভরিয়া গগন ।
জীবন মরণ তব হাসিতে মগন ।
হাস আর হাস হাস,
জোছনা-সাগরে ভাস,
অধর হাসুক তব হাসুক নয়ন !
মদির জোছনা হৃদি করিছে চয়ন ।

সে

সে !— এসেছিল, কেঁদেছিল,
বসেছিল কাছে
ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে ।
আঁখি তুলে চেয়েছিল
ভেসে আঁখি-জলে ঃ
মুখ খুলে থেমে গেল
আধ খানি বলে' ।
এক বিন্দু হাসি তার
ঠোঁটে লেগেছিল,
ভাল করে দেখি নাই
কোথা মিলাইল !

দুটি হাত ধরে' মোর
কি যে ভেবেছিল,
"বিদায়" বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।
সেই যে গিয়াছে চলে'
আর আসে নাই—
সেই চেয়েছিল চোখে
আর চাহে নাই।
পথ পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে ?
উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে ?

জোছনা

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী !
প্রেমময়ী সুধাময়ী !
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া !—
সায়াহ্ন-সঙ্গীত তালে,
পুষ্পিত প্রদোষকালে,
স্বপ্ন-ভরা রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়া।
স্বপ্নময় চন্দ্রমার
রজত-কিরণধার,
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব প্রেয়সি আমার !
শান্তি-ভরা ঘুম ঘোর
নয়নে আসিবে মোর
জীবনের যত জ্বালা ভুলিব আবার।

ক্রন্দন

এ দেহ পুষ্পের মত
ওহে প্রাণপ্রিয় !—
সর্ব্বদা বসন্ত চাহে,
চাহে রবিকর !
তোমার পরশ-স্বপ্ন,
চুম্বন-অমিয়,
এ তনু লাবণ্য পারে
করিতে অমর !
প্রভাত-চুম্বিত ছিনু—
প্রফুল্ল পুষ্পিত,
বিশুষ্ক মলিন আজি—
গত গন্ধ প্রায় !
তোমার চুম্বন শূন্য
অরুণ—অতীত,
ও সুখ-পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায় ?
আমার লাগিয়া আমি
করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি
যত ব্যথা পাই :
লাবণ্য হারায় যদি
বিপন্ন বদন,
ও প্রেম নন্দন তব
পাই কি না পাই !
প্রিয় ! এ ক্রন্দন তাই

সোঽহং

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !—
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার :
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার!
জ্ঞান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত
নিতান্ত নিষ্ফল হেথা মানবের প্রাণ ?
যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
শত আবরণে আপনারে মূর্ত্তিমান।
কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা ?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা ?

সাগরে

চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল :
আর্দ্র বায়ু বহে' যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল
জীবন বিজন বড় ; বিশ্বব্যাপী ব্যথা—
বুঝাবার জুড়াবার নাহি কোন ঠাঁই।
অভিশপ্ত প্রাণ লয়ে জন্মিয়াছি হেথা,
অনন্ত বাসনা শুধু চাই! চাই! চাই!

তাপসী

শুনেছি আহ্বান তব ওহে প্রাণপ্রিয় !
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া ঃ
ছিন্ন করি' আশা-পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া ।
বিভূতি মেখেছি হের সর্ব্বাঙ্গে আমার
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ ঃ
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার
রাগে রাঙ্গা জবা সম রক্ত অনুরাগ ।
কবিতা কল্পনা ছিল, পূর্ণ শশীসম
জীবন আঁধারে মোর জোছনা ঢালিয়া ঃ
মধু নিশি শেষ হ'ল ! স্বপ্ন মনোরম
জীবন ত্যজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া ।
এ চির বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে,
তরুণ হৃদয় মোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া ঃ
শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙ্গেছে,
রচেছি পূজার ডালি হৃদি-রক্ত দিয়া ।
ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান,
আমার হৃদয়-তল উঠেছে কাঁপিয়া ঃ
সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া ।

সাগর-তীরে

ফেলিয়া এসেছি দূরে জীবন-জনতা,
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহল ঃ
হেথা শুধু আকাশের সুনীল বারতা,
গম্ভীর সাগর-গীতি, স্তব্ধ ধরাতল ।

সৌম্য শান্ত সান্ধ্যছায়া পড়েছে সাগরে,
গগনে ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়া ঃ
আঁধারের মাঝে আজি কোন্ মোহভরে
স্বপ্নময়ী স্মৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়া।
সেই, এমনি সায়াহ্ন আকাশের তলে,
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাঁড়াইয়া ঃ—
সহসা অধরে তব যেন কোন্ ছলে
বিমল বিহ্বল হাসি উঠিল ভাসিয়া।
কি জানি কেমন ক'রে সে হাসি তোমার
আঁধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়া ঃ
শত লক্ষ কুসুমের পরশে আমার
বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া।
আর সেই ? সেই নিশি, স্বপন-মগন ?
শশীকর পড়েছিল অধরে তোমার ঃ—
দুটি হাতে হাত আর নয়নে নয়ন,
তার পরে ছাড়াছাড়ি হ'ল দু'জনার।
আজ তুমি এত দূরে ? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দু'জনার ঃ
ও পারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মত,—
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

বিফল ভিক্ষা

এত টুকু চেয়েছিনু, এত টুকু মধু,
এত ধন আছে তব ওহে প্রাণবঁধু!
কিছু দিতে নাই ?
মলিন নয়ন দুটি স্বপনের সিন্ধু,
চেয়েছিনু তাহারই কৃপাদৃষ্টিবিন্দু,
পেয়েছি কি তাই ?

তোমার পরশ স্বর্ণ—সুধা-পারাবার
একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তায়,
ফুরা'ত কি ছাই?
সঞ্চিত অঞ্চলতলে কত শত নিধি,
একটি দিলে না তায়? তোমারে কি বিধি
দয়া দেন নাই?
পাশ দিয়ে চলে গেলে, সুবাস ঢালিলে
চকিত পরাণ খানি চরণে দলিলে,
ভাল ভাল তাই!

লালসা

সুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব,
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা!
তোমার পবিত্র হৃদি,
প্রশান্ত অর্ণব :
আমার এ প্রেম যেন
তরঙ্গিত আশা!
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া :
তুমি যে সুন্দর, তুমি
তরঙ্গের ঘায়,
ক্ষীণ তৃণ দল সম
যাইবে ভাসিয়া।
আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল,
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল!
আর আসিও না কাছে,
কি জানিগো পাছে
দগ্ধ হ'য়ে যাও তুমি
শুভ্র শতদল।

গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন !
তোমার বদনে চক্ষে সুন্দর তরুণা !
বন্ধ গীতি সান্ধ্য ছায়ে !
কি জানিগো কেন ?—
এ মরু মরমে মোর
কাঁদিছে করুণা ।
তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি !
তোমার ও দেহ-মন—
কুসুম-চয়নে,
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা জানি ।
সুন্দর মরমভরা শুভ্র তনু লখি,'
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা !
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি !
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা ।

মোনা

সে দিন ভাসিয়া গেছে
কি জানি কেমন ?
বসন্ত মলয়ে মন্দ
আন্দোলিত ফুলগন্ধ
হৃদয় ললিত ছন্দ
ব্যাপ্ত দশ দিশি ।

সে দিন চরণে তব
করিল চুম্বন
মোর প্রাণ হ'তে বালা !—
প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা
রক্ত সুখ রক্ত জ্বালা
সর্ব্ব দিবানিশি !

আর কেন ? গেছে প্রেম
মিছে আনাগোনা।
অধরে ভাসিলে হাসি
জেনো প্রতারণা !
"নয়নে অনল শুধু
সত্যের ছলনা"
আজ মোনা !

বিগত বসন্ত ভ'রে
এ প্রেম অতিথি
আনি পূর্ণ ভালবাসা
জাগাইয়া স্বর্ণ আশা
জীবনে বাঁধিয়া বাসা
করিল বসতি !
স্বপ্ন রথে ল'য়ে গেল
হইয়া সারথি !

বসন্ত কি আছে আর
কোথা অমৃতের ধার
কোথা প্রাণে পুষ্পভার
কোথা স্বপ্নভাতি ?
আমি পূর্ণ ঘুমে, তুমি
নিতান্ত জাগিয়া :

সেই বসন্তের নিশি
    ম্লান চন্দ্র দিয়া
আধ অশ্রু আধ হাসি
    আধ জানা শোনা
        নাই মোনা !

অনন্ত সুন্দরী ছিলে
    বসন্ত-নিশায় ;
বাসনাবিহীন হাসি
শুভ্র শেফালিকা রাশি
তোমার অধরে ভাসি
    শীত চন্দ্র প্রায় !

চরণে আনিয়া প্রাণ
সকলি করিনু দান
গরল করিনু পান
    প্রেম পিপাসায়
চিরস্মরণীয় সেই
    বসন্ত-নিশায় ।

লভিনু অবজ্ঞাদৃষ্টি
সুখহীন সব সৃষ্টি
জীবনে অনল বৃষ্টি
    মৃগতৃষ্ণিকায় ।

তুমি আজ আকাঙ্ক্ষিণী
নব প্রেমানুরাগিণী
অশ্রুভরা ভিখারিণী
    মলিন-আননা—
আজ তব হাসি ভাসে,
আমি হেরি অনায়াসে

প্রাণে পুরে শুধু আসে
অতীত কল্পনা!

আজ তুমি ঘুমে, আমি
নয়ন মেলিয়া
"প্রেম তো বিদ্রূপ শুধু"
গেছ কি ভুলিয়া?
বসন্তের শেষে কেন
নব প্রতারণা?
ছি ছি মোনা!

তোমার আমার মাঝে
রয়েছে পড়িয়া—
নিষ্ফল স্বপন, আর
শত শুষ্ক ফুল ভার
কত রক্ত লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি!

কেমনে ফুটিবে আজি
দলিত কুসুমরাজি:
কেমনে উঠিবে বাজি
সেই সুখ বাঁশি?

তোমার আমার মাঝে
যেতেছে বহিয়া
বিস্তৃত বিস্মৃতি বারি;
এ পাড়ে দাঁড়ায়ে তারি
আমি পরশিতে নারি
গত স্বপ্নরাশি!

সতৃষ্ণ নয়নে চাও
চুম্ব উড়াইয়া—

যদি আজ এসে পড়ে
তৃষাতুর মোহভরে
আমায় জীবন 'পরে
তব চুম্ব হাসি !

অধরে কি তপ্ত লাগে
ফোটে প্রেম রক্ত রাগে
আবার জীবনে জাগে
প্রেম পুষ্পরাশি ?

আজ বৃথা অভিসার
মিছে প্রতারণা,
নাহি প্রাণে হাহাকার
অবোধ বাসনা !

মায়া মোহ সবি গেছে ;
এ নব ছলনা
মিছে মোনা !

চাও যদি কর তবে
চুম্বন প্রদান :
গাও প্রত্যাশিত তানে
কও কথা কানে কানে
আমার শীতের প্রাণে
সকলি সমান !

জীবনে অনল নাই
আছে বাসনার ছাই
প্রাণ শুধু করে তাই
পরিহাস পান।

দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন
জীবনে আবার

প্রেমমায়া উপবন
নহে সৃজিবায়।
কি ভুল আনিবে তবে
কি নব ছলনা ?
আজ মোনা!

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট্,
শরদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা :—
কিম্বা কবি! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট!
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি!
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি!
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অন্য পানে রাঙ্গা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহ ভরা ভিখারী সনেট্।

ধার্ম্মিক

শুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় :
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত ধরণী
আহা! আহা! বলি তব চরণে লুটায়

ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া !
ওহে সাধু ! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায় ।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ ।

অভিসার

কেমনে আসিনু ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে
বিজনে শুনিতেছিনু বিশ্বের বারতা ঃ
আসিল অপূর্ব্ব প্রেম মোহ মন্ত্র ভরে,
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথা !
ভাল করে বুঝি নাই ! প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্তে হ'ল আনন্দসঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ;
বাহু, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার,
খুলিল দুয়ার ! আমার তৃষিত চক্ষে
জাগিয়া তোমারি মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে,
মস্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনন্ত অম্বর !
তার পর ? সবি স্বপ্ন অনল বরণ ঃ
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ ?

সাক্ষী

তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের,
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়া :
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা দুঃখ-শয়নের
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া।—
দেহের পরশ থাকে দেহের সীমায়,
অধরের চুম্ব যায় অধরে মরিয়া :
আমার এ প্রাণ শুধু তোমা পানে ধায়,
তোমারি সুবর্ণ প্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া!
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্ম্মল,
প্রতি নিমেষের তুমি গভীর বিষাদ :
পরাধীন তনু বলে হে প্রাণ-সম্বল!
চরণে করেছি কিগো চির অপরাধ ?
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন
কত সুখে কত দুঃখে তোমাতে মগন।

বিদায়

তোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর,
তোমারি দরশ তরে তৃষার্ত্ত নয়ন :
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মদির,
স্বপ্নালসে করি যেন কুসুম চয়ন।
সন্ধ্যাকালে শূন্যমনে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন!
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়,
সুন্দর হৃদয় রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন।
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন,
কষ্ট ক'রে আসিও না দিতেছি বিদায় :

পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করিও ভ্রমণ
নিত্য নব মাধুরীর পল্লবিত ছায় !
তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের বায়,
রেখে যেও সব-শূন্য চির হায় হায় !

প্রেমপরিহাস

সে দিন ধরণী ছিল নন্দন কানন,
বসন্ত পবন অঙ্গে, পুষ্পোজ্জল হিয়া !
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জল মধু আঁখি—পূর্ণ উজলিয়া !
মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পান !
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান ।
আমার কি দোষ বল ? দেবতা নির্দ্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেমপরিহাস !
দুদিনের ভুল ভাঙ্গি, জাগিল হৃদয়
শত ছিদ্র সর্ব্বাঙ্গের সুখস্বপ্ন-বাস !
সে রত্ন হারায়ে গেছে কি করিব বল ?
তোমার নয়নে অশ্রু নিতান্ত নিষ্ফল !

রক্তগোলাপের প্রতি

কোন্ দেবতার ছিলি আকুল ক্রন্দন,
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা ?
কোন্ মহাপ্রণয়ের নিষ্ঠুর বন্ধন,
অলক্ত চুম্বন আর অমৃত-মগনা !

কোন্ পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের দাগ—
নন্দনের শুভ চিহ্ন সুরক্ত স্মরণ!
কোন্ কিন্নরীর ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ—
কোন্ অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ?
সহসা আসিলি যেন নন্দন ছাড়িয়া—
সুরাসিক্ত স্বপনের অস্ফুট আভাস!
জগত কমল বনে উঠিল বাজিয়া
প্রভাত রাগিণীসম বিহ্বল বিভাস!
কবিতা সঙ্গীত সবি অসার তুলনা!
এ মনে মদিরা তুই রক্তিম ভূষণা।

বারবিলাসিনী

শুন আমি বারবিলাসিনী!
নিশীথে পিপাসা হরা,
প্রাণহীন প্রেমভরা :
পদতলে উন্মাদ ধরণী,—
লালসা চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী!
আমি শুধু বারবিলাসিনী!
রঞ্জিয়াছি অধর আমার!
কোমল বিচিত্র রাগে
আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে মিশে—মধু পুষ্পসার!
রমণীয় অধর আমার!
মধু অঙ্গ 'পরে নীলবাস,
নীল গগনের মত,
নীল স্বপ্ন বিজড়িত,
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ—

চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ,
আবরিছে তনু নীলবাস।
শুভ্র রক্ত চরণ দুখানি!

কনক কিঙ্কিণী হাতে,
কনক কিরীট মাথে,
রজনীর রাজ্যে আমি রাণী—
ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রাণী!
পুষ্পসম চরণ দুখানি!

এস পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী!
চরণে লেগেছে পঙ্ক,
প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক:
এস পান্থ! আঁধিরা রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী!
এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!

অধর-চুম্বন কর পান!
তরঙ্গিত তনু ভ'রে,
সব মধু লও হ'রে,
আছে যত পুষ্প হাসি গান!
তৃষাহীন নিশা মোর কর অবসান,
অধর চুম্বন করি পান!

অঙ্গের পরশ লও টানি,
করিয়া বসন তব
পাও সুখ নব নব:
লাজহীন প্রেম-ভরা বাণী,
আঁধারে শুনিও মোর প্রেম-ভরা বাণী!—
অঙ্গের পরশ নিও টানি।

যাহা আছে সব লও তুলে !
রেখে যেও রক্ত জ্বালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা ;
রজনী প্রভাতে যেও ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হলে সব যেয়ো ভুলে
আমার সকলি লও তুলে ।

কিবা ভয় ? রজনী আঁধার !
কলঙ্ক কম্পিত দেহে,
অধীর প্রমত্ত গেহে,
কাটিবে গো রজনী তোমার !—
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমার ঃ
কোথা ভয় ? সকলি আঁধার ।

তুমি যেও এলে ঊষারাণী
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাসে ঃ
রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেও রজনীর কলঙ্ককাহিনী
শুধু আমি র'ব কলঙ্কিনী ।

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া
পরেছি পুষ্পিত শিরে !
এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্ম্মহীন আবেগ লইয়া—
তোমার কম্পিত তনু—আবেগ লইয়া
আমি রব কলঙ্ক বহিয়া ।

চারিদিকে শত পুষ্পরাশি,
করি গন্ধ বিতরণ,—
মোহিতেছে বিশ্বজন !

আমিও যে, সবারে বিলাসি—
সুমন্দ সুগন্ধ আনি সবারে বিলাসি
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি !

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর !
নাহি সুখ নাহি লজ্জা,
জীবন বিলাস সজ্জা
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর—
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম ঘোর !
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর !

নাহি স্মৃতি, জীবন ব্যাপিয়া,
নাহি কোন অনুতাপ ঃ
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া—
দিবস রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া ।
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া !

আছে রূপ, বিশ্ব-বিমোহন !
পূর্ণ রক্ত শতদল
প্রস্ফুটিত ঢল ঢল,
গন্ধ তার কর আহরণ !
মত্ত মধুকর সম, করি আহরণ,
লও রূপ বিশ্ব-বিমোহন !

আমি যেন চিরদিন ঋণী !
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হ'য়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী !—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী !
কে করেছে মোরে চিরঋণী !

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী !
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক-বাহিনী !
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী !
চিরদিন যৌবনে যোগিনী !

কার অভিশাপে নাহি জানি !
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী !
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী !
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী ।

মুক্তি

তব প্রেম অত্যাচার হ'তে হে সুন্দরি !
লভিয়াছি মুক্তি আজ ! চুম্বনে কাঁপিত
প্রতি দিবা কৌতূহলে ; আনন্দে জাগিত
চির নিদ্রাহীন শত সচন্দ্র শর্ব্বরী,
হে সুন্দরী
শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন
নিশীথের স্বপ্ন ভাতি দিবসে ভাবনা
নির্ভাবনা ?
দুরন্ত জীবন আজ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া
উন্মাদ আনন্দ সুরা করিয়াছে পান :
তোমার রাজত্ব করি পূর্ণ অবসান

আপন আবেগে আজ যাবে কি জলিয়া
দেহ হিয়া ?

অপসৃত প্রাণ হ'তে চিরবন্দনীয়
নির্দ্দয় পরশ তব রক্ত চরণের :
বিদ্যুৎ দরশ তব নক্ত নয়নের
ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয়
চির-প্রিয় !

সুন্দর চরণাঘাতে কম্প্র হৃদি'পরে
ফুটে না কুসুমদল মদগন্ধভরা :
পাগল কুন্তল আর আঁধারে না ধরা !
যে স্বর্ণ সৌন্দর্য্যে ছিল প্রাণ পূর্ণ করে,
গেছে ঝরে !

করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরসুন্দরি !
জনমের মত তুমি যাও তবে চলে :
জীবন ঢালিয়া মোর বিস্মৃতির কোলে
আপনারি কাছে রব দিবসশর্ব্বরী,
হে সুন্দরি !

অভিশাপ

কত যুগ যুগান্তর দিবস রজনী ধ'রে
বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রুজল-পরিপূর্ণ
অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদ্বারে
হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা
মস্তক আনত !

শুনেছে কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণসিংহাসনে
চিরানন্দ মাঝে ?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে ?
শান্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু
মর্ম্ম-উপহার,
জানে নাই সব স্বর্গ রুধিয়া আছিল এক
নির্ম্মম দুয়ার !
একদা প্রশান্ত সন্ধ্যা করুণার প্রাণরূপী
আঁধার বরণ—
দেবতার হাস্য মাঝে আসিল, সচন্দ্র রাত্রে
মেঘের মতন,
মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধূলি-লিপ্ত
ধূসর চরণ
রাখিলা নন্দন 'পরে শ্রান্ত ছায়াঞ্চল টানি
আনম্র নয়ন।
শিহরিল সুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভরা
সুরেন্দ্রের মন,
শীতের নিশ্বাস লাগি সহসা শিহরে যথা
পুষ্প-উপবন।
স্বর্গের রাজন্ কহে ডাকি সর্ব্ব সুরলোক
হে নন্দনবাসি !
শ্রান্ত এ হৃদয়ে মোর কেমনে বাজিল আজ
সান্ধ্য রূপরাশি ?
নিষ্ফল স্বর্গের শোভা অনন্ত বসন্ত ভাল
নাহি লাগে আর—
নব নব জগতের পরশ লভিব আজি—
আকাঙ্ক্ষা আমার !

দেবেন্দ্রের আজ্ঞামত প্রহরী খুলিয়া দিল
স্বর্গের দুয়ার,
বসন্তের বায়ু'পরে পারিজাত বরষিল
পরিমলভার !
নিশীথের সাথে সাথে কনক-প্রদীপ শত
জ্বলিলে নন্দনে,
সকল নন্দন আসি একত্র মিলিল যেন
প্রমোদ বন্ধনে !
বসি স্বর্ণসিংহাসনে সুধা-হস্তে স্বর্গপতি
সৌন্দর্য্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে, অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত !
হেন কালে হু হু ক'রে আসিল ঝটিকা, আৰ্ত্ত
ক্রন্দনের মত
বহিয়া জগৎ হ'তে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত !
থেমে গেল নৃত্যগীত ! সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বরগ-সঞ্চিত,
নিমেষে টুটিয়া গিয়া আপনার মোহ হতে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন,
যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার-পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।
অনন্ত গগন-ভরা বৃহৎ বিহঙ্গ যেন
পক্ষ প্রকম্পিয়া
শান্ত করিবারে চায় মর্ম্মভরা ব্যাকুলতা
শান্তিহীন হিয়া !

তেমতি কাঁপিল স্বর্গ ! দেবতার দীর্ঘশ্বাস
ভগ্ন হৃদি-ভরা
শ্মশানে ঝটিকা সম বহিল ভীষণ ভাবে
সুখ-শান্তি-হরা ।
তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দনস্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে কূলে নত শির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া !
পরদিন স্বর্গপুরে সুপ্রসন্ন সূর্য্যকর
সুবর্ণ ঝলকে
চুম্বিল সকল স্বর্গ, চুম্বিল সুরেন্দ্র হৃদি
চঞ্চল পুলকে !
বিষণ্ণ নন্দনপতি হস্তস্থিত সুধাপাত্র
ফেলি' দিয়া দূরে,
বাজাইলা স্বর্ণ ভেরী আহ্বানিয়া সুরসভা
সুপ্ত সুরপুরে ।
বিষাদ কম্পিত কণ্ঠে কহিল স্বর্গের রাজা—
হে নন্দনবাসি !
আজি হতে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান
শত উচ্চ হাসি ।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এতদিন
ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার ।
হায় স্বর্গ ! হায় ধরা ! বন্দী আমি আপনার
নিয়মকারায়,
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র
কোথায় হারায় ?—

সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হ'তে আসে দুঃখ
মলিন-বরণ ?
জীবনের সাথে সাথে কোথা হ'তে এল ভেসে
অবাধ্য মরণ ?
কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী ! তব তীব্র আর্তনাদ
বজ্রশেল সম,
সহস্র সম্ভোগ ভরা কম্পিত এ স্বর্গধামে
বাজে মর্ম্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি
পূর্ণ পরাধীন ঃ
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
স'ব চিরদিন !
স্বর্গ সহচরগণ ! আজি হ'তে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্ম্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখ তান !
চির অশ্রুজল চ'খে জাগিয়া রহিব ল'য়ে
পূর্ণ পরিতাপ,
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ !

ঊষা

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা !
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন,
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা ?
ললিত রাগিনী দিয়ে রঞ্জিলে গগন !

তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ঃ
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল নয়নে !
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি'পরে কুসুমিত কেশ ঃ
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দভরা,—রজনীর শেষ !
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল !

কল্পনা

তোমারে পাবনা জানি ! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনা পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা ঃ
অন্তরের কানে কানে মোহ মন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র জল্পনা ।
যদি কোন দিন আমি মুহূর্ত্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্য্যের ছায়,—
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহ ভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায় !—
কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় ঃ
আমার অন্তরতলে শত পুষ্প ফোটে
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায় !
এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ ?

নিশীথে

নূপুর খুলিয়া লও!
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা
যদি এই অৰ্দ্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মৰ্ম্ম-কাতরতা।
কৌতূহল পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা পড়ে যায়ঃ
যদি নব প্রস্ফুটিত এ প্রেম পবনে
দুজনার সৰ্ব্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায়?

দুঃখ

তোমারে চিনেছি দুঃখ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূৰ্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্ব সুখ হ'তে! সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ পুষ্প শত!
অধরচুম্বনছলে রক্ত কর পান—,
নিঃশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।
সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা!
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমার ঃ
সৰ্ব্বদা করেছি পান ওগো তৃষাতুরা!—
আশাভয় প্রেম সুখ সৰ্ব্বস্ব আমার!
অন্তরে জ্বলিছে চির চুম্বন তোমার,
অনন্ত সুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার।

সুখ

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্যভাতি :
ক স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি।
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক !
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়া :
কুসুম দুর্ব্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া !
অপ্সরার বক্ষ ভ'রে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ :
নির্ম্মমের মত হেথা ছদ্মবেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ !
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্র বন্দিত !

জীবনের গান

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি !
সুন্দর সূর্য্যের আলো
চরাচর চক্ষে,
সুমন্দ বসন্ত বায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি
সুবসন্তে আজি !

চারিদিকে সুবর্ণ স্বপন !
এমন বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায় ?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণ বরণ
জীবন মরণ ।

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর !
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধ ভার ঃ
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর !

আসে নেমে যশ সুরাঙ্গনা !
গগনে ফুটিছে পুষ্প
চরণ আভাসে,
আমারে বাঁধিছে যেন
শত পুষ্প পাশে
স্মিত-হাস্যে প্রফুল্ল-আননা—
সহস্র সৌন্দর্য ভরা চিরশুভ্রাননা
যশ সুরাঙ্গনা ।

পরিপূর্ণ সুবর্ণ নেশায়
আসিছে হাসিছে আশা
শত স্বপ্ন রাণী !—

ঢালিছে আমারি কর্ণে
আর স্বর্ণ বাণী ঃ
হস্তে তার মদপাত্র ভায়,—
সে মদ চুম্বিয়া হৃদি কি যে গীত গায়
সুবর্ণ নেশায় !
প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে !
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলিছে চরণ ঃ
আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত-বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে।
আমি রাজা, সকলি আমার !
আনন্দিত তৃণ 'পরে
দাঁড়াইয়া আমি,
চরণে প্রশান্ত ধারা
আমি তার স্বামী ;
দূর হ'তে গগন অপার
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার,
ইঙ্গিতে আমার !
ওগো এস এস কাছে মোর।
অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে
বিলাইতে চাই,
অনন্ত জীবন আজি—
তারি গান গাই ;
তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর,
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর ?
এস কাছে মোর !

মালা

প্রেম ও প্রদীপ

(১)

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া !
কেন রাখিয়াছ আহা ! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া ?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া ?
তোমার লাবণ্য মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া !
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?

(২)

অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে !
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি ?

(৩)

তবু মনে হয় তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্ত স্বর—অন্তর মাঝারে !

নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে !
জ্বালগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার !

(৪)

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন ;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার !
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার !
হে মোর নিষ্ঠুরা ! কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছে সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে !
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে !
প্রজ্জ্বলিত হৃদি মাঝে, শূন্য সব ঠাঁই !
হে প্রেম নিষ্ঠুরা ! আমি তোমারে যে চাই ।

(৫)

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে ;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব বেদনায় !
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে !
হে মোর লুকান ধন ! হে রহস্যময়ি !
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী !
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোক আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ; মরণ মাঝারে—

সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব সাধনায় !
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন ! আজো তুমি জয়ী !
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি !

(৬)

একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার !
আমাদের দুজনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার !
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁঝের আঁধার !
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার ?

(৭)

কি জানি কেমন ক'রে জ্বালায়ে রেখেছ ওই—
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই !
কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির কৌতুকময়ী—
রহস্য প্রদীপ খানি ?
কোন্ তপস্যার বলে ওই যে দীপের বুকে
কি সলিতা দিলে টানি ;
কোন্ পূর্ব্ব পুণ্যফলে ফুটায়ে তুলেছ তাহে
আপন প্রাণের বাণী !

সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া !
এরি মাঝে সত্য-রূপে উজলি উঠেছে ওই !
তোমার প্রদীপ খানি !
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি !

(৮)

আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি ! ওগো মোর বাক্যহীনা ।
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীনা !
একি তব চিরজনমের অগীত সঙ্গীত ?
একি তব দীপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ইঙ্গিত ?
একি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী
তুলিছে সফল করি আপন সাধন খানি ?
একি তব মরমের সঞ্চিত স্বপন রাজি
পরাণ ছাপায়ে কিগো উছলি উঠেছে আজি ?
একি গো অনন্ত পূজা ! একি গো জীবন্ত আশা !
গুপ্ত প্রাণ কুঞ্জে কিগো আলোকিত ভালবাসা ?
একি তব সুখ ? ওগো একি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপ খানি ?
একি তব অন্তরের সকল সৌরভ ভরা—
আলোক গৌরব বাণী ?

(৯)

এই যে এসেছে সন্ধ্যা—প্রদীপ জ্বলিছে
আমি শুধু চেয়ে আছি, মুগ্ধ—একমনে !
অনন্ত গগন ভরা আঁধার নামিছে
নয়ন চাহিয়া আছে, স্তব্ধ একমনে !

ওগো আমি চেয়ে আছি, তৃষার্ত্ত নয়নে
তোমার প্রদীপ জ্বালা দীপ্ত বাতায়নে !
কেমনে জ্বালিলে দীপ হে অপরিচিতা !
এমন মধুর—মরম—সুন্দর ক'রে—
হে মোর সাধন স্বপ্ন ! হে মর্ম্ম-নিহিতা
একি অর্দ্ধ পরিচয় অনুরাগ ভরে ?
কি অপূর্ব্ব অভিসার ! কি সঙ্গীত বাজে
তোমার পরাণ-দীপ্ত প্রদীপের মাঝে ?
আমি শুধু চেয়ে আছি মুগ্ধ, একমনে !
কি অনন্ত অভিসার—নীরবে নির্জ্জনে !

(১০)

কবে জ্বেলেছিলে দীপ হে রহস্যময়ি !
কবে কোথাকার, ওগো কোন্ মহা বিজনে ?
সৃষ্টির প্রথম সে কি ? ওগো মর্ম্মময়ি !
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ কম-কাননে ?
সেকি এমনি গভীর নীরব গর্জ্জন
অনন্তের ? সেকি আলো ? সেকি অন্ধকার ?
সেকি এমনি সাঁঝের তিমির নির্জ্জন
মায়া-মন্ত্রালোক ভরা এমনি সন্ধ্যার ?—
উজলি উঠিল যবে সেই সে প্রথম,
অনাদি কালের বক্ষে প্রদীপ তোমার—
সকল সোহাগ তব সকল সরম
সকল স্বপন তব—আকুল আশার !
তখন কি উড়েছিল বসন্ত বাতাসে
এমনি পাগল-করা সন্ধ্যাঞ্চল খানি ?
তখন কি বেজেছিল হৃদয়-আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী ?—

উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো ! সকল আঁধার !

মরমের সুখ

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমার !
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে সুখের গৌরব !—
রুধিয়া রেখেছি মর্ম্মে ! হে প্রিয় আমার !—
আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পের সৌরভ
সাজাও অন্তর মোর ! এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোণে,
এ শুধু সুখের ছল ! আমারে ছলিছে,
তোমারেও ছলিতেছে ! মম মন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল !
দেখাতে পারি না তাহা ! হে আমার প্রিয় !
তাই আঁখিপ্রান্তে মোর ভাসে অশ্রুজল !—
তুমি মর্ম্মে মর্ম্ম আনি সব বুঝি নিও !
আমি দুঃখ জানি তাই হে আমার প্রিয় !
আমারি মরম তলে সুখেরে খুঁজিও ।

সে কি শুধু ভালবাসা ?

কেমন সে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায় !

তুমি যবে দূরে থাক, ওগো প্রিয়তম !
তোমারি আশার আশে, নর্ত্তকীর সম
অঞ্চল দোলায় তার নূপুর গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ তালে নাচে, এ অন্তর মম
ওগো প্রিয়তম !

কি যে তার চারুবাসে, তরঙ্গ হিল্লোল
কি যে তার প্রাণে-প্রাণে সঙ্গীতের রোল !
তরঙ্গিত দেহপূর্ণ আশান্বিত হিয়া,—
সোহাগেতে সুখে দুঃখে কাতর কল্লোল,
কি যে সে কল্লোল !

তোমা যবে কাছে পাই, হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল, উন্মাদের গান !
অন্তর তরণী সম বিক্ষুব্ধ সাগরে
চখে মুখে বক্ষে তার ঝাপটে তুফান
পাগল তুফান !

এই ভাসে এই ডুবে, জীবন মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্ব্বমন, সর্ব্বদেহ, সমস্বরে গায় ;
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির আলিঙ্গন !

প্রেম-প্রতীক্ষায়

তখনো হয়নি সন্ধ্যা ! বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ,—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি' সরোবর-জল, আম্রের কানন !

তখনো আসেনি প্রিয়া ! প্রাণ পেয়েছিল,
সেই আলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস
আম্র-শাখা দুলাইয়া বহেছিল বায়,—
বসেছিনু প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর এল সন্ধ্যা ধূসর বরণ !—
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল
ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন !—
ক'রে দিল সর্ব্ব মন অধীর চঞ্চল !
বাড়াইনু আলিঙ্গন !—প্রিয়া আসে নাই
পাঠায়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিযা লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী !—
পরশি সকল দেহে প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা ! আঁধার ধরণী !
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি' অঞ্চল !'
কোন শব্দ নাহি হায় ! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !
তখন বহিল ক্ষুধা বসন্ত বাতাস,
তৃষ্ণার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ !
তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া !
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন !
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া !
ওকি—ওকি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন ?
এলোমেলো চুলে ওই প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া !
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর·চলি গেছে কথন কোথায় ?

আপনার গান

হে অন্তর ! প্রভাহীন বাক্যদল মাঝে
কেমনে রচিব তব আনন্দ নিলয় ?
সকল গগন ঘেরা জলদের মাঝে
শারদ নিশীথে যেন ম্লান চন্দ্রোদয় !
তব বক্ষে জ্বলিছে যে অপূর্ব্ব আলোক
জগতের চক্ষে তাহা ক্ষীণতম ভাসে !
তোমার প্রদীপ হতে ওই যে আলোক
বাহিরে আসে না !—ওগো ছায়া শুধু আসে
তব কুঞ্জে বাজে চির বসন্ত বাঁশরী
প্রতিদিন প্রতিরাত্র উন্মাদিয়া প্রাণ !—
ছুটি ক্ষীণ ধ্বনিহীন ম্লান ছন্দ ভরি
কেমনে উঠিবে ফুটি সে গোপন গান ?
আপনা ফিরাও তবে আপনার পানে !—
আপনি আনন্দ পাবে আপনারি গানে !

বসন্তের শেষে

জীবন স্বপ্নের মত শূন্য হয়ে গেছে !
কিছু আর নাহি মোর ধরিতে ছুঁইতে !
কত স্বর্ণ, কত রত্ন পড়িয়া রহেছে,—
সাধ নাই, সাধ্য নাই, তুলিয়া লইতে !
তুমি যে সুধার পাত্র ধরিয়া সম্মুখে
সাধিছ আকুল নেত্রে করিবারে পান !—
গঠিত তোমার রাজ্য শত দুঃখে সুখে
আমার সকলি শূন্য স্বপন সমান !
ভুলেছি কি ? ভুলি নাই ভুলিনি তোমায়
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী !

কত সুখ দুঃখ ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী !
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে !

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি ! সেইদিন বসন্ত প্রভাতে
মনপ্রাণ অন্ধ করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন !
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ ;—
ভাল ক'রে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুরা প্রাণ, দিয়া সর্ব্ব ভালবাসা,
সেইদিন, সর্ব্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা !
আর সেই, সেইদিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন !—
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে হোল মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে ! জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে ! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ দান !
সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক্ বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য্য অশেষ !

রহস্য মধুর হাসি! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র! প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গছায়া স্বরগের সুখ!
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ!
তারপর গেছে দিবা গেছে নিশা কত!
গিয়াছে স্বপন প্রায় আশা শত শত,
প্রভাতের মুক্তবায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ পরে! সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন!
হে মোর প্রভাত পুষ্প, হে অপরিচিতা
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা!
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণী!
হে আমার যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী!
হে আমার আপনার! হে আমার পর!
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর!
হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময়!
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয়!
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে!
যেমনি বাজানু বাঁশী, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন!—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন!

উপহার

ফুটেছিল শত পুষ্প বিচিত্র বরণে,
ফুটেছিল নিভৃত এ অন্তর কাননে,
মুক্ত বায়ু রবিদীপ্ত প্রভাত প্রভায়,
পূরবী সঙ্গীত শ্রান্ত প্রশান্ত সন্ধ্যায়!
ফুটেছিল আলোকিত মধ্যাহ্ন গগনে
ফুটেছিল অন্ধকার নিশীথ পবনে,
কি আনন্দে কাঁপিত যে পাগল পরাণ
এ জগতে কেহ তার পায়নি সন্ধান!
তারপর তুমি এলে, দাঁড়াইলে হেসে!
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে;—
বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল সে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে।
থর থর সেই ফুলে সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা!

শূন্য প্রাণ

ওরে রে পাগল
জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কী গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা ?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন পূজা লাগি তব আকুল অন্তর ?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

নিবিড় নয়ন হতে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন যৌবন ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেম পূর্ণ হিয়া!
আর কি করিব দান, কি আছে আবার
ওরে রে পাগল ওরে পাগল আমার।
সন্ধ্যা শেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভরে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু, হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দুহাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার।
সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

সাঁঝের ছায়ায়

ওগো আধ-পরিচিত !
আধ-অজানিত
অতিথির প্রায় ।—
এসেছ ভ্রমিয়া শেষে—
আমারি এ দেশে—
ধূসর ছায়ায় !
নয়ন অধর শ্রান্ত
কত সুখ-ক্লান্ত
প্রখর প্রভায় !
বক্ষে মোর রাখি মাথা
জুড়াইবে ব্যথা
শীতল সন্ধ্যায় ?
অগ্নিরূপে চলে গেলে
ভস্ম হয়ে এলে
সাঁঝের বেলায় ;
আমার যৌবনতপ্ত
প্রেম অভিশপ্ত
অন্তর মেলায় !
থাক্ বঁধু সেই ভাল !
কাজ নাই আলো
প্রভাত প্রভায় ।
যাহা আছে তাই দাও
আঁখি পানে চাও
সাঁঝের ছায়ায় ।

প্রেম

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কারহীন,
তব প্রেম আজি তার বসন-ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্ব গীতহারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !—
সুখপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী !
সর্ব্বসুখে বিভূষিত গরবিত প্রাণ
বক্ষেতে চাপিতে চায় সে প্রেম গৌরব !
বৃথা আশা ! বিশ্বমাঝে বেজে উঠে গান ;
বাতাসে ভরিয়া যায় ফুলের সৌরভ !
তবে এস নমি মোরা দেবতা চরণে—
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে

প্রেম সত্য

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনে প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর, এত ভালবাসা !
বিচার করিলে, তুমি
শুভ্র কি কাল ?
বিচার করিনে, তুমি
মন্দ কি ভাল !

কাননের পুষ্প সম
ওগো পুষ্প মম !
যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি
বাসিয়াছি ভাল !
তাই মোর, এত ভালবাসা !
অনন্ত সরল নিত্য
সত্য যে প্রকার
একেবারে মন প্রাণ
করে অধিকার—
তুমি তো তেমনি ক'রে
মন প্রাণ ভোরে
তব প্রেম সত্য রাজ্য
করেছ বিস্তার
তাই মোর, এত ভালবাসা !
জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু—
হৃদি-নেত্র দিয়ে !
তাই মোর, এত ভালবাসা !

টান

রচনা বিভোর কবি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি' নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার পড়ি পড়ি করে সম্ভাষণ !—
সেইরূপ হে প্রেয়সী ! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য সম্পদ রাজি হেরি বারে বার,

শতবার চলে গিয়ে ফিরিয়া আবার
তব প্রেমমন্ত্র প্রিয়ে! করি উচ্চারণ!
কবিতা কবির আশা তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে!

দান

ওগো, আমার প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান;
তুমি, নয়ন মুদিয়া, তুলিয়া লইও
ভরিও তোমার প্রাণ!
তুমি, সরমের বাধা মেন না মেন না
চেও না কাহারো পানে;
ওগো, এ প্রেম নির্ম্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি জানে!

অন্তিমে

নিভিয়া গিয়াছে হাসি
শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি,
মৃত্যুর এ কিরে ভুল!
যৌবন চলিয়া গেছে
স্বপন গিয়াছে তার,
চরাচরে ছেয়ে গেছে,
পরাণের অন্ধকার!

বঁধু নাই—বাঁশী নাই—
বৃন্দাবন ? তাও নাই,
অন্তরের সাধগুলি,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই !
আজ শুধু মধু-স্মৃতি
শ্মশানে কুসুম সম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে,
মলিন প্রদীপ মম।
মৃত-রবি-কর-রেখা,
শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর ;
কাঁদে অন্ধ হাহাকার।
শুকায় শুকা'ক ফুল
থেমে যায়, যাক হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে,
হৃদয় যাইবে ভাসি।
চাহি না শুনিতে আশে
বসন্তের পুষ্পরাণী,
ঢেল না শ্রবণে তব,
বীণা-বিনিন্দিত বাণী।
জ্বেল না জীবনে আর
তোমার সোনার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্ থাক্
আমার আঁধার রাতি।
শতছিন্ন ছিদ্র বস্ত্র
পরিধানে আছে যার
কনক আলোক রেখা,
লজ্জার কারণ তার।

ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন
ভুলিয়া যেতেছি গান
সাজে না জীবনে তার
বসন্ত ব্যাকুল তান।
সকলি হারায়ে গেছে
জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয় মাঝে,
আঁধার গিয়াছে বেড়ে।
নিভিয়া এসেছে হাসি
শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার একি লীলা,—
মৃত্যুর একিরে ভুল।

রাগ

'রাগ করেছ কি'? ওগো! কার নাই রাগ
হৃদয়ে জ্বলিছে দেখ কত শত অনুরাগ।
কত না সুখের লাগি কত ভাবনায়,
কত না সুখের মাঝে কত বেদনায়,
সকল প্রভাত বেলা সারা দিনমান
কত না তোমার তরে কেঁদেছে পরাণ।
যেমনি আসিলে তুমি সারাদিন পরে
দাঁড়ালে আমার কাছে হাতখানি ধরে
সোহাগে সরমে মোর চোখে জল ভাসে
মরা দেহে ভরা-প্রাণে কথা নাহি আসে।
ব্যথাভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই।
রাগ করি নাই ওগো! করি নাই রাগ।
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ।

প্রাণের স্বপ্ন

নীরব আঁধার নিশীথ সমীর
বিমল আকাশ—জীবন অধীর
আনত ভূমে।
শত সুখ দুঃখ, আছিল ফুটিয়া
পরাণ আমার পড়েছে লুটিয়া
আজি ঘোর ঘুমে।
গেছে দুঃখ আজ গেছে ভয় লাজ
গেছে ভেঙ্গে সুখ—শত শত কাজ
শুধু স্বপ্ন চুমে।
আজিকে সত্যের কল্পনা কাহিনী
সকলি অলীক,—বিরামদায়িনী,
স্বপনের ধূমে
শুধু আশা চুমে।
যদি যায় যাক্—জীবন ভাসিয়া
যদি আসে থাক্ মরণ জাগিয়া
বিজড়িত ঘুমে
শুধু স্বপ্ন চুমে।

মহাশূন্য

জীবন, জীবন কোথা ?—যেন নিরবধি,
মরণ নিঃশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।
জীবন, জীবন কোথা ? ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা।

একি হাসি একি কান্না! শুধু বসে বসে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা!
মহান মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল।
কোথা তুমি কোথা আমি,—গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয় সম্বল।
সে ব্যথা বাজিছে আজো ; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু—যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

স্বপ্নে

এত করে বাঁধি বুক,
কেন ভেঙ্গে যায়?
জীবনের মহাব্রত স্বপনে মিলায়।
একটি প্রভাত লাগি
এতকাল ছিনু জাগি,
আজি এ সাঁঝের মাঝে
পড়েছি ঘুমায়ে!
অবশ শিথিল দেহ
নাহি দুঃখ নাহি গেহ
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হৃদি
পড়িয়াছি নু'য়ে।
অই 'ত উষার হাসি,
আকাশে উঠিছে ভাসি,
আকাশ স্বরগ এই আছিল আমার!

আজি জাগিয়াছি তবে,
পুরেছে বাসনা ভবে,
এইবারে ডেকে লও দেবতা আমার।

নানা স্বপনের মায়া,
হৃদয়ে ফেলেছে ছায়া,
এ নহে উষার হাসি—নিশি আঁধিয়ার
নিরাশ কম্পিত হৃদে স্মৃতি সাধনার।

মোছ আঁখি

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

বিদায়

বসেছিনু তোমা তরে ওগো সারারাতি
চাঁদের আলোয় আর প্রাণের খেলায় ;
কখন ঘুমালে তুমি নিবাইলে বাতি !
এখনো বসিয়া আছি ভোরের বেলায়
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে ! ঘুমাও ঘুমাও
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !
যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম দেখিবারে পাও
অকস্মাৎ মনে পড়ে প্রভাত বেলায় !
কি জানি কি কহিবে গো ! কি গীত গাহিবে !
পলকে টুটিয়া যাবে স্বপন আমার !
কি জানি কি গাহিবে গো ! কি ব্যথা বাজিবে !
অজানা তরাসে প্রাণ কাঁপিছে আবার !
ঘুমাও ঘুমাও তব স্বপ্ন মহিমায়।
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !

কামনা

আমি নই, আমি নই ! হে পূর্ণ সুন্দরী,—
সত্যই আমার তুমি নহ কামনার ;
কি শুনিতে কি শুনেছ ! মরিছে গুমরি,
আমারি পঞ্জর মাঝে, গীত বাসনার।
মোহ মুগ্ধ লাজ দীপ্ত গীত বাসনার।
আমি নই ! আমি নই ! নব শিশু সম,
জন্মেছে মরমে মোর এ নব বাসনা,
নয়ন আলোকে তব ! ক্ষম মোরে ক্ষম,
এ নহে এ নহে আমি, এ কোন কামনা
অযাচিত আশাতীত, এ কোন কামনা !

চুম্বন

আমার চুম্বন এক চঞ্চল বিহঙ্গ
নিমেষে উড়িয়া যায় তব মুখপানে !
উড়ায়ে আরক্ত পাখা ভাসাইয়া অঙ্গ !
যত ডাকি আয় ! আয় ! পরিচিত তানে
শুনে না সে ! ঠেলি ঠেলি নীলিম-তরঙ্গ
যতদূরে তুমি আছ তত দূরে যায় !
কাছে গিয়া মুগ্ধ-হিয়া আমারি বিহঙ্গ
স্বর্গ হতে ফিরে আসে পাগলের প্রায় !

আমার মন

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,—
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা !—
মন তুই ঘুমা ।
গগনে গরজে ঘন,
আঁধার ধরণী !
কোথা যাবি অন্ধকারে
পাগলের মণি ?
ওরে মন তুই ঘুমা
ওরে মন তুই ঘুমা
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা !
কার চোখে আলো জাগে ?
কারে তোর ভাল লাগে ?

কোন্ রত্ন—কোন্ হেম ?
কার যত্ন—কার প্রেম ?
সংসারে সকলি মন
—তুদিনের ধূমা !
ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দেব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।
কে তোরে বাসিবে ভাল
আমার মতন ?
কে তোরে করিবে আর
এত বা যতন ?
মেলিস না পক্ষ তোর
রে মোর বিহঙ্গ !
বাহিরে গর্জ্জিছে শত
আঁধার তরঙ্গ !
অনন্ত অচেনা দেশ—
কোথা যাস্ ভাসি ?
বক্ষেতে লুকায়ে থাক
চির বক্ষবাসী !
ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা
মন তুই ঘুমা।

তুমি

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্ব জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল!
ওগো প্রিয় তুমি মোর পূর্ণ মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল
নিতান্ত আমারি তুমি।
তুমি আছ দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি উর্দ্ধে দৃষ্টি তব স্বর্গপানে ধায়!
সমস্ত জীবন তব সম্পূর্ণ সফল,
আমি আছি তোমারি ও চরণের ছায়
তোমারি চরণ চুমি!
যদি কোনদিন তব উজ্জ্বল নয়ন
হেথায় ফিরিয়া আসে দেব স্বপ্নভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমার শয়ন
চেয়ে দেখ তোমারি ও চরণের মূলে
নিস্ফল কোরনা মোরে!
খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো ক'র আমার জীবন
তোমার চরণভূমি!

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হতে এসে,
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢালিয়া পড়িছে তব সর্ব্বাঙ্গ সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।
আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবি সম,
সর্ব্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।
তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি!

আপনার মাঝে

(১)

ওরে রে অশান্ত মন!
কারে তুই চাস্?
আজি এ সন্ধ্যার মাঝে
কোথা তুই যাস্?
ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি!
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস্?
সুখ হীন শান্তি হীন
ঘুরিয়া বেড়াস্।
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস্ কভু?—
আপন মরম তলে
পাস্ কিনা পাস্।

সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস্ ?

(২)

ওরে পাখি, সন্ধ্যা হ'ল আয়রে কুলায় !
সমস্ত গগন ভরে
আঁধার পড়িছে ঝরে
ওরে পাখি ! অন্ধকারে ! নীড়ে ফিরে আয় !
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায় ।
যতক্ষণ আলো ছিল মিটে নি কি আশ ?
ওরে সারা দিনমান
তুই করেছিস পান,
যত মধু ছিল ভরি গগন আকাশ
এবে আলো সাঙ্গ হল মিটেনি পিয়াস ?
ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর্ পাখা,
অপূর্ব্ব আলোক মাখা,
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে !—
ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে ।

(৩)

ভয় নাই ভয় নাই হে আমার মন !
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ অন্ধকার !
আবৃত অন্তরে তোরা জ্যোতিঃ চিরন্তন
ডুব্ দে ডুব্ দে তবে আপন মাঝার ।
পূর্ণ কর ওরে পাখি ! পক্ষ দুটি তোর
আপন আনন্দে ভরা আত্মার আলোকে,
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর গগন তলে উড়িস্ পুলকে ।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে,
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজা রে।
ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার হিয়া,
মুহূর্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার!
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া
দেখারে আপন পথ আপন মাঝার।

(৪)

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়াখানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি!
সম্মুখে পশ্চাতে তার
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে ঘন আবরণে,—
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।
ভয় নাই ওরে মন! কর রে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি পর!—
এই যে আঁধার রাজি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম-পরিচয়
মুহূর্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়!

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সমর উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে!—
দর্পভরে সগৌরবে ওগো রাজরাজ!
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!

ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর সোনার মন্দির !
ধূলিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর !
আমি অশ্রুজল চখে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ !

প্রার্থনা

নিখিলের প্রাণ তুমি ! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;
জাগরণে কর্ম্মভূমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্বপ্রাণময় ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !
নিও পাপ নিও পুণ্য—
হৃদয় করিও শূন্য
ভরি দিও শূন্যপ্রাণ তব পূর্ণতায় !
মহান করিয়া দিও তব মহিমায় !
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !

গান

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ।
হে অনন্ত! হে মহান্! তুমি প্রাণসিন্ধু!
পরাণ তরঙ্গে তব আমি প্রাণবিন্দু!
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ-হরষে!
আজিকে ডুবুক যত ছোট খাট গান
ওই তব মহাগানে। ওগো মোর প্রাণ!
ওগো প্রাণস্পর্শি! করহ পরশ মোরে।
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যা'ক ভরে!

নীরবতা

আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরুলতা!
প্রশান্ত গগনকোলে তপন জ্বলিছে।
পরাণ মন্দিরে আজি মহানীরবতা
হে নীরব! হে মহান্! তোমারে বরিছে!
পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে!

সাগর সঙ্গীত

—:*:—

গণইতে দোষ-গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

—:*:—

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক। তোমা, ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টল্‌মল্ কি যে স্বপ্ন ভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবেনা সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা!

সাগর সঙ্গীত

(১)

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব ! আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে
একি কথা ! একি সুর !
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে !

(২)

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে !
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কথনো বাজিছে ধীর,
কথনো গভীর,
কথনো করুণ অতি, চোখে আনে জল,
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল !
তোমার গীতের মাঝে,
কি জানি কি বাজে !
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,—
আমার সকল অঙ্গ শিহরে, শিহরে !
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে ;
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।

(৩)

ওই তো বেজেছ তব প্রভাতের বাঁশী—
আনন্দে উৎসবে ভরা ! সূর্য্যকর রাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায় !

গীতভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল !
তোমার সঙ্গীত আজি বিহঙ্গের প্রায়,
মাখি সে সোনার স্বপ্ন তার সর্ব্ব গায়,
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে !

(৪)

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার !
এই অজানিত সুখ, এ দুঃখ অজানা,—
বাধাহীন এ উৎসবে, মানেনা যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হ'য়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হ'য়ে উঠে !
বিচিত্র এ গীত লোক, পুষ্পের কানন !—
কি জানি কেমন করে কাঁপিছে এমন !—
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার !

(৫)

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোনার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে ;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার !
কি মোরে করেছ আজ ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

(৬)

এই তো এসেছে উষা অনন্তে ভাসিয়া,
স্বপ্নসম শুভ্রালোক অঙ্গে জড়াইয়া,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝরিয়া পড়িছে,
শুভ্র এই স্বপ্নলোকে স্বপন রচিছে।
পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ,
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস।
নিঙাড়ি ও বক্ষভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা।
হে গায়ক অনন্তের! কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন্ লোকে? কোন্ উষা মাঝে?

(৭)

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছাপ ভরা আমার পরাণ।
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।
অপূর্ব্ব এ মিলনের গোটাকত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে।

(৮)

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,

বাজাও নির্জ্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় !
ওগো যন্ত্রি ! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে !

(৯)

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে !
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে !
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী !

(১০)

অপূর্ব্ব এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়ায়
সঙ্গীত আকুল হৃদি বিহঙ্গের প্রায় !
কোনকালে কোনখানে অন্ত নাহি পাই,
অনন্ত এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়াই !
অনন্ত শবদ ভরা অকূল নির্জ্জন,
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গর্জ্জন।
অনন্ত এ গীতলোকে আপনা ডুবাই
কোনকালে কোনখানে তল নাহি পাই।
হে অতল ! হে অগাধ সঙ্গীত মণ্ডল !
কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত শতদল !

(১১)

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ
তোমার কুসুম কুঞ্জে অপরূপ ফুল।
অপূর্ব্ব আলোকে তব ঐশ্বর্য্যে অতুল!
আঁখি মোর ছুটিতেছে দরশ লোলুপ
ঘিরিয়া ঘিরিয়া তব পুষ্প অপরূপ!
চাহিনা কুসুম কুঞ্জ চাহি শুধু গান,
শবদ তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ!
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া,
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া,
আমার নয়ন পটে? আমি অন্ধ হব,
শবদ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।

(১২)

কি আজ ভাসিছে তব বক্ষ পরকাশি
উজল স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ চাঁদে!
কি অনন্ত শান্তিভরা জোছনার রাশি,
পরাণে ঝঙ্কারি ওঠে আনন্দে, অবাধে!
পূর্ব্ব জনমের একি স্বপনের ছায়া,
কোন্ পূর্ব্ব পুণ্যফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়তলে! কোন্ পূর্ব্ব মায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া!
আমার পরাণে আজি, কাঁপিছে কেবল
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতি পুষ্পদল।

শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হ'য়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।

(১৩)

আজি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার!
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার!
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার!
একি সুখ? একি দুঃখ,—প্রণয় গভীর
একি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর!
কি গাহিছে, কি চাহিছে, হৃদয় আমার
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!

(১৪)

আজি যে আঁধার ভরা তোমার আকাশ!
আজি যে পাগল করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে। আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মত
আমার হৃদয়তলে গরজে সতত।
তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে!

(১৫)

এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল যন্ত্রে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দ্দয় রুদ্র! মরণের রঙ্গে,
চরাচর ডুবে যায় প্রলয় তরঙ্গে!
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে;
বিদ্যুৎ বিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিনী
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব একি প্রলয় বরষে!
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণ গীতি অনন্ত আঁধারে।

(১৬)

অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি'
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মনতরী!
প্রলয়পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে!
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ!
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।

(১৭)

হে রুদ্র মরণদেব! জটী জটাধর!
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয় কুঞ্জে আপনারি গীতে।

অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল,
আপনারি সুখে দুঃখে করে টলমল,
অনন্ত সঙ্গীত ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে,
হে রুদ্র প্রলয় সিন্ধু!—বাঁচিতে মরিতে।

(১৮)

রাখ, রাখ, রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই,
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে, মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে!
রাখ রথ! শান্ত হও! ওগো রণশ্রান্ত!
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত!
আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমিতো আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা!
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণ তলে রবে শান্তি জল।
আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা।

(১৯)

আবার ফিরেছ প্রভু! হৃদয় গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে!
থেমে গেছে আজ তব প্রলয় সঙ্গীত,
অধর নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।

আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে
কি আনন্দ বহে যায় পরাণে পরাণে!
সঙ্গীত উন্মুখ প্রাণ ফুটিবে এখনি
হৃদয় ভরিব গানে, ডাকিবে যখনি!—
তোমার সঙ্গীত ঘেরা ঝঙ্কৃত গগনে,
তোমার কুসুম ভরা পুষ্পিত পবনে!

(২০)

তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
সোনার ঢেউয়ের মত বহে' চলে যায়,
উজলি উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব—
দুলিতেছ আজ তুমি সোনার দোলায়।
আজি যে সেজেছ সিন্ধু, রাজার মতন।
সোনার তরঙ্গে বহে প্রেম আপনার;
তরুণ প্রেমিক এক রাজার মতন—
সোনায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার।
উষার আলোকে ভরা পরাণ এনেছি
রেখে যাব আজ তব চরণ তলায়,
সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়,
এক সূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে!

(২১)

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে!
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে!
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে—
করুণ সুরে।

আজি যে পরাণ মোর, বাজিয়া উঠেছে ঘোর,
করুণ সুরে।
কিবা খোঁজে কিবা চায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
দূরে অদূরে!
ওই যে মেঘের পানে, ছুটে যায় কোন টানে
গাহিছে সকল প্রাণে করুণ সুরে।
নাহি ছন্দ নাহি তান পরাণ পুরে—
আজি যে আকাশ ভরা করুণ সুরে।

(২২)

ঘুমাও ঘুমাও এবে হে সিন্ধু আমার!
নির্জ্জন গগনতলে, গীত শ্রান্ত চোখে।
মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার।
ঘুমাও ঘুমাও এই স্তিমিত আলোকে।
আমি বসে আছি একা এপারে তোমার,
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে।—
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার!
কখন জাগিবে তুমি? কোন গীত মাঝে?
আমি রব প্রতীক্ষায়। দুহাত তোমার
বাড়াইয়া দিও তবে অন্ধকার সাঁঝে!

(২৩)

কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?

সে দিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপুর—
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রুজলে ?
এত কথা এত ব্যথা ওগো এত সুর
সেদিন কি বেজেছিল পরাণ অতলে ?
আমারে কি ধরেছিলে বক্ষে আঁকড়িয়া
স্নেহার্ত্ত বন্ধুর মত দু'হাতে তোমার ?
আমার সকল কথা গেছিল ভাসিয়া
প্রেমের মোহন মন্ত্রে হৃদয় তোমার ?
ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে।—
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।
মনে হয় আজি কোন গুপ্ত অভিসারে
ভাল করে দেখা হবে, হবে পরিচয়
যেন কোন মন্ত্রময় আলোক-আঁধারে
জাগিবে মোদের সেই পুরান প্রণয়।

(১৪)

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে—
দিও মোরে ল'য়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।
হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি
সে গীত বাজিবে ব'লে আজি জাগিয়াছি।

(২৫)

এখনও ওঠে নি রবি, মোহন আঁধার
ঘিরেছে তোমারে যেন স্নেহ আবরণে।—
প্রশান্ত অধর আর নয়ন তোমার
কিবা নিদ্রা, কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণে!
কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্ণব আমার!
চাহিছ আমার পানে এ মোহ আঁধারে।
কথা মোর, ভাষা মোর, সঙ্গীত আমার,
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।
আমি আছি তব ছোট ভাইটির মত
আমারে স্নেহের চোখে দেখ মাঝে মাঝে।
যে সঙ্গীত বাজিছে তব বক্ষে অবিরত
আমার পরাণে যেন মাঝে মাঝে বাজে।—

(২৬)

রবিকর পড়িয়াছে অধরে তোমার
প্রশান্ত গভীর তব গৌরবের মত।
আমারি অন্তর হ'তে লইয়া আমার
সোনার স্বপন ঘেরা পুষ্প শত শত
কণ্ঠে দেছ উপহার। আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পারে। হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দেও অন্তহীন অমৃতের ধার
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার।
আজ হ'তে আমি, হে অর্ণব! হে অশেষ!
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।

(২৭)

থাক থাক আজ নয়। এত লোক মাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও ;
এরা তো সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় ল'য়ে হাসাও নাচাও।
যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুই জনে মিলিব হে! গাব দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গাব আর
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে।
তোমার অন্তর হ'তে অমৃতের ধার
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।
দুই জনে মিলিব হে!—গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়।

(২৮)

ওগো কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর,
কত যুগ যুগান্তর।—
ওগো কত যুগ হ'তে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া—
কত যুগ যুগান্তর,
কত জন্ম জন্মান্তর।
হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দন ধারা কেমনে বহিয়া যায়

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার !
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার ?
কত জন্ম জন্মান্তর—
কত যুগ যুগান্তর।
হে আমার অভিশপ্ত ! হে বন্ধু আমার !
হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার !
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকল ত্যাগি,
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।

(২৯)

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার !
কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন্ গ্রামে ?
কোন্ মহা শবদের কোন্ নিত্য ধামে ?
কোন্ সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে ?
কোন্ সুরে কোন্ তালে কোন্ মহাগানে,
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণস্রোতে !
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে ;
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !
তুমি ভেসে যাও সখা ! অনন্তের পানে !—
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে !

(৩০)

নিদ্রাহীন নিশি মোর ভরি দিলে আজ
সঙ্গীত তরঙ্গে তব, ওগো গীতরাজ।
অন্ধকার মাঝে আজি কি শব্দ কল্লোল
চোখে মুখে বক্ষে মোর, তরঙ্গ হিল্লোল
সম, পড়িছে ঝাঁপটি! কাঁপিছে পরাণ,
ঝটিকায় পূর্ণাহুতি পুষ্পের সমান!
সকল সুখের সর্ব্ব বেদনার ভারে,
উদ্দাম সঙ্গীত ঘেরা এই অন্ধকারে!
তোমারে দেখিতে নারি! শুধু পরশিছে
আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা।
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা!
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত মাঝে অগীত কি জানি।

(৩১)

ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম,
গুন গুন গাহি গান ঘরের ভিতরে:—
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন ছবি প্রদীপের করে!
তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার!—
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে—
আলস্যে রচিত মোর পুষ্প মালিকার
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপ করে!
যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে,
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার,

হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল।
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল।

(৩২)

এখনো নামেনি সন্ধ্যা, দিনমণি অস্তপ্রায়,
আলো অন্ধকার ঝরে, তোমার সকল গায়।
মেঘেরা ভাসিয়া যায়, তোমা পানে চাহি চাহি,
মুগধ বাতাস বহে গুন গুন গাহি গাহি।
অনিশ্চিত আলোকের অপূর্ব্ব এ অন্ধকার।
আকাশ চাহিয়া আছে অবাক নয়ন তার।
ওগো সিন্ধু! অন্ধ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে?
কোন্ প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন্ সমস্যার ভার?
জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠিছে বাজি?
তোমার পরাণ হতে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য? একি মিথ্যা? একি আশা?
একি ভয়?

(৩৩)

আজিকে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায়?
ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যায়!
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি?
আমার পরাণ লয়ে কি করিছে আজি!

আরতির শঙ্ক যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপ ধুনা দিয়া
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির !—
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর !
হে পূজারি ! আজি তুমি কোন্ পূজা কর ?
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন ?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু ? মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে !

(৩৪)

ওই যে এসেছে সন্ধ্যা ! পূরবী রাগিনী বাজে,
হে সাগর ! তোমার এ প্রশান্ত বুকের মাঝে !
হৃদয় উদাস করা গভীর ঝঙ্কারে তার
প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে নীরব সঙ্গীত ধার ।
মুখর তরঙ্গগুলি শান্ত হয়ে আসিতেছে
চঞ্চল বাতাসদল থির হ'য়ে থেমে গেছে !
গগন আলোকহীন, শশী তারা কিছু নাই,
যেন কোন্ মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই !
আজি কি মরমে তব, নাহি বাসনার লেশ ?—
হয়েছে সকল প্রেম—সকল কর্ম্মের শেষ ?
মায়াহীন ছায়া ভরা ধুসর এ অন্ধকারে,
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে ।
আমিও আপন মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি !—
যবে যোগ ভেঙ্গে যাবে আমারে তুলিও ডাকি !

(৩৫)

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়,
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা ! হে সাগর ! হে অপার !
বাক্যহীন আজ তুমি শুদ্ধ শান্তি পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব—শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম্ম মাঝে আপনারে !
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ,
মগ্ন হয়ে গেছে তায় সকল বিষাদ গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর।
নিবিড় নিশ্বাস হীন ধীর স্থির আঁখিকর,
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

(৩৬)

সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে। তোমার নয়ন দুটি
ভক্তিরসে ঢুলু ঢুলু। বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন রোলে।
হরিবোল ! হরিবোল ! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন !
মুক্তবায়ু প্রভাতের—আনন্দ কীর্ত্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হয়ে অন্তরের চারিধারে।

দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি। কি মধু বিরহ দিয়া।
প্রাণারাম! প্রাণারাম! তোমা পাই কি না পাই
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই।
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব!
সঙ্গে রেখ চিরকাল, সাধন ভজনে তব!

(৩৭)

এপারে আলোক ভরা ওপারে আঁধার!
পার করে দাও মোরে ওগো পারাবার!
হেথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে!—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার!
(আমি) দেখিব ওপারে গিয়ে
শুনিব পরাণ দিয়ে!—
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার!
এ পারের গীতগুলি
পরাণে লয়েছি তুলি,
মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার,—
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার!

(৩৮)

ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায়?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ-পরশ তরে আমারি মতন?

ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর ছায়া পরাণ স্বপন ?
আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে !
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ।
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে,
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন ?

(৩৯)

এপার ওপার করি পারি না ত আর,
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই !—
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই !
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার !
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার !
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল !
খুঁজে তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে।
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে !
হে মোর আজন্ম সখা ! কাণ্ডারী আমার !
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !

অন্তর্যামী

(১)

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে !
কেমনে জড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে !
সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে,
সকল পরশমাঝে
তুমি উঠ হেসে !
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি !
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি !
ওগো তুমি মালাকার
মন-মালিকার !
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার !
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণ জাগে !

(২)

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার !

যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার।
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর !

(৩)

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে !
কোন্ পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাহি পাই।
কে দেখাবে আলো মোরে ? কেহ নাই ! কেহ নাই।
কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারিপাশে !
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে।
হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী !
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি !
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে ?
এ মহা বিজন রাতে এই ঘোর অন্ধকারে ?
হা হা ! হা হা ! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব।
কোথা তুমি কোথা তুমি এযে অন্ধকার সব !
যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি !
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী !

(৪)

যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই ;
মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই !
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,

সেদিন হইতে বঁধু !—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কি গো ? তাত মনে নাই !
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই !
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা ;
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা ?
সে দিন তোমারে বঁধু ! পারিনি ধরিতে !—
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে !
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই !
পুষ্পিত ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
কেমনে রাখিলে বঁধু ! আপনা লুকাই !
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই !
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু ; পাই বা না পাই,
বঁধু হে ! তোমারি লাগি আকুল পরাণ !
বঁধু হে ! বঁধু হে ! আমি তোমারেই চাই !—
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই !

(৫)

এ পথেই যাব বঁধু ? যাই তবে যাই !
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই !
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব !
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব !

দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক !—
যদি ভয় পাই বঁধু ! মাঝে মাঝে ডেক !

(৬)

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বন পথ দিয়া !
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল !
কত না বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে !
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে !
কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে !
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে !
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান,—
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ।
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী এযে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু ! বুঝিতে পারিনি।

(৭)

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর !
বুকের মাঝে কেমন করে ! চোখে বহে লোর !
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে !
প্রাণের মাঝে তোলা পাড়া মানে অভিমানে।
পরশ তব স্বপন সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশ্বাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর !
তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি !
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি।

ছেড়ে দাও ত চলে যাই তুমি থাক পিছে
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে !

(৮)

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান !
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই,
শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই।
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা ;—
তবে ছেড়ে দিনু আমি ! কর গো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও !—
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও !
আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে প'ড়ে রব।

(৯)

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে !
রাগ করিও না বঁধু ! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে !
এত ক'রে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার !
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা পানে ধায়,—
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়।
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর ?)

(১০)

মরম আঁধারে বঁধু ! প্রদীপ জ্বালাও !
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও ;

আপনি বাজাও ! আমি কথা নাহি কব !
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব !

(১১)

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে !
ওগো ছায়ারূপী ! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদিতন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে ? আমি কথা নাহি কই !
বঁধু হে ! নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই !

(১২)

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণ খানি !
এই প্রাণ-প্রান্ত হ'তে কত দূর জানি !
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই !—
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই !
একি মোর মরমের অজানিত দেশ ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কি গো পরাণের শেষ ?
এ কি গো তোমার বঁধু ! গোপন আবাস ?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস ?
আমি ত জানি না কিছু, তুমি সব জান !—
কোথা হতে এত ক'রে মোরে তুমি টান ?

(১৩)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !
অপূর্ব্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা !
শত লক্ষ চূড়া তার আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্নপটে আঁকা !
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া !—

শত লক্ষ পুষ্প লতা অপূর্ব্ব বরণ
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া !
উজ্জ্বল স্বপন ভরা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির !

(১৪)

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটাছুটি করে
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া মেঘেরি মতন !
নাহি চন্দ্র ! নাহি সূর্য্য ! কি যে স্বপ্ন ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন !
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার !—
প্রশান্ত আনন্দ ভরা, ধীর অতি ধীর !—
কে যেন বন্দনা করে কোন্ দেবতার !
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

(১৫)

ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !
কোন্ পথে যেতে হবে ?
কে বল আমারে কবে ?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !
কঠিন পাষাণে যেন বন্ধ চারিধার
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই !
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !

(১৬)

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে!
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে!
কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর!
পথ খানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব!

(১৭)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়!
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়!
কোথা পথ কোথা পথ কোথা পথ খানি
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা মানি!
এদিকে ওদিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে!
এই পথ দেখে ভাবি পেয়েছি পেয়েছি!
এ পথ সে পথ নয়! এ পথে এসেছি!
নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কত দূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হতে সেই পথ খানি।

(১৮)

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথ খানি মোর কাছে অতিশয়!
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত
কোথা পথ? কোথা পথ? খুঁজিছি সতত।

তবু পথ নাহি মিলে! দিশাহারা মন,
রূপ রস গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে! ছিন্ন ফুল হার,
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার!
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত!

(১৯)

পথের লাগিয়া মন মন-পথ-বাসী!
আমি ত আমাতে নাই, শুধু কাঁদি হাসি!
গৃহহীন সঙ্গীহীন! স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথ পুন স্বপ্ন যায় টুটি!
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে,
আকুল নয়নে কার অশ্রু জল ঝরে!
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল!
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল!
মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই!—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই?

(২০)

সব তার ছিঁড়ে গেছে! এক খানি তার
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়!
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার!
সব কর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশা হারা!

সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথ খানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী !

(২১)

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
বুকে বুকে থাকিতাম,
কভু নাহি ছাড়িতাম !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি,
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম,
মিশে মিশে হইতাম,
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি !

(২২)

ধূলায় ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলা হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায় !
কিছুতে না ছাড়িতাম,
জেগে লেগে রহিতাম,
সেই পথ পথিকের চরণ তলায় ।
একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির সোপানে !
কি গান যে গাহিতাম,
হাসিতাম, কাঁদিতাম,
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির সোপানে !

(২৩)

কি আর কহিব বঁধু ! আমি যে পাগল !
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল !

আমি মত্ত দিশাহারা,
দীন কাঙ্গালের পারা !—
একটি আশার আশে পথের পাগল।
নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল
সব অঙ্গ জরজর শিথিল বিকল !
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি !
বুকে টেনে লও ওগো ! পরাণ পাগল !
পাগলেরে আর তুমি, ক'রনা পাগল !

(২৪)

একি ? একি ? ওই বুঝি, সেই পথ ভূমি ?
মন-মাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি !
তুমিই দেখালে পুনঃ ! ওগো গুণ-মণি !
কত গুণের বঁধু তুমি কেমনে তা ভণি !
কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে কথা নাহি মিলে !
কেমনে বুঝাব বঁধু ! তুমি না বুঝিলে !
সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায় !
সব দুঃখ গীত হয়ে পরাণে মিলায় !
সব আশা সব ভাষা এক হয়ে যায় !
একটি ফুলের মত চরণে লুটায় !

(২৫)

লও সে অঞ্জলি লও পরাণ বঁধু হে !
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণবল্লভ হে !
দরশ তুমি নাহি দিলে,
পরশ তুমি দিও হে—
চোখে চোখে রেখ সদা পরাণ বঁধু হে !

(২৬)

শুভলগ্নে আজ তবে, যাত্রা করিলাম !
মনো-পথের পথিক হয়ে, পথে ভাসিলাম।
আঁধার পথ আলো ক'রে
দিও তুমি সোহাগ ভরে
পরাণ ভরে পরশ দিও, পরাণ বঁধু হে !—
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণবল্লভ হে !

(২৭)

বাজা রে বাজা রে তবে ! বাজা জয়ডঙ্কা !
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা !
পরাণ খানি কাঁপছে কত জয়মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানি গো ফুটছে হৃদিতলে !
সুখের মত দুঃখ আজ, দুখের মত সুখ !
কোন্ গানের গরবে ওগো ভরিয়াছে বুক ?
প্রাণের মাঝে একি শুনি ? কি নীরব ভাষা !
বুকের মাঝে কোন্ পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা !
পায়ের তলে বাজে পথ ! প্রাণ আজিকে রাজা !
বাজা রে বাজা রে তবে, জয়ডঙ্কা বাজা !

(২৮)

কি আনন্দে ভরপুর হৃদয় আমার !
বঁধু হে ! আজিকে মোর, পথ চলা ভার !
পরাণবঁধু ! বঁধু হে !
কি আর তোমায় কব হে।
আঁখি জলে ভরে হ'ল পথ চলা ভার !
আমার গলায় দোলা সেই মালা খানি,
এত যে ভারের বোঝা আগে নাহি জানি !

আমার বঁধু বঁধু হে!
কি আর তোমায় কব হে!
ফুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ি, পথ চলা ভার!

(২৯)

ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনির মত,
হৃদয় খানি ছাপাইয়ে উঠছে অবিরত।
পরাণ বাঁধা কিসের জালে,
নাচছি যেন কিসের তালে
ভরা পালে তরীর মত ভাসছি অবিরত!
অনেক দিনের অশ্রু সাধা,
এমন পথে এমন বাধা
পরাণ আমার কিসের তরে
কি জানি গো কেমন করে!—
হাল হারাণ তরীর মতন ভাসছি অবিরত।
আমি আর কি করতে পারি,
আমি যে গো চলতে নারি,
সুর হারাণ গানের মত ভাসছি অবিরত।

(৩০)

তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও!
যে সুরটি হারিয়ে গেছে, তাহারে ফিরাও!
সেই সুরের তালে মানে,
বাঁধ্‌ব আমার প্রাণে প্রাণে!
অনেক দিনের সাধা সুর, সেই সুরটি দাও!
তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও!
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও!
দাঁড়িয়ে আছি পথের মাঝে,
সে গান জানি কোথায় বাজে!

অনেক গানের অনেক সুরে, কেন গো জড়াও ?
আমি চাই একটি গান, সে গানটি গাও !

(৩১)

তুমি গাও একবার ! আমি গাই পুনঃ !
তোমার গান আমার মুখে কেমন শুনায় শুন !
তোমার গান তোমার রবে, আমি শুধু গাব !
তোমার কথায় তোমার সুরে, পরাণ জুড়াব !
আমার গান হয়ে গেছে, গাও আরেক বার !
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে, গাও হে আবার !
তুমি যবে গাইবে বঁধু ! আমি দিব তাল !
আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধর' হাল !
দুজনায় এম্‌নি করে পথ চলি যাব !
(এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে, সে মন্দির পাব)

(৩২)

তুমি হেসে হেসে বঁধু ! কর গোলমাল !
বোধ হয় সবি যেন স্বপনের জাল !
তবে কি বৃথায় আমি, এই পথ বাহি ?
এ পথের শেষে কিগো সে মন্দির নাহি ?
তবে কি বৃথাই মোর চিত্ত ছুটে যায়
ওপারের ছায়াময় মন্দিরের গায় ?
এত অশ্রু এত ব্যথা নাহি ব্যর্থ হবে !—
সত্য পথ বাহিতেছি তব বংশী রবে।
তুমি জান তুমি জান, ওগো মন-বাসী !
তুমি ত ভাসালে মোরে তাই আমি ভাসি।

(৩৩)

এবার তবে চলিলাম সুরটি করে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে দুখে

এই তো আমার পোষা পাখী, রবে বুকে জড়িয়ে !
ঘুমিয়ে যদি পড়ে সে গো ! চুমি দিব জাগিয়ে !
আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখব তারে, প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে !
তোমার গান আমার গান এক হয়ে যাবে !—
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে !
তবে তুমি থাকবে বঁধু ! থাকবে কাছে কাছে !
থাকবে তুমি বুকের মাঝে, থাকবে পাছে পাছে !

(৩৪)

পথের মাঝে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি !
কাঁটায় কাঁটায় কালা কালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে করে, গেছে পথ খানি !
কাঁটার ঘায় জ্বলে জ্বলে চল্‌ছি পথ বাহি !
বেড়া আগুনের মত
জ্বলছে প্রাণে অবিরত !—
সে জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এই পথ বাহি !
তোমার গাওয়া প্রাণের গান,—সেই গান গাহি !

(৩৫)

তোমার পথে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
আপন হাতে যাহা দাও, তাই ভাল মানি !
একটু খানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন !
একটু খানি পরশ দিও, হোক্ না কাঁটাবন !
একটু খানি আলোক দিও আঁধার বনমাঝে !
একটু খানি বুকে টে'ন যখন ব্যথা বাজে !

একটু খানি ধরিয়ে দিও, তোমার গানের সুর
সব-জুড়ান সুধা-স্রোতে, ভরব প্রাণ পুর !
কাঁটার জ্বালা ভুলে যাব, চল্‌ব গান গাহি !—
পথের শেষে দিও বঁধু ! যাহা প্রাণে চাহি !

(৩৬)

কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মরি, বঁধু হে আবার !
জ্বালার উপর জ্বালা ! আজি প্রাণ অন্ধকার !
জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে শুকায়েছে,
যত দিন দুঃখে আমি ভরেছিনু প্রাণ,
যত শ্বান্ত আনন্দের গেয়েছিনু গান ;
ছোট খাট সুখে যত উৎসবের রাতি
ফুলে ফলে সাজাতাম জ্বালিতাম বাতি,
লুকায়ে আছিল সব কি জানি কোথায় !
প্রেতের মতন আজি ঘিরেছে আমায় !

(৩৭)

সে দিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হলে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করি সকলি ঢালিনু !
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে !
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা !—
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা !
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে !
কোথা যাব, কোথা যাব, কোথায় লুকাব ?
ভয়ে ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ, কেমনে বাঁচাব ?

(৩৮)

ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে প্রাণ! ক্ষণে ক্ষণে মরে!
বুকের মাঝে ভূতে প্রেতে কত নৃত্য করে!
পরাণের আশে পাশে, বিভীষিকা যত
আঁখি খুলে আঁখি মুদে হেরি অবিরত,
প্রাণ খানি মোর যেন গ্রাস করিবারে!
আসে সব আসে ধেয়ে ঘোর অন্ধকারে!
চারিদিকে শুনি শুধু, বিকট চীৎকার!
পরশে অন্তরে শুধু মৃত্যুর আঁধার!
ভয়ে ত্রাসে সব অঙ্গ কাঁপে থরথর!
কাঁপিতেছে সর্ব্বপ্রাণ মৃত্যু জরজর!

(৩৯)

এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী
এস এস হৃদ্‌মাঝারে, হৃদয়বিহারী!
এস আমার আঁধার বুকে, এস আলো ক'রে!
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুখ হরে!
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা!
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা!
এস আমার প্রাণের মালা! এস মালাকর!
এস এই ঝড়ের মাঝে! এস বুকের 'পর!
এস আমার মরণ কালে এস হাসি হাসি!
আন তোমার মরণ-হরা সব-ভুলান বাঁশী!

(৪০)

এস আমার মন-বাসে টিপি টিপি পাও!
চরণ তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও!
তেমনি করে আবেগ ভরে পিছনে দাঁড়াও!
তেমনি করে হাত দুখানি নয়নে বুলাও!

তেমনি করে মুখে চোখে পড়ুক নিশ্বাস।
তেমনি করে দিয়ে যাও চুম্বন আভাস!
তেমনি করে গোপন কথা কও কানে কানে!
তেমনি করে গানের মত বাজ প্রাণে প্রাণে!
তেমনি করে কাঁদি আর তেমনি করে হাসি!
তেমনি করে ডুবি আর তেমনি করে ভাসি!

(৪১)

এস মন-বন-বাসে! এস বনমালী!
চরণ তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে!
পরাণ ভ'রে প্রাণজুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে!
তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়।
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়!
এস মন ব্রজ-বাসে! এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি!

(৪২)

এস আমার প্রাণের বঁধু! এস করুণ আঁখি!
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি।
প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে!
তোমার ওই চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে!
একটুখানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব!
তোমার তরে কোমল ক'রে প্রাণ বিছাইব।
এস আমার কোমল প্রাণ! এস করুণ আঁখি।
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি!
এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশি!

ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে।
নাইক' আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে।
প্রাণের মাঝে আঁকে বাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত।
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ।
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।

কিশোর-কিশোরী

কাছে কাছে নাইবা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল।
এপার থেকে গাইব গান—ওপার থেকে শুনবে বলে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে !
আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হতে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ-তৃষা কোমল হয়ে ভাসবে গানে ;
ফুলের মত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে।
লাগবে যখন কোমল করে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মত—ফুলের মত—পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক ;—
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের-প্রাণে বেঁধে রেখ।

আভাষ

(১)

সেদিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম !
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম !
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে !
কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম,
সত্যবলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—

মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া আগারে !
কেহ ভালবাসে নাই। তবু ভালবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসা, ভালবাসা, বলে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে !
সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর ?
সব শূন্য হ'য়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে !—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার !—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !

(২)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন-তলে
নব-শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !
সেই সে প্রথমবার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !
সে কোন্ কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে !

বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে !
ওগো ফুল ! ওগো মিষ্ট !
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট !
কা'র ডাকে ছুটে এনু ?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথম বার সাঁঝের আঁধারে।

(৩)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন্ দেবতা ?
কে শুনিল কাণ পাতি শ্যাম-দূর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই।
তুমি শুনেছিলে কিছু—আমি শুনি নাই !

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মূরতি ?
ধ্বনিয়া উঠিল কিগো মেঘমন্দ্র রবে
সন্ধ্যার আরতি ?

আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই—
তবে কা'র ডাকে তুমি চলে এসেছিলে ;
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহা-পরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে ?

জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কার বাঁশী বাজে ?
নির্ব্বাক্ নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,
শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায় ?

তুমি কি অবাক্ হয়ে শুনেছিলে তাই ?
আমি ত' শুনিনি কিছু,—কিছু বুঝি নাই !
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের ?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,

সেই সে প্রথম দিন !—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ মূরতি তব ! কাহার লাগিয়া ?
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া ?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা !

(৪)

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি !
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমা'তেছিল—সে যেন জাগিল !
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে ?—তুমি কি বোঝ না,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা ?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হতে ?—আমি জেনেশুনে এসেছিনু,
মোহিনী মূরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল পরবশ বাসনার ভরে ?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে ?
সৌন্দর্য্য-সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে ?
চাও মোর আঁখি পানে—ও কথা ভেব না,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।
কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা ?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে ? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির-সুন্দর :—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হ'য়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,
আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত !
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত !
সে ফুল তরঙ্গে, কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে ?—
আঘাতি' হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !
চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল রাশি ! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।

যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত।
তাহারি কল্পিত বুকে মোরে পরশিত।
আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন,
করিতাম মনে মনে; মূরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া!
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে! ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম, আসিবে সে, ধরিব তাহারে ঃ
সে চির-সুন্দর মোর, নাই আর নাই!
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই!
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটে না তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হ'য়ে! কাঁপে না অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয়না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।
তবু, কেন আনে নাই তোমার বারতা
আমার কানের কাছে;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের!
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,
তোমা দেখিবার আগে। তোমার লাগিয়া
ছিল না পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া!
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগন তলে,—সাঁঝের মাঝার!—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধাম !
ওই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা,
সুখসূর্য্য-কর-স্নাত কুসুম সমান ;
করুণায় ভরাভরা ওই যে নয়ান !—
তার কথা শুনি নাই ;—ওগো মর্ম্ম-লতা
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা।
তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে ?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
সুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল !
জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমন জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখা 'পরে জ্বলিনু তখনি !
কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে ; এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব প্রাণে, সর্ব্ব মনে, ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে ?—কেবা জ্বালাইল ?
কা'র পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল ?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায় ;
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায় ?

(৫)

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?

তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?
এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে—
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ !
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?
সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পুরে !—
কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল !
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায় !
এও মিথ্যা ! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে ?
আমি নাই ! তুমি নাই, কিছু নাই ভবে !
মিথ্যা তবে সে দিনের ধূসর গগন,
তুমি মায়া, আমি মায়া ! মোদের মিলন
মিথ্যা সে মায়ার খেলা। সেই মধু হাসি ?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি ?
তাও ভুল ? তাও স্বপ্ন ? তাও মিথ্যা তবে ?
চোখের চাহনি সেই ? তাও মিথ্যা হবে !
সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি !
অবাক্ বিভোর সেই চক্ষের চাহনি !
যেন কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি !
স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি !
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি

ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে,—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!
এও তবে মিথ্যা কথা! শুধু স্বপ্ন বুঝি?
আমি তো হেরেছি সদা দুটি চক্ষু বুজি।
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষে চেপে রাখি!
আমি যে হেরেছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি?
তবে মিথ্যা, মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস,
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই মায়া সন্ধ্যাকাশ!
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম-দূর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছলছল!
মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মূরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার!
জগতসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা!
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা?
মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিণী!
বুঝিবা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল করে' স্বপ্নালোকে, সেই সে তোমারে,
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে!
কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম,
নয়ন পুত্তলি মম—আঁখি অভিরাম!
তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ?
ওগো মায়া! ওগো মিথ্যা! সত্য ক'রে কহ।
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
দেখা দিলে সেই দিন মোরে ছলিবারে?
তবে কোন্ ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি

যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে সব করেছিল পান,
চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !
আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি' প্রত্যেক নিমেষে,
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্ম শেষে !
সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মূরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি !—
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢলঢল,
পরাণ তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !
সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল করম মাঝে সব কামনায়,
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !—
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়,—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !
মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জ্বল জ্বল শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
অবাক্ নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায় ! সেই সে তখন—
অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ,
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ

ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে !
অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যতদিন ততদিন রবে !
সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন্ মহাপ্রাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে।
সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার।
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার।
সত্যই সে দিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে তুলেছি !
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির।
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।
এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা ; ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।
মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মূরতি-স্রোতে নিবানিশি ভাসি।
এখনো সন্দেহ তব ? ফের্ ওই হাসি ?
আরে আরে অবিশ্বাসি ! আরে রে নির্দ্দয় !
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয় ?

সেদিন কি প্রাণে তোর ডাকে নাই বান ?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরাণ ?
ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে ?
আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে !
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে !
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দু'নয়ন !
ওগো মর্ম্মলতা ! মরমে জড়ায়ে থাক !
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ !
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে।
রাখ বুকে বুক। কর গো হৃদয়ঙ্গম !—
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহি চলিয়াছে, দিবসরজনী,
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি !
বুঝিতে পার না কিছু ? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক !
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয় !
কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে।
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায় !
ওগো মর্ম্মলতা ! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক !

তুমিও শুনিবে প্রাণ! আমি যদি শুনি!
সেই তার নূপুরের মধু রুণুরুণী!
তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন মরণ ভ'রে জনমে জনমে!

(৬)

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু এক দিনে?
আরে! আরে! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য্য-করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া!—
ফুটেনা ফুটেনা ফুল শুধু এক দিনে!
সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন-উৎসব?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা?
মুহূর্ত্তে আরম্ভ আর মুহূর্ত্তেই শেষ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত! সে যে অনন্ত কালের!—
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের!
তোমারে দেখেছি শুভে! কত শত বার!
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে!

যোগভ্রষ্ট আমি! কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য্য-কাহিনী?
যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি!
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি!
কেনবা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে।
ফুটিয়া উঠিলে মরি! মধু-জ্বল-জ্বল
উজল রসের মূর্ত্তি। কত না কল্পনা
করিছে, জীবন যেন স্বপন-বাহিনী!
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল!
জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যূষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি—
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে।
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক্ অবাক্
দুইটি পরাণ! কে দিল তুরঙ্গ তুলি?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জ্জনে?—
তরঙ্গসঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন্ প্রথম প্রত্যূষে?
তারপরে কতকাল কত যুগ ধরে
কালের তিমির-স্রোত ব'হে চলে যায়
কোন্ চিহ্নহীন পথে? আলোকবিহীন,
কোন্ ঘন-তমসায়? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হ'য়ে যায় লীন! সেই মহাশূন্যে যেন
অট্ট হাসে পূর্ণ করি দিক দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর!

তারি মধ্যে তুমি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কতদিন কতকাল কত যুগ ধরে ?
তারপর হেসে উঠে নব-বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা ! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্য্যপানে।
মোরাও জাগিনু দোঁহে। মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো। তুমি বনলতা।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি।
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে !
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন রভসে।
হেসে হেসে উঠিল সে নব-বসুন্ধরা !
সেই বার সেই মোর ভ্রমর জনম।
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে !
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ-বেদন
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি আনমনে !
অকস্মাৎ একদিন কানন-প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম-রূপে উঠিলে ফুটিয়া !
আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন্ কটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে তুমি কোথায় লুকালে !—
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর-জনম।
তারপর মনে আছে ? ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে !
আশ্চর্য্য অবাক্ হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে।
কুসুমিত মুখ কান্তি ; মধু দেহলতা ;
দোল দোল জ্বল জ্বল রূপের গৌরবে ?

সেকি প্রেম ? ভালবাসা ? আকাঙ্খা ? বাসনা ?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে ?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান ?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে ?
তারপর ? পশুপক্ষী করিনু শিকার ;
ভীষণ অরণ্য মাঝে ব্যাধের জনম।
একদিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ করে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হতে বাহিরিলে বন আলো ক'রে।
নতজানু হ'য়ে কত ক্ষমা চাহিলাম,
কহিলে না কোন কথা, ছুটে চলে গেলে।
ওগো বনলতা ! ওগো করুণা-রূপিণী !
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।
বন শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটীর !
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে !
একদিন আক্রমিল কৃতান্তের মত
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে !
শাণিত ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম।
সেদিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে !
পরজন্মে জনমিলে মধুপদ্ম-আঁখি
রাজার নন্দিনী হয়ে ! তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর ! প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের !

কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায় !
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি !
একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি !
ধরা প'ড়ে গেনু ! পরদিন বধ্য-ভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, উর্দ্ধে চেয়ে হেরি
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি !
সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন্ জনম ?
ছিলে মোর বক্ষ ভ'রে ! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে ! চোখে হোম শিখা !
চপলা চমকে বুকে ! অঙ্গের লাবণি
কুসুম-স্তবক সম মধুর কোমল !
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া !
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হ'ল পাছে যত্নে রাখা,
চিত্ত মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হয়ে যায় !
পরক্ষণে হাসিলাম , ফুরাল জনম !
আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে ! কত শত জনমের
মিলন বিরহ-ব্যথা সুখ দুঃখ জ্বালা
ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে ! কারে খুঁজিতাম ?
একদিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কাল' কাল' দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলোমেলো চুলে। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি !
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব !
চমকিয়া উঠিলাম। বন্ধ হ'ল গান।
তারপর ? পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে !—

বহুজন সমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী।
একদিন তোমারই আলেখ্য আঁকিতে
আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ি দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে! সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি।
হেরি কহে সবে, অপূর্ব্ব এ চিত্রকর!
মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির?
আমি যে পূজারী ছিনু সেই দেবতার!
তুমি সেবাদাসী। কোথা হ'তে এসেছিলে
নাহি জানি। দিবারাত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মত রহিতে পড়িয়া!—
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি!
একদিন পূজাশেষে, আকুল অধীর
মত্তপ্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হ'য়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমের সেই শিবের মন্দির!
একি সত্য? একি মিথ্যা? জানি না জানি না
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের!
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কত ভাবে কত বার!
তারি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মত মোর চিত্ত-বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম বেলায়।
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদিকালের বীণা।

অনন্ত কালের লীলা নহে একদিনে।
সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর।
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা প'ড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার
মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা!—
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার!
তাই সন্ধ্যাকাশ-তলে উঠিলে ফুটিয়া;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু একদিনে।

(৭)

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে।
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন;
এস নাই কোন কালে
ফোট নাই কোন দিন,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে!
সব শূন্য পূর্ণ ক'রে
এমন জনম ভ'রে!
তুমি যে মধুর!
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার!
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার!

বারে বারে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে !
কত ফুল কত হাসি,
কত ভাল-বাসা-বাসি,
কত দুখ্‌ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক্‌,
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,
কত সোহাগের কথা,
কত বুক-ভাঙ্গা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি ঃ—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙ্গিয়াছে !
জনমে জনমে পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে—
মরণের পারে পারে,
এক সঙ্গে একেবারে,
এমন মধুর ক'রে,
এমন পরাণ ভ'রে !
যত ভাঙ্গা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙ্গেছিল,
সবই যে গো প্রাণপুটে
রাঙ্গা হয়ে ফুটে উঠে,
অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে !

প্রাণ ঢল ঢল!
আঁখিভরা জল!
শত জনমের পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত না হারাণ ধন, সবই মিলিয়াছে!
যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা!
জনম জনম ধ'রে
সকল মরম ভ'রে
গুন্ গুন্ গাহি গান
জ্বল জ্বল দুনয়ান
খুঁজিত খুঁজিত যারে!
ওগো পাইলাম তারে!
সেই সন্ধ্যাকাশ তলে
নব শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত!
ওগো তুমি সেই!
তুমি সেই, সেই!
যারে পাই নাই কভু! যার তরে আশা,
জীবন কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা!
জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন!
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—
শতেক জনম ধ'রে
সকল পরাণ ভ'রে?
সকল জনমে আঁখি
চাহেনি কি থাকি থাকি
কোন্ সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে।

তারি চিত্র স্বপ্ন বেয়ে
ছিল নাকি মর্ম্ম ছেয়ে ?
তারি গল্প চিত্ত-হারা
করেনি কি আত্মছাড়া ?
গীত কাতরতা,
মিলন-বারতা
আসে নাই থাকি থাকি ? হে প্রাণ-রতন !
শত জনমের চাওয়া এ মধু-মিলন !
যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা !
যে দীপ জ্বালিনি ওরে ! সেই দীপ জ্বালা !
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল তুলায়ে রঙ্গে ?—
সে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা !
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে !—
যে দীপ জ্বলেনি আগে,
ওরে ! তারি, আলো জ্বালা !
যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার,
ফোটে কি মরমে
শতেক জনমে ?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা !
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ ! কি আলোক জ্বালা !
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে !
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধুম লেগেছে !
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে !

ফুলে ফুলে ফুলাফুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে!
লালে লালে রাঙ্গা হ'য়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে!
কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটিকুটি?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রে রঙ্গে?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে!
পরাণ-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে!
যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হল! পূরিল জীবন!
ওগো ফুল ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি।
কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
এ কার নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে? হে মিলিত! হে মধু-মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন।

গীতাবলী

(১)

তুই !

প্রভাতের তারা তুই
প্রভাতে ফুটিবি শুধু
স্বপনের পদ্ম তুই
আমার পরাণ বঁধু !
প্রভাতের পানে চেয়ে
অরুণিম আঁখি তোর
আয় রে নিলাজ মেয়ে
তুই যে প্রভাত চোর

(২)

বেহাগ

মধুর যামিনী আজি, বল্ মোরে বল্
এ ছার পরাণ লয়ে বাঁচিয়া কি ফল !
আশাগুলি বুঝি ওরে, ধীরে ধীরে পড়ে ঝরে
স্বপনের খেলা লয়ে কেমনে খেলিব বল্
ক্ষীণ আশা বলে চল্, হৃদয়েতে নাহি বল
চলিব কেমনে বল্, নয়নেতে বহে জল !

(৩)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো ! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে—ওই চরণে তোমার !

ব্যথা মোর স্মরি যত দহে হৃদি দহে তত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীরধার !
পাপ চক্ষে দেখি যবে মোহপূর্ণ এই ভবে
বড় ভয় হয় প্রাণে, কাঁদে প্রাণ বার বার !
তোমা যদি করি ভয়, তবে আর কিসে ভয়
মোহ যাবে আলো হবে সংসারের অন্ধকার !
তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় 'পরে
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার ।

(৪)

তুমি

চৌড়ী—একতালা

তুমি যে রেখেছ মোরে, তাইত রয়েছি বাঁচি
ডাকিবে যখন তুমি, তখন মুদিবে আঁখি !
জনমের সাধগুলি, তব হাতে দিনু তুলি
পুরালে পুরাবে তুমি—না পুরালে রবে পড়ি !
তোমারি আদেশ লয়ে, ভ্রমেছি এ দেশে ওহে
সম্পদে বিপদে তবে—আমার ভরসা তুমি !

(৫)

বেহাগ—আড়া

আঁধার ভুলিতে চাই
আঁধার ভুলিতে গিয়ে—আঁধারে ডুবিয়া যাই !
আঁধারের পায় পায়
পরাণ ধাইতে চায়
একটু বহিলে বায়—কে যে আমি ভুলে যাই !
ছেড়েদে ছেড়েদে মোরে
আঁধার আঁধার ওরে—
জীবনের কাজ সেরে রহিল পড়িয়া ;

মায়ার বাঁধন তায়, যখনি ভাঙ্গিতে চাই
বিস্মৃতি সাগরে আমি তখনি ডুবিয়া যাই।

(৬)

কেন কাঁদ হৃদয়?

হৃদয় হৃদয় মোর
নাহি ফিরে বল তোর
ফিরাইতে এই স্রোতে?
দুর্ব্বল শিশুর মত
ভাসিবি কি অবিরত
মিছে আশা বুকে করে?
মুছে ফেল অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল কি ফল
কাঁদিবি কাহার তরে?
যার তরে রাখ প্রাণ
সে তোরে দেয় না প্রাণ
কেন প্রাণ কাঁদ তবে?
সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া!
যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া—
কি ভয় কি ভয় তোর
ওরে হৃদয় আমার
উঠিবি রে সাঁতারিয়া!

(৭)

বাঁশী

এ হেন চাঁদনি রাতে কে যায় বাজায়ে বাঁশী
পরাণ মাতায়ে যায়—ফুটে ফুল রাশি রাশি !
নাহিগো নাহিগো আর
বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার
নয়নের জল ;
শ্যামের বাঁশরী আর
বাজে নাক বারবার
উঠে না উজান হায়
যমুনার জল !
তবু কেন প্রাণ মম, এমন আকুল হয়
বাঁশরী বাজায়ে গেলে পরাণ মাতিয়া রয় ?
বৃন্দাবন গেছে মরে, বাঁশী কেন আজ জেগে
স্মৃতিটুকু কেন এসে পরাণ মাতায়ে যায় ?
নাহি যদি রাধারাণী নাহি যদি শ্যামরায়
কি কাজ বাঁশরী দিয়ে, কেন বা বাজায়ে যায় ?
বাঁশরী ভাঙ্গিয়ে ফেল, আর বাজাওনা বাঁশী—
পরাণ চমকি উঠে —ফুটে স্মৃতি রাশি রাশি ।

(৮)

বেহাগ—আড়া

আমার ভরসা তুমি

সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি !
বিপদে পড়িলে পরে আমার পরাণ 'পরে
রবে তুমি আলো করে জানি আমি জানি আমি !
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি !

তোমারে ধরিয়া রব, আর সব ছেড়ে রব
আঁখি পরে আলো করে রবে তুমি রবে তুমি ;
তব মুখ পানে চেয়ে, রব ওহে এ সংসারে
বিপদে সম্পদে তাই আমার ভরসা তুমি।

(৯)

তোমার করুণা বিনা মোরা জানি নাক আর
সংসারে পাঠালে যদি রেখ পদে অনিবার !
শান্তি দিও, প্রীতি দিও, সত্যের আলোক দিও
উষার হৃদয় দিও, বল দিও বার বার !
ক্ষুদ্র এ শিশির বিন্দু, ওগো করুণার সিন্ধু,
সংসার উত্তাপে যেন, নাহি যায় শুখাইয়া,
যে প্রেমে ফুটাও ফুল, বিকাশ তারকাকুল
সে প্রেমে বঞ্চিত কর হৃদয় কুসুম হায়।
জীবন গহন মাঝে, বিপদ আঁধার আছে
সদা ফিরে পাছে পাছে কাঁদে প্রাণ বার বার !
শত বিঘ্ন কেটে যাবে, আঁধার আলোক হবে।
তুমি যদি আলো করে থাক হৃদে অনিবার !
আঁধার পিছনে রাখি সম্মুখে আলোক দেখি
তোমার চরণে যেন জীবন কাটে গো তার।

(১০)

কেন এসেছিলে, কেন চলে গেলে
মায়া পাশে বেঁধে প্রাণ !
হিয়ার মাঝারে, কেন দিয়ে গেলে
আকুল তিয়াষ গান !
মুহূর্ত্তের তরে না দেখে তোমারে
আকুল হয়েছি বড়।
দুর্ব্বল পরাণে সহিব কেমনে
দীরঘ বিরহ ঝড় !

স্নেহমূলে তবে, বাঁধি ভাল করে
আনন্দে পরাণ মোর,
বেঁধে দিলে যদি দেখো নিরবধি
যেন গো ছিঁড়ে না ডোর।
আকুল পরাণ আকুল নয়ান
আকুল নয়ন বারি!
আকুল বাসনা কেমনে বলনা
সম্বরি কেমন করি!
কাছে ছিলে তাই হেসেছি সদাই
করিয়াছি অভিমান!
দূরে গেছ চলে ভাসি অশ্রুজলে
কি করি বুঝে না প্রাণ।

(১১)

মিটাও না এই পিয়াসা
এই ত আমার মিষ্টি লাগে!
ওগো বিরহী! চির বিরহী—
এই তৃষ্ণা যেন নিত্য জাগে!
মিলন আমি চাইনা যে হে
এই তিয়াসা যেন থাকে
চোখের জলে এত মধু
প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু
মুছায়োনা চোখের বারি!
নাইবা এলে আঁখির আগে।
নাইবা হোল মিলন যদি
এই বিরহ নিত্য জাগে।

(১২)

মেঘের মাঝে ওই যে ভাসে
নীল সাগরে নীলমণি!

আমার প্রাণের মাঝে কেমন করে
আমি ঝাঁপ দিব তায় এখনি !
ওরে ওই যে ভাসে ওই যে হাসে
নীল সাগরে নীলমণি !
এত দিনের সাধের ধন
ওই যে ডাকে ভয় কিরে মন !
ওরে তোরা ধরিস না কেউ
আমি ঝাঁপ দিব আজ এখনি !
ওই যে ডাকে ওই যে হাসে
নীলসাগরের নীলমণি।

(১৩)

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার !
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার !
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই তো হাতে মোহন বাঁশী
সেই মুরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী !
(একবার) বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার
এসো আমার পরশ মাণিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর।

(১৪)

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণে প্রাণে বেঁধে দাও !
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও !

আমি সইতে নারি দূর থেকে
চোখের কাছে এনে দাও,
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও।
ভাবতে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে!
(আবার) ভুলতে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিহরে।
আমি ভাবতে নারি ভুলতে নারি
তোমার কাছে ডেকে নাও
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও।

(১৫)

আজিকে বঁধু থেক না দূরে
গেও না এমন করুণ সুরে!
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠিছে পরাণ পুরে!
আজিকে বঁধু থেক না দূরে!
আজি যে তোমার সোহাগ তরে
সকল দেহ উথলে পরে!
আজি যে তোমার পরশ লাগি
ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে!
আজি যে ঘোর বিরহ বাহি
উঠেছে কত পরাণ পুরে!
আজিকে বঁধু থেক না দূরে!

(১৬)

এই অে সেই তমাল তলে
মোহন মালা দিলে গলে

আদর করে কইলে কথা
ভিজল মালা চোখের জলে !
সেইত সেই মাধবী রাতে
জড়িয়ে নিলে বুকের 'পরে
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে !
আজি বঁধু কোথায় তুমি
হা হা করে তমালতল
কোথায় গেল মুখের হাসি
কোথায় গেল চোখের জল !
সকল শুষ্ক মরুভূমি
হা হা করে হৃদয়তল
কেন নিলে প্রাণের হাসি
কেন নিলে চোখের জল ?

(১৭)

এস আমার চোখের আলো
এস আমার প্রাণের মণি
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার আশার ধ্বনি !
এত দিনের আশার আশে
নয়ান জলে বয়ান ভাসে !
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার হৃদয়-মণি !
এস আমার সুখের সাগর
এস আমার দুঃখের খনি !

(১৮)

এই যে ছিল কোথায় গেল
কেন আমায় জাগাইলি !

এমন মধুর বঁধুর ঘুম
কেন সে ঘুম ভাঙ্গাইলি ?
অচেতনে ছিলেম ভাল
বুকে করে বুকের আলো ;
কেন তোরা এমন করে
প্রাণের আলো নিবাইলি ?
সেই যে তারে পেয়েছিলাম
প্রাণের মাঝে ছুঁয়েছিলাম !
কেন চেতন বেদন দিয়ে
প্রাণের ব্যথা বাড়াইলি ?
সেই যে আমার বুকের মাঝে
বরণ করা বনমালী !—
স্বপন যদি দেখেছিলাম
কেন স্বপন ভাঙ্গাইলি ?

(১৯)

একি বেদনার বাস পরালে আমায় !
একি জ্বালা জ্বেলে দিলে হিয়ায় হিয়ায় !
ওগো নিদয় ! ওগো নিঠুর !
ওগো মোহন ! ওগো মধুর !
একি দুঃখ একি ব্যথা প্রাণে গরজায় !
হয় দাও দাও দাও, দাও প্রাণ ভরে
নয় লও, লও লও, সব শূন্য করে ;
প্রাণ যে দেখিতে নারি এত যাতনায়
এই ঘোর জ্বালাভরা আশা নিরাশায় !
ওগো নিদয় ! ওগো নিঠুর !
ওগো মোহন ! ওগো মধুর !
কাতরে ডাকিছি আজ প্রাণের জ্বালায় !

(২০)

এ যে আমার ফুলের হার
এ যে আমার কাঁটার মালা!
এ যে সকল মধুর মিঠে
এ যে আমার বিষের জ্বালা!
দিয়েছ যা কিছু, নিতে যে হবে
যত না সুখ যত না জ্বালা!
ওই দেখ তব চরণ মূলে
দিয়েছি ভরে আজ কিসের ডালা।

(২১)

ওগো হৃদয় রতন! ওগো মনেরি মতন!
কি দিয়ে পূজিব আজি সাজাব চরণ?
তুমি যে আসিবে আমি বুঝিতে পারিনি
আমি যে রাখিনি ডালা সাজায়ে!
কি গান গাহিব আজি! কি শুনিবে বল?
কাঁপে তনু থরথর হৃদয় উছল
পরাণ বীণার তার সবি ছিঁড়ে গেছে
সে তারে কি সুর দিব বাজায়ে!
কেমনে গাঁথিব মালা, কোথা পাব ফুল (গো)
আমি যে জীবন ভরে করিয়াছি ভুল!
আমি যে রেখেছি শুধু যাতনা কুসুম (গো)
হৃদয় মন্দির মাঝে কুড়ায়ে!

(২২)

কাছে কাছে না বা এলে—তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল;
দুটি প্রাণের আঁধার-মাঝে প্রাণে প্রাণে প্রদীপ জ্বাল।
এ পার থেকে গাইব গান—ও পার থেকে শুন্‌বে ব'লে;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হ'তে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ তৃষা কোমল হয়ে ভাস্‌বে গানে ;
ফুলের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে,
লাগবে যখন কোমল করে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মত—ফুলের মত—পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে ; প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক,
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণে প্রাণে বেঁধে রেখ।

(২৩)

কেদারা—কাওয়ালী

দুরাশা-কম্পিত সুরে
কি গান গাইব আর।
এত গীতি মনে মনে
এত ভুল বার বার॥
অপূর্ব্ব বাসনা আর
গীত ভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলো ভরা
হৃদয় মন দিব মান
কি যেন গাহিতে যাই,
কি যেন গাহিতে চাই
কি যেন গাহিতে যাই
অভিশপ্ত হৃদি।
ধ্বনিত বসন্ত তানে
অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা
শক্তিহীন ছিন্নতার॥

সাধন সঙ্গীত

(১)

কি ভয় দেখাস তুই, এলোকেশী।
তোর সবই কেমন বেশী বেশী!
কালী তুই কালের বার, তাই রে তোর কাল রং,
আজ অকালে কাল তোরে সাজিয়েছে রে আস্ত সং॥
হাতে দেছে টিনের খড়্গ—রং করা তার রক্তের ভান;
শঙ্খ, চক্র আর যে যে সব, সবই মিছে সবই সমান॥
আগে নিতিস্ মানুষ বলি, পাঁটার রক্তে খুশী এখন,
(ওরে) আমরা যেমন মরে আছি, তুই হয়েছিস্ ঠিক তেমন!
কিসের ভয় দেখাস তবে, ওরে আমার এলোকেশী?
আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র, সবই কেমন বেশী বেশী!

(২)

ওরে আমার মরা মাগো, ওরে আমার মরা মা?
কেমন করে ভুলিবি রে, আর ত আমি ভুলব না?
মরা মায়ের শ্রাদ্ধ করে, জ্যান্ত মায়ের পূজা করে,
শ্রাদ্ধ চাস্ ত শ্রাদ্ধ ক'রব, কর্ব নারে উপাসনা।
লজ্জা নেই কি লজ্জাহীনা লোল জিহ্বা মিথ্যা হাসিস্,
মুখে চোখে রং মেখে মা, মরার মত পড়ে আছিস?
পূজা চাস্ ত বেঁচে ওঠ, বাপের বেটী হোস্ যদি মা!
(আমার) মরা মায়ের শ্রাদ্ধ করি—জ্যান্ত মায়ের উপাসনা!
ওরে আমার মরা মাগো, ওরে আমার মরা মা!
মিথ্যা তোর ভয় দেখান, আর ত আমি ভুল্‌ব না!

(৩)

করালী মা যদি মরণেরে মারতে পারিস—
তবেই বুঝবো মনে প্রাণে আজও তুই জ্যান্ত আছিস্!

মাগো! তোরে ডাকছি কত, সাড়া দিসনে মরার মত,*
খড়্গ দে মা! বারে বারে, এমন করে ডাকব নারে,
আজি নিজেই করব যা করবার তুই যদি মা! নাই জাগিস!
ওরে! যদিও মা মরিয়াছে, মায়ের নাম আজও আছে,
(আমি) সেই নামের জোরে মারব মরণ, চুপ করে তুই
চেয়ে দেখিস।

(৪)

মরা হাড়ে ভেল্কি খেলে ওরে আমার মরা মা!
একবার তবে ঝেড়ে ঝুড়ে আদত্ ভেল্কি খেলা না!
যা হবার তা হবে তাই, আমি একবার দেখতে চাই,
লোকে যা সব সত্যি ভাবে, তারে তুই মা মিথ্যা মানা!
সত্য মিথ্যা নানা প্রকার, এমনি এই ভবের আঁধার,
(এ'যে) ভেল্কীর ভেল্কী, আদৎ ভেল্কী, খেলালে যায় সব জানা!
থাকে না আর চোখের ঘোর, বাড়ে যে মা! বুকের জোর,
একবার তবে ঝেড়ে ঝুড়ে আদৎ ভেল্কী খেলা না।

(৫)

তারিণী! নিজেরে তরা
তোর সকল অঙ্গ মরণ-ভরা!
নীরস নয়ন, নির্ব্বাক্ মুখ, শিথিল হস্তে খড়্গ ধরা!
নিজেরে তরা!
মুখে চোখে হায়!
মরণ ভয়ে চরণ-প্রান্তে কোটি কোটি মরা
তারিণী! নিজেরে তরা!
জেগে উঠ মা, জীবন পেয়ে
সে জীবন যাক জগৎ ছেয়ে
ভীম গভীর অট্টহাসি মরমে বাজুক শঙ্খ বাঁশী—
মরণ তাড়ায়ে জাগায়ে তুলুক মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা!

অসহায় ছাগ ঠেলে ফেলে দে ভারতের প্রাণ
নে, মা, নে, মা, নে ;
হৃদয়-রক্তে হাসুক কৃপাণ—রক্ত অধর রক্ত নয়ান
হাসিয়া ডাকিয়া কাঁপায়ে তুলুক
মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা।
চেয়ে দেখ তুই আপনি মরা
তারিণী! তারিণী! নিজেরে তরা।

কবিতা

প্রার্থনা

দেবতাগো! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন ;
দুটি প্রাণ একসাথে দাও মিলাইয়া ;
সহিতে পারি না আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া!
তিল তিল করি নিশি পশিতেছে প্রাণে,
তিল তিল করে প্রাণ যেতেছে ভাঙ্গিয়া ;
প্রাণের—উদয়গীতি নিরাশার তানে—
তিল তিল করি বুঝি যেতেছে মরিয়া!
বাসনা হৃদয়ে মোর ছিল কোন দিন।
বাহিতে সংসারে বসি সুখের জীবন ;
যে আশা ফুরায়ে গেছে, হয়ে গেছে লীন্—
সংসার হয়েছে এবে—কণ্টক কানন!
পারি না খেলিতে আর এ ভবের খেলা—
চাহিনা হইতে বন্দী—দেহ কারাগারে ;
দেবতাগো! দাও দাও, মিলাইয়ে মেলা—
দেহ কারাগার মোর—যাক ভেঙ্গে চুরে!
এক আশা ছিল প্রাণে সংসার মাঝারে—
সেই আশা যদি দেব! গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;

তবে আর কেন মায়া জীবনের তরে—
জীবনের সূত্র মম—দাওগো কাটিয়া !
আঁধারে হেরিয়ে আলো পড়িনু ঝাপায়ে !
ভেবেছিনু কাছে গেলে আলোকিবে প্রাণ ;
কোথা হতে ঝড় এল, দিল নিবাইয়ে—
ভেঙ্গে চুরে গেল মোর—আশার স্বপন !
দেবতাগো ! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটি প্রাণ একসাথে দাও মিশাইয়া ;
সহিতে পারি না আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে যাক পোহাইয়া !

বাঙ্গালীর সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ ;
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু নহে কাপুরুষ
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।
করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি' হিংসাদ্বেষ বিদ্রূপ বিলাস ;
এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।
ওই হের, দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।
ওই শুন, দৈববাণী গগনে গৰ্জ্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রাণমন ;
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন !

শুনো না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন
সঁপিও না সর্ব্ব আশা বিদেশী-চরণে,
দূর কর দুর্দ্দিনের মিথ্যা আরাধন
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে!
দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন!
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

নারায়ণ

জগৎরূপে যে বিকাশ তোমার
তাহা কি ভুলিতে পারি?
তাই অম্বুমেলায়, সৌরকিরীটে,
শষ্প আস্তৃত শ্যাম পাদপীঠে,
তাই নীরদ কুন্তলে নির্ঝরোপবীতে,
স্নিগ্ধ কৌমুদীবরণ সিতে,
সদা নিরখিছ চিতহারী!
তাই আঁখি রেখে ওই আঁখি-তারকায়
আপনা পাসরি প্রভাত সন্ধ্যায়
আঁখি-পথ দিয়ে ও মাধুরী পিয়ে
যেন বা তিয়াষ মিটে না।
বিচিত্র তোমার এ কি রূপ হেরি!
ধরে না নয়নে বুঝি পড়ে ঝরি,
যেন জনম জনম দেখি আঁখি ভার
তবু দরশ-পিয়াস ছুটে না।
তোমার মাঝারে হব না অচিন,
তোমা হ'তে যেন রহি চির-ভিন
জলবুদ্‌বুদ্ জলে হলে লীন,
যে সুখ—সে সুখ চাহি না।

কবিতা

(১)

অনন্তরূপিণী আমারি হৃদয় অংশ,
আপনারে কেমনে করিব পূজা।
যদি স্বর্গ হতে আসিতে নামিয়া
পেতে সব অন্তরের উপাসনা,
এস কাছে এস, যেও না চলিয়া
আমার জীবন-মন অপূর্ণ করিয়া।

(২)

বুঝেছি যৌবনতব
হেলেছে পশ্চিমপানে।
আমার আসিবে দিন—
স্বর্ণপাত্রে তপ্ত সুরা,
কামিনীর কলকণ্ঠ
কত দিনে দেখে লই জীবন কেমন।

(৩)

কেমনে দেখিব ভাল ?
তুমি যে আমারি
আপন অন্তর ছায়া
ছিলে মর্ম্মতলে
পূর্ণ করি এ প্রাণের।

(৪)

হে সুন্দরি ! হে সুন্দরি !
কি চাহিছ আর !
এ প্রাণের প্রেম দিছি
কি দিব আবার ?

আমার অন্তর ফুলে
তোমারে রেখেছি তুলে,
চির রাত্র চির দিন সুন্দরি আমার,
অন্তরের প্রেম দিছি
কি দিব আবার !

(৫)

হে ঈশ্বর ! অপার ঐশ্বর্য্য তোমার ।
সর্ব্ব প্রেমধন—মানব হৃদয়
কত সাধ কত আশা
করিয়াছে চিরদিন ।

(৬)

কারে দিব পূজা—মানব হৃদয় !
শিশু যুবা প্রৌঢ় প্রেম ভালবাসা
কোথায় ঈশ্বর ?

———

দ্বিতীয় খণ্ড

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

প্রথম কল্প

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধূনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুল-বাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন্ কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার

উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়; চণ্ডিদাসের সময় সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলার গীতি-কবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে; বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধি পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের

ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক। জন্ম সার্থক। মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক। এই মহামিলন সার্থক। বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখন হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে।"

হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক।"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের

এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক প্রকার মল্লযুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণ-রন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়; কিন্তু—

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত।"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
. . কে দূর করব পিয়াসা।"

আমার ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাবদ্বৈধের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসায় ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনির সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত নাও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে য়াইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব। আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অভিরাম কবি চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন;—ধৈর্য্য ধরুন, সে বাঁশীর রাগিণী আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি মিলিবে। সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব।" নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও এক দিনে, এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম;—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত কাল পক্ষ, দিবস, রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ-দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়। প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল

ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, ইহাই সমাজ বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশজনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান প্রদান, ভাব অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমের তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপতৃষা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকর্ত্তার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য

রংরাজের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে! আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষাস্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটি ফাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলামৃত রসাধার। এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারি লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, সে Naturalist, শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্ও তেমনি ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প. এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু

ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার 'বস্তু' নহে। ইহাই সত্য হিন্দুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রসসাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়।
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটীক হয়॥"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

"রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডিদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য,

এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহামিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার। কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতল-স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো' কথায় ভুলো না," তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এই জন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য! পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরণা যেমন

বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জলন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ-মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাহাকে চাই, তাহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্য-লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়েরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য-রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃৎপিণ্ড এই বিরাট প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের গীতি-কবিতার ধারায় প্রথম যে ভাষায় আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাষা বলে। সুপ্তি ও জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও দো-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষায় সহজিয়া ধর্ম্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রাচীন সম্পদ্। তাহাতে যে সমস্ত পদ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তবে সহজিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক জীবনের স্ফূর্ত্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যারই আলো-আঁধারি রউক না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলি-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে ওই সন্ধ্যা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডিদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে। অনেক ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডিদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না! তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শুধু ভাবের দরজার দ্বারী, সেই মন্দিরের পূজার কিঙ্কর, আমি তাহার কথা কহিব এবং চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গলা কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি বিনিসূতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রসভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে, শাঁস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাঙ্গলা দেশের গৌড়ীয় যুগের চণ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্য্যন্ত মিলে না। চণ্ডিদাসের অনুভূতি আর কাহার হয় নাই। একদিকে বাঙ্গলার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডিদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শিবসিংহ ছিল, লছিমা ছিল, চণ্ডিদাসের ছিল—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি।"

আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রহে সম্মান-সুখভোগের মধ্যে পালিত, আর একজন দুঃখ্য-দারিদ্র্য লাঞ্ছনায় পীড়িত। বিদ্যাপতির লছিমা দূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডিদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুইজনের অনুভূতি এক হয় নাই। দুইজনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুইজনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুইজনেই কবিতার

মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। একজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া থমকিয়া থামিয়া গেলেন, আর একজন সেই মণিকোটায় প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই সহজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে, সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয় জীবনের সুখ-দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ, এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ; তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"...সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।"

শ্যাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পিরীতি যে সুখের সাগর তাহে দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে, অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস-মাধুর্য্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্খা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু তাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ-দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডিদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রসপণ্ডিতের রস-শাস্ত্রের আলাপ নয়; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় মন যে রসোচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দাঁড়ায়। একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস

পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে, যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ-রসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

"আপনহি প্রেম তরু অর বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর জঞো মূড়হি সঞো ভাগল
অপদহি গেল সুখাএ
কুলক ধরম পহিলহি অলি অওল
কঞোণে দেব পালটাএ
চোর জননি নিজঞো মনে মনে ঝখঞো
রোঞো বদন ঝাপাএ॥
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহব বম জানি আগি।
বিদ্যাপতি কহ আপনহি আউতি
সিরি শিবসিংহ লাগি॥"

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা-পল্লব-কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্ণীতি পাইয়া যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুখাইয়া গেল। কুলের ধরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রী শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরু গরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে॥

সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে ॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে ॥
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে ॥
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে ॥”

রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও দরদী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রসের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয় ত উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জ্জনের দুর্নীতিতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডিদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

“গুরু গরবিত বসতি আমার”

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোকে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা

বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে ?' চণ্ডিদাসের রাধা বলিতেছে,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে ॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি"র, ব্যঞ্জনা হইতে 'পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে' এই কথা কয়টিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ওই ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা 'গৃহ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে' ভিতরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তাঁর শিবসিংহের প্রেমে বদ্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন। চণ্ডিদাসের শিবসিংহ ছিল না, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে,—

"কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে,"

শুধু এইখানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

"পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে ॥"

এই সমস্তটাকে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিশাইয়া জড়াইয়া দিলেন, কিন্তু চণ্ডিদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তার পর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রাধার সমস্ত ভাবটিকে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয়

প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে দেবমন্দিরে প্রত্যেক পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে ; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া যেখানে যেটি যেমনভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি, সেই মন্দিরের স্থানে-স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাশ জমান থাকে, খণ্ড প্রস্তর যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি সার্ব্বজনীন ও অতুলনীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্ব্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেননা, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে বিশদভাবে না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়ের পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে. তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে "ত্রিভুবনমপিতন্ময় বিরহ" বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্য-সাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে, উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলার এই প্রেম-রসের সাধনা রাধা-কৃষ্ণ-লীলার গানে গৌড়জনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবাধ হাওয়া, অজস্র জলধারা, শ্যামল প্রান্তর, অজয়ের ফেনমুখ গৈরিক জলস্রোত। পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গলা দেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। সে পদাবলী সাহিত্যের গানগুলিকে বৈষ্ণব কবিরা, এক এক রসে ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুল-লতা-পাতার রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটি খিলান, আর রস যেন সেই খিলানের চাবি, সেই খিলানের পর খিলান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট মন্দির রচনা করিয়াছেন,—যাহাতে মানবের সকল অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব-সম্মিলনে বা রাগাত্মিকায়

আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে যে ভাব, স্তর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যাপতির একটি সর্ব্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে,—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলিল এক॥"

আমার মনের ধারণা যে, লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলে, তাহার কারণ তাঁহারা চণ্ডিদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁও হিয় জুড়ন ন গেল॥"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবে রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবু ত এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, রূপ রস গন্ধও তাঁহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই; এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা,

তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি "প্রেয়"র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে দেখিতে পান নাই, আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

* * * *

আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বদলাইয়া উপরের পর্দায় উঠেন নাই, চণ্ডিদাস সুরের আসল রূপটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন,—

"বঁধু তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।

* * * *

(এক) তিলে শত যুগ দরশন মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥"

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রামের সুর নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাহত-ধ্বনি।

তারপর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ।
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত,
করম সঙ্গ চলি যায়॥

এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায় ॥"

পাপকর্ম্ম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিশে খায়, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসা ত করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়—

অন্যত্র— "আধ জনম হম্ নিদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমান।"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে মজিয়া ডুবিয়া, রসিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এই মরণ-ভয় কেন? প্রেম যে অজেয় অমর; সে ত মরণের সময় ভয় পাইবে না; তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তাহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার; হে মাধব, আমায় তরাও। কিন্তু কি চণ্ডিদাস গাহিলেন,—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা।
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা ॥" *

যাহারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু ন হবে টোট।

ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কাম-গন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভু টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়। চন্দন যেমন খড়িতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডিদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া হেম হইয়াছে, তার আবার পাপ কি; তাহার সেই প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে।" এ বিশ্ব-সংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলই ত মিলিল, তারপর চণ্ডিদাসের শেষ অনুভূতি। এখানে চণ্ডিদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয়-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রসসিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হল বুড়া।
অনিত্য কুলের একি বিপরিত
ন পিতা ন পিতা খুড়া
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ
মাটির জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ

দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথরে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ ॥”

ইহা চণ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ও ওকুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরজন্ম চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিদ্যাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া; কিন্তু বিদ্যাপতি যে খুব বড় কবি এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের জীবনে যে অনুভূতি পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, সেই আদর্শেই বাঙ্গালী এখন পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায়, হয়ত আবার সেই বাঁশীর ধ্বনি কানে আসিবে, প্রাণ-সুন্দরের সে বিমল রূপমাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়া উঠিবে। চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

“মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা
আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,

তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা ॥
আলোর ভিতরে কালোটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ॥”

যে দেশের কথা চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই ? কল্পকলা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে বা মিলে কই ? তিনি বলিতেছেন, “বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখবি, আলোর মাঝে সেই কালো।” এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়া ছিল, মহাপ্রভুতে তাহা জীবন্ত জাগ্রত জলন্ত হইয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাঙ্গলায় জানাইয়া গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণ রূপ আসিতেছে,—উঠ উঠ জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন,—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥”

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাহি না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।”

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান করিলে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ, আমি জানি, তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল তাহার

কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতি-কবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা বলিতে চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য সার॥"

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,

'রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার,

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাহিলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটি কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটি বলিলেই আমার চলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কি না, তাহাতে যে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধা-কৃষ্ণের বিলাস

বিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন ফণা তুলিয়া বাঁশীর স্বর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥"
না সো রমণ, না হম্ রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥"

এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন :—

না সো রমণ না হম্ রমণী
দুহুঁ মনোভাব পেশল জানি।

মন এখানে প্রেমরসে ভরপুর। ভেদ-বুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয়া গেছে। ইহাই কল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-বিবর্ত্ত, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্ম্মে ধ্যানে ধারণায়, হায় সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটিবে, তাহাই বাঙ্গলার মনে লুকাইয়াছিল, যে—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
এখন দেখিনু সে।"

এমন করিয়া ভাব-রাজ্যের খেলা সৃষ্টিতে সহজ সরল রূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আরো সার্ব্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে, জীবনে ও কর্ম্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবানকে শুধু যুগল রস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য দিয়া শুধু

মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে রামানুজ ও মাধ্বের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাঁহাদের আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন। চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ত্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে,—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করেছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুর ধারে
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি,
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাব আগুনি।"

সেই একই কথা—'রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে', রূপ দেখিয়া হৃদয়ের রূপতৃষা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া

বলিয়া উঠিব, তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্য গা যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্ব্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মুরলী শিক্ষা—

"মুরলী করাও উপদেশ
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম

* * * *

জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥"

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তার উপায় কি ? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে, সেও ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতায়ই চণ্ডিদাসের ছাপ। এ কবিতাগুলির মধ্যে চণ্ডিদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার রাগিনীই ফুকারিয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব সত্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কল্পকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহারই একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমায়) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে, (আমি) চাই বৃন্দাবন পানে
এ লইয়া কেশ নাহি বাঁধি।

রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি ॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ ॥"

ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর কুরিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা
কোণের ভিতর কুলবঁধু কাঁদে আকুল তথা ॥
হলুদ বাটীতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরা, চাঁদ পড়ি গেল মনে ॥
মণে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছনছনানি মনে গো সই ছটফটানি প্রাণে ॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব শমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে ॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥"

বাঙ্গলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন কাব্য-রস নাই, এ অপূর্ব্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন। ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকার্ত্তন আছে; এখনও বাঙ্গলায় তাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তরে

লইয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব॥"

ইহা কবি নরোত্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডিদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচনদাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে কবাট দিলে, সে দেশ তো পাই
'বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই॥'
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাঁচয়ে ফণি॥
যতন করে রতন রাখা বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে, ঢোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥"

ইহা অবস্থার কথা, ভাষায় জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চণ্ডিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দ্দায় গাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদ তরঙ্গিণীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শতযুগ ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যাভাষায় আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব ফোট-ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত যুগ অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্খা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্ম্মের সহিত রামানুজের যে লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখনও

পূর্ণ ভাবে মুঞ্জরিত হয় নাই। চণ্ডিদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, লোচনের গৃহধর্ম্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার সূচনা হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাঙ্গলার প্রাণ কোথায়, তাহার মর্ম্ম কোথায়! আবার বাঙ্গলার মাটিতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে!

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অজ্ঞ, বদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত তাপিতের জন্য যে করুণা মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল ফাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না॥"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অফুরন্ত গানের সুধার ধারায় সারা বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-জুড়ান প্রাণ-মাতান সুধা-স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা-পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনি ছিল, তেমনটি আর হইল না। যখন মুসলমান বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখনও সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, সুর নামিয়াছে। তাহার পর সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বাঙ্গলা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালী আপনার চারিধারে আচার ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদিকে শাক্তের পঞ্চ-মকার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুখনা মালার ঠক্‌ঠকি। আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেছিল। একদিকে দেশের পতি মুসলমান, অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া

আনিয়াছিল, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাইয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে। কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ দুর্ব্বল। তাহার উপর মানসিংহ বাঙ্গলার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়ে পলাইয়া গিয়াছিল।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরবির ছবি ও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অঙ্কণে যথেষ্ট নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডিদাস-যুগের বৃন্দা ও বড়ায়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুট্‌না দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই; সে সখীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার ঘেরিয়া যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী
নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গলা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডিদাস গাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। এই যুগকে বাঙ্গলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র বলাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাঙ্গলার সুখ-দুঃখ

জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত গিয়াছিল, তাহার ধর্ম্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃভাবে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন্ মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুর ঘরে যাইতেছেন, কখন্ কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন্ কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।"

বাঙ্গলার সেই আলিপনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তারপর, নিধু, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকলার রূপান্তরে পৌঁছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোঁসাই, তিনি কতকটা রামপ্রসাদের ছাঁদ, ধরণ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহার সব নিধু বাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক্ দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাঁহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা॥"

তখন হইতে বাঙ্গলা জাগিতে শিখিয়াছে। সে গানের যুগের অবতার, সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু বাবু গাইলেন,—

"তারে দেখতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন॥

তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ ॥"

আবার— "তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কান্দে কলঙ্কচ্ছলে ॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে ॥

এই মিঠে ভাষা এই বাঙ্গলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু শোরির পাঞ্জাবী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণে, সেই সকল সুরের ধরণে, এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢঙকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়া তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে ॥"

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে, বাঙ্গলার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাহার পর রাম্ নৃসিংহের গান,—

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥
সুহৃদ্ ভঞ্জন, লোক-গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হতে হয়।
এমন পীরিত করি যাতে তরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।"

* * * *

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়।"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হরু ঠাকুরের গান—

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে ॥

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়
নীর-মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥

* * * *

বিশেষ বুঝিতে নারি নারী বই ত নই (ওগো প্রাণ-সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই ॥

* * * *

কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥”

হরু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার প্রাণকিশোর অখণ্ড চাঁদ যে তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। নির্ম্মল জলে, নির্ম্মল হৃদয়ে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। * * যার এমন প্রেম, কুলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও নাই।

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, “যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবি-ওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।” রাম বসুর গানে বাঙ্গলার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আজ পর্য্যন্ত হইল না।

“দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই
কিছুকাল থাক, থাক বোলে ধরে রাখবো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।”

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না
সরমে মরম কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে—
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন আর করে না॥"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনটি আর হয় না। তেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর বাঙ্গলায় আর এমন গান-বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখীরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনী
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি,

* * * *

না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
—(দেখে চল গো কমলিনী)॥"

দিব্যোন্মাদে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—

আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি ?

"যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা করতে হবে গো আমার সখি বঁধুর লাগি)
'জানি' প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে (সখি আমার
—যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ;
—(সখি আমার চলতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইল আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমায়
—ফিরতে যে হবে গো,—কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলাম কত ;
(যতন করে গো—ভুজঙ্গ-দমন লাগি)
বঁধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত। (হায়! সে সব
—বৃথা যে হলো গো—সখি আমার করম দোষে)॥*

এমন সরল গতিতে সরল কথায় জীবনের খেলায় কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না। কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডিদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যদি এই তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে মূর্তি জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্প-কলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গলা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস চণ্ডিদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের "স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলার মাটিতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাঙ্গলার মাটিতে কি একে—সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধা-ভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতি, সেই আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ জাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই। রাধিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাঙ্গলার মধ্যযুগের 'গানের যুগের' এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তারপর অন্ধঘন মসীময় আকাশ,—আর নাই। বাঙ্গলার প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল। বাঙ্গলা চিরদিন পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙ্গলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি যে "রূপান্তরের" কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখার কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পর্দ্দার কাছেও পৌছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতার শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিস লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা", বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।"

সেই পুরাণ সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙ্গলার ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহই পৌছিতে

পারেন নাই। সকলেরি লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গলা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর স্বর শুনিতে পাইতেছি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকীপুর অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।]

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

(দ্বিতীয় কল্প)

আমার বাঙ্গলার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গলার যেমন শ্যামলশ্রী রূপ, যেমন সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গলার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামশ্রী, সেই—

"নব রে নব, নিতুই নব,
যখন হেরি তখনি নব।"

হেরিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। বাঙ্গলার গানের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্পর্ক আছে, সেই বিনিসুতার মালার গাঁথনির কথা আপনাদের শুনাইব বলিয়া, আজ আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি।

বাঙ্গলার এক অখণ্ড সত্য আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে যখনি যাহার মরমের নিভৃত আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখনি এই মাটির প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয় পাইয়া আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাতেই নিশ্চিন্ত হয় নাই, প্রাণে প্রাণে সেই মিলনবাণী 'লোকহিতায়' 'জগতে ধর্ম্মস্থাপকরা' দেশে দেশে বিলাইয়া দিয়াছে। সেই পরিচয়েই ধর্ম্মের স্থাপন; সেই পরিচয় হইতেই মানুষের সমাজ, শ্রদ্ধা, সংস্কার। সেই মিলনেই এই অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রসমূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া লইয়া জাতি আপনাকে বিকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গলার একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালী আপনাকে সেই পরিচয়ের জোরে জগতের কাছে বাঙ্গালী বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার বুকের ভিতর হইতে সেই সচ্চিদানন্দ চিন্ময় মূর্ত্তি কোন অবসাদের তমো-গূঢ় অন্ধকারে মুছিয়া গিয়াছে। সেই যে বাঙ্গলা তাহার নিজের মাটির পরিচয়

ভুলিয়া গেল, সেই হইতেই এই দিনগুলা আঁধারেই কাটিতেছে; কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জ্বলিয়া উঠা। আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জ্বলিয়া আলোক বিকিরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এই দীপের আলোয় মরিয়া যায়। সকল মানবই সেই পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সকলকেই একদিন সেই সাযুজ্য-পরিচয়ের জন্য আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই হইবে। সেই মধুর পরিচয়টি করাইবার জন্য মাটি অহরহ সজাগ রহিয়াছে। তাহার আর সে চেষ্টার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিশ্রাম নাই, সঙ্কোচ নাই। স্নেহময়ী জননীর মত সে তাহার জন্যই ব্যস্ত। তাই মাটি আমাদের শুধু শরীর দান করে না, আমাদের মন-প্রাণের নূতন জন্ম দিয়া নবজীবন দান করে। শুধু মাটি নহে। মাটিই আমার সঙ্গে অনন্ত রসমূর্ত্তিরূপে আমার প্রাণের সঙ্গে রাসলীলাভঙ্গে একদিন সেই প্রাণমণি দীপখানি জ্বালাইয়া দেয়। সেই দীপ একদিন বাঙ্গলার কবিচিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল; সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণিকোটায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমানযুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ-যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া চলিয়া আসিতেছে এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গলার গানের জন্ম। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গলার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান, সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছি, তাহারই কথা কহিব।

আমার বাঙ্গলার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গলার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যাম-চেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মা'র বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হলহলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটি; সূর্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হস্তে ধান্যশীর্ষ অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্র-দল শ্বেতপদ্ম; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গলা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সেই আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চনমণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ

কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি। বাঙ্গলা ভুলিয়া বাঙ্গলার ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মায়ের রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চোখে পর্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চোখের সম্মুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা—চোখ আর সে রূপ চিনিতে পারে না। ইউরোপীয় ভাবের ছাঁচে, নিজেদের না ঢালিয়া, আমরা যেন আজ কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভাব ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ এই ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন ধর্ম্ম, সাহিত্য শিল্প ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দ্দিনে সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ বাঙ্গলার ফেরঙ্গ সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সেই সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রুধিরাদ্রবসনা করালী—আর দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

সে যুগলরূপের কি ওর আছে! আধশ্যাম, আধরাধা যেন মেঘ-অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায়; মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া হাসিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ প্রতিনিমিষেই সেই যুগল রূপে মিলাইয়া যায়।

'মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥''

আর বাঙ্গালীর কবি চণ্ডিদাস সেই রূপের পাশে রহিয়া ভাবে গদগদ হইয়া,
"চামর ঢুলায়ত।"

এই ছবি বাঙ্গলার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক এই রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে সাধনাঙ্গের ধারার পরিচয় রামপ্রসাদেরও ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাইয়াছিলেন,—

"গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।"

এই সব গান বাঙ্গলার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে, জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ বাঙ্গলা সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহার জীবনের সেই রূপ যে রূপের চরণে,—

"মদন মূরছা পায়।"

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। নিজেদের বাঁচার মত বাঁচিতে হহবে। শুধু একটা কাব্যের ধাঁচা দেখাইয়া, রসবোধের রসিক হইয়াছি বলিলে, প্রাণ বুঝে না। আত্মায় আত্মায় রমণে সে রস উপভোগ হয় না। মনুষ্যজীবনের যে চরম পরিচয়, তাহার পথে শুধু অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আসিয়া ব্যবধান করিয়া দাঁড়ায়। তাই এই মিথ্যাময় ফেরঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গলার জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে। আজ তাহারি বার্ত্তা আমি বহন করিয়া আনিয়াছি। আমি প্রাণে প্রাণে যে অনুভূতি দ্বারা—সাধনের দ্বারা জীবনের সে রূপের যে পরিচয় পাইয়াছি, আমি বাঙ্গালী বাঙ্গলাকে তাহা শুনাইবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া প্রস্তুত হইয়াছি। আজ এই সমসাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত অন্ধকারের তামসিকতার দিনে সকল রাগ-দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের জীবনের ধারাকে বাঁচাইতে হইবে। এই ভাবের অপচারের দিনে, ফেরঙ্গ-সাহিত্য ও জীবনের দিনে সমগ্র শক্তিকে একবার অন্তর্ম্মুখী করিয়া বাঙ্গলার সেই প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গলার সেই প্রাণের গানের সন্ধান কর! দেবতা চায় অমৃত, অসুরে চায় অনৃত। মানুষের এই দেহ-মন-প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রয়ের ভিতর অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিয়াছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার, মহতো ভীতি হইতে নিজেদের বাঁচিবার জন্য বাঙ্গলার সবুজ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিনের আলোকে নিজেদের সন্ধান করিতে হইবে, তবে সেই অমৃতে আমাদেরই অধিকার। বাঙ্গলার সশক্তিক কবি চণ্ডিদাস রামপ্রসাদের, বাঙ্গলার স্বধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হহয়াছে, প্রাণের জিনিসকে তাঁহারা যেমন বুকের ভিতরে প্রাণ ভরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, সেই সাধনের পথে সেই অনুপম কাব্য-সৃষ্টির পথে নিজেদেরও দেশের গতিকে লইয়া যাও নিজের জীবনে ও কর্ম্মে মিলাও। তোমার নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ-

জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের—বাঙ্গলার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মের এই পরিচয় পাইলে ;

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,"

নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় করিয়া আনিয়া, নিজের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, মনকে চোখ ঠারিয়া যাহা কিছু রচনা করনা কেন, বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না। তাই আজ দিন থাকিতে থাকিতে ফিরিতে বলিতেছি। এ ব্যাধির যে ঔষধ তাহা ওষধি-লতার মত বাঙ্গলারই বনে জ্বলিতেছে।

আজিকার দিনে এই জীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে, এই ব্যর্থ-কাম বৈদেশিক খোলসপরা জীবন-কল্পরাজ্যে যে শ্রীরামপুরী খৃশ্চান পাদরীর নৈতিক সভ্যতা ও পাপবোধের অপচার মিলাইয়া, আজ শতবৎসর ধরিয়া জীবন ও সাহিত্যের নামের, জীবনের বিচিত্রতার নামে, ধর্ম্মের নামে যে পুঞ্জীভূত ধূলা, পুঞ্জীভূত অধর্ম্ম, ক্রীতদাসের পরানুকরণ,—জীবনে ও সাহিত্যের, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে ছাপ পড়িয়াছে ; গানে, সুরে, চিত্রে, স্থাপত্যে যে ক্লেদ, যে পঙ্ক, যে ধূলি, যে খড়ি-মাটির রং পড়িয়াছে, তাহাকে মুছিতে হইবে ; ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মনুষ্যত্বে ভাবের দাসত্ব, ভাষার দাসত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া আর কোন পথ নাই,—নাই। তাই সেই জীবন ও ধর্ম্মের প্রাণ ও সাহিত্যের মাঝে বাঙ্গলার সেই চিরন্তন বাণীকে তোমাদের কাছে, সাহিত্যের মধুর বিচিত্ররূপের ভিতর দিয়া আনিয়া দিতেছি ; গ্রহণ কর! গ্রহণ কর! ইহাকে বৈষ্ণবতত্ত্ব বা রসের কথা বলিয়া, তত্ত্বের কথা না জানিয়া, রসের কথা না বুঝিয়া ফেলিয়া দিও না। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ইহা বাঙ্গলার মাটিরও প্রাণের মিলন-ভূমি ; এই কাব্যলোকেই বাঙ্গলার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ! মনে করিও না, তোমরা আজ যাহাকে বিচিত্র হওয়া বলিতেছ—তাহা সত্যসত্যই বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিচিত্রতা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গলায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাতজনিত শতখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে

যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজেকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ব ভাবে বিচিত্র হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাব-মোহ এই "বিশ্ব" মোহ যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে, নাড়ীচক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে। বাঙ্গলার নিজের প্রাণকে জানাই তাহার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, সাহিত্য ও জীবনকে আমি চণ্ডিদাসের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। তাহা নয়, নদী-স্রোত উল্টা ফিরিয়া যায় না, সে আপনার পথ আপনি কাটিয়া লয়। সৃষ্টির বীজ অন্তরেই নিহিত থাকে, আঁখির আগে আগেই রূপে ধরা দেয়, পিছনে নয়। বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডিদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গলার স্বাভাবিকতা ফরাসী রুশের Naturilism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে। তাই সেই যুগের প্রাণময় প্রাণের সুরে ঢালাই করা গানের ধারা ও উৎসবের খোঁজ করিতে চাই। আশা করা যায় যে, বাঙ্গলার সেই কাব্য সাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার, তাহার জীবনকে সত্য করিবার পথ আবার আমরা সাধন করিব এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবই করিব ও তাহার সেই উৎসের মূল রসের পথ ধরিয়া সেই নিখিল রসের সকল আনন্দের মাঝে আমাদের বাঙ্গালীজাতির জীবনের সার্থকতা অনুভব করিব।

কেহ কেহ বলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশ পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন। এই পরাধীনতায় তাহার অনেক মানুষী বৃত্তিও অনুশীলন অভাবে নষ্ট হইয়া গেছে। স্বাধীনতার যে আনন্দ, জাতীয়তার যে সংবিৎ, যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তাহাই নাকি কল্পকলার প্রাণ। এই স্বাধীনতাই তাহার বিরাট উপায় ও ফল। ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, বাঙ্গলা তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার জীবনের সরল গতি হারাইয়া, সত্য সুন্দর শিবের ধ্যান ভুলিয়া গেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গলায় সাংখ্যকার কপিলের জন্ম, এই বাঙ্গলাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গলাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গলাই একদিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার স্বাধীনতা—তাহার আত্মার আত্মস্থ-সংবিতের অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। এই অনন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার জীবন্ত রসানুভূতির জন্য বাঙ্গলা যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই

কত বিচিত্র রূপে বাঙ্গলার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার সাধনা, বাঙ্গলার স্বাধীনতার আদর্শ সেইখানে, বাঙ্গলার কল্পকলার ভিত্তিও সেইখানেই। সেই-খানেই আমাদের গীতিকবিতার ও গানের প্রাণ।

মনুষ্যজীবনের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কখন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় হয় নাই—হইবেও না। শুধু পরের দাসত্বের বোঝা ও শিকল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাতে জীবনের স্বাধীনতা-রক্ষা হয় না। মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তির সকল রসের অনুভূতির, সকল যাতনার উপরে, সকল ভোগের উপরে নিজেকে—নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে স্বাধীনতা অর্থহীন দেহভোগীর প্রাণহীন বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার আত্মার সংবিতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন সে যুগও—বাঙ্গলার স্বাধীনতার যুগ নয়; কিন্তু দারিদ্র্যের পরাধীনতার—সমাজের সঙ্কীর্ণতার সমস্ত সঙ্কোচ ও ব্যবধানের মধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে দারিদ্র্য, পরাধীনতা সমাজের পেষণ কিছুতেই পাড়িতে পারে নাই। এই সব মহাপুরুষদের প্রাণ-বেদীমূলে মাটি যে সমিদ্‌ভার আহরণ করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারা একনিষ্ঠ সাধকের ধারায় নিজেদের মাটির সম্পর্কে এক করিয়া সে প্রেমাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। কোন সমাজ সংহিতা, কোনরূপ দণ্ড তাঁহাদের এই জ্বলন্ত জীবন অগ্নিশিখা নিভাইতে পারে নাই। আত্মার সেই প্রেম রসের অনন্ত বিভূতি, এই পরাধীনতার ভিতর হইতেই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রেমের সৌরাজ্যে তাঁহারা চিরনূতন সম্রাট; কেমন করিয়া অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের জীবন্ত প্রেমভরা মণিকোঠায় পৌঁছিয়া, সেই রসচিন্তামণি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই সাযুজ্য-পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার—উপলব্ধি করিবার বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য "রূপক"। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণবকবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। রূপ-অরূপের প্রভেদ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ, বস্তু ও অবস্তুর প্রভেদ শুধু বিচারদ্বারা কতদূর বোঝা যায়, বলিতে পারি না। শুধু বিচার-বুদ্ধির উপরে আমার সেরূপ আস্থা নাই। খুব সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্য মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া, সেই সত্য-মিথ্যার সাগরসঙ্গমে দাঁড়াইলে গঙ্গাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সাগরও দেখিতে পাওয়া যায় না। মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না,

মায়াও আপনার প্রকৃতরূপে দেখা দেয় না। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া, সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে গেলে বোধ হয়, রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের সে সাধনা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সাধনা। বৈষ্ণবকবিদিগের প্রত্যেক অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই; সেই প্রাণকে যে জানে না, জানিবার চেষ্টাও করে না, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বৈষ্ণবকবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গলার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণ, যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাণ-কেন্দ্র হইতে ইউরোপীয় বিশ্বসাহিত্যের ঝড়ে শতধা জীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন তাঁহারাই এই বিশাল বিশ্বলীলার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্রোতের মাঝে বৈষ্ণব কবিতাকে প্রাণহীন রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কৃষ্ণ যদি বাস্তবিকই কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দেন, তবে ত এ জীবনকে ধন্য মনে করি। কৃষ্ণ বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনদিগকে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতা এত সরল, এত সুন্দর, এত রূপ-বৈচিত্র্যে ভরা-ভরা। এই সব কবিতা বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যের মোহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহার খোঁজ করিতে হইবে, মুখস্ত করা জ্ঞানের যে অহঙ্কার, তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গলাদেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গলা যে প্রাণে বৈষ্ণব। বাঙ্গলার স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই তপস্যা করিতে হইবে। তোমাদের ইহাই বলিতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতসভ্যতার ইতিহাসে, হিন্দুর জাতীয় গরিমার ইতিহাসে, তাঁহার স্থান অতি-অতি-ঊর্দ্ধে, সেই আদর্শ মহাপুরুষকে শ্রীভগবান্ বলিয়া ভারত-আপামরসাধারণ মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া ভারত সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত—তাঁহারই লীলার মহাভাবে পুষ্ট ভারতের কাছে ইহা রূপক নয়, বাঙ্গলার কাছে ইহা রূপক নয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা-আভাস চঞ্চল মূর্ত্তিতে বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষ মুখরিত ও বিকশিত। যাহা জাতির প্রাণের ভিতর দিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ইহলোক-পরলোককে ভাঙ্গা-চোড়ার ভিতর দিয়া লইয়া

আসিতেছে, তাহাকে রূপক বলিয়া, রকম করিয়া, পাশ্চাত্যের রূপক লইয়া, এত মাতামাতি করিলে চলিবে কেন? চটুলতায় কোন অধ্যাত্মসাধন হয় না। যাহারা দেশের দশকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ-সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে, যে আলোক তপস্যার দ্বারা প্রাণের পরতে পরতে ঝলকিয়া উঠে, আত্মার সে স্বানুভূতি যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনটা নিজেদের কাছেই রূপক, তাহাদিগকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই; শুধু এইটুকু মাত্র যে, আপনার আত্মার পথ ধরিয়া বাঙ্গলার নবজীবন-উষার প্রাক্কালে, নবোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেশের সাধনার ধারার মধ্য দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, আপনার কল্যাণের পানে মুখ তুলিয়া, মন মুখ এক কর তবে বাঙ্গলার আত্মস্থ সাধনার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। চণ্ডি-দাস, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের মধ্যে, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালবাসা, মিলন, বিরহ, সমাজের সহিত বিরোধ, প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রচলিত আচার, অনাচার, তান্ত্রিক-আচারের সঙ্গে বিরোধ ও মিলন, স্বাভাবিক হইবার সহজ হইবার যে একটা প্রবল আকাঙ্খা আছে, তাহারি কথা—এই বাঙ্গলা কবিতার ভিতর হইতে আমি দেখাইতে চাই। যে সকল কলকলার ধারায় এই বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ, এই চণ্ডিদাসের ও রামপ্রসাদের গান বাঙ্গলার সেই কলকলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছে। আজ এই ইউরোপীয় অবভাসের দিনে আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার ঘরে সে দীপ আবার জ্বলিয়াছে। জানিও ইহাই বাঙ্গলার অভয়-বাণী। এই বাণীকে সত্য ও সার্থক করিতে হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশী। আধুনিক কবিতার আর এখন inject-এর (স্ব-স্বভাবের) পর্য্যায়ে নাই; তাহা এখন উর্দ্ধগি, অতীন্দ্রিয়ের সুবাসে মত্ত। ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয় যাঁহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? রক্ত-মাংসকে, মাটিকে অস্বীকার করিয়া মানুষের সাধ সোহাগ অস্বীকার করিয়া কাব্যলোকে কোন শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আধুনিক নকল ইংরাজীনবীশদের বুদ্ধির বায়নাক্কায় পড়িয়া, বহুকাল হ-য-ব-র-ল হইয়াছে। তাই এখন শুনিতে হইতেছে যে, বৈষ্ণব

কবিতা erotic। বাঙ্গলার সাধনা চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সকল রস আহরণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের মুখে বল্গা দিয়া চালাইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সকল বৈচিত্র্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দিয়া তাহাদের সকল বিভিন্নতাকে সে এক করিয়াছে। বহুর মধ্যে, বহু বিচিত্র রসের মধ্যে বাঙ্গলা সোমরসের আস্বাদন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গলা কখনও অস্বীকার করে নাই। বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ-রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবতভোগের ইন্দ্রিয়। বাঙ্গলার কবি সাধক, সেই ভোগে আত্মস্থ শুদ্ধির মধ্যে ভুক্তিকে সে প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় রমণ করে,—এ ভোগ ভাগবত-ভোগ। বাঙ্গলার গীতিকবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃশ্চান পাদরীর কাছে বাঙ্গলার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা ও পাপবোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া, প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব ?

আজিকালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃশ্চানী নীতিকথার ন্যাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গেছে; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার—সমাজরক্ষার নামে হিংসার অত্যাচার—মানুষের উপর মানুষ যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, সব হইয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রূপ, কত রঙের বিচিত্রতায় বদল হইয়া গিয়াছে। কত কবি জন্মিয়াছে, কত অকবি জন্মিয়াছে; গত কয় শতাব্দীর উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা, কত ব্যাত্যা, কত বিরোধ ও বিদ্রোহের অগ্নিতে সমাজ, মানুষ ও ধর্ম্মের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আলোড়ন হইয়াছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে বাঙ্গলার যে শান্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি—সে সামর্থ্য হারাইল কেন? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ-যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডিদাস যে ব্রজপ্রদীপের প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, সেই প্রদীপ আবার জ্বালাইতে হইবে। কত বিপদ, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রস-মূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কথাটি—সেই পথটি আমাদের বিশেষরূপে

ভাবিবার ও দেখিবার বিষয় ; সে বিষয়ে অন্যমত থাকিতেই পারে না। সেই পথ না জানিলে দেশের সাহিত্যের ধারাকে আমরা কখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব না। সেই ধারা সরস্বতীর ধারার মত বালুর নিম্নে কোথায় লুকাইয়াছে। তাই আজ সাহিত্যের কাননে মুঞ্জরিত তরু নাই। তাল-তমাল-রসাল-পিয়ালের সে বনশোভা নাই, অশ্বত্থ-বটবৃক্ষ নাই, সপ্তপর্ণ নাই। তাই এখন পোড়া বাঙ্গলা শূন্য বনভূমিতে পুঞ্জীকৃত "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" বালুর নিম্ন হইতে আমরা সরস্বতীকে আবার বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করিব।

আজ কেন তাহা নিভিল ? এর কারণ খুঁজিয়া দেখিবে, অবশ্য একেবারে তার কোন নির্দেশই পাওয়া যায় না, এমন কথা নয়। সংসারের প্রত্যেক কারণ ও কার্য্য জড়াইয়া এত বিচিত্রতায় পরিণত হয় যে, অনেক সময় সেই আসল কারণটার কোন নিরাকরণই হয় না। আমাদের এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই, এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করিবেন ; তবে সকলের চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা আমাদের প্রকৃতিকে হারাইয়াছি। কেমন করিয়া যে তাহা হারাইলাম, তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিবে। সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা আমাদের ভুলিয়াছি। সিংহ যদি একেবারে নিজের মুখখানা তার প্রাণের আয়নায় মর্ম্মের আলোকরশ্মিতে দেখিতে পায়, তবেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তাহাই। নিজেকে সিংহরূপে চেনা চাই—সাহিত্যের ও কাব্যের চরম কথাও তাই—আপনাকে চেনা চাই। সেই চেনার ভিতর—সেই প্রাণের মরম-পরিচয়ের ভিতর—যত কথা সব লুকাইয়া থাকে, সেইখানেই যত খেলা। এই প্রাণ-মন-দেহ, এই প্রতিষ্ঠাত্রয় দিয়া নিজেকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলে, এই যে আমার মৃন্ময় ভাণ্ডটি মুহূর্ত্তেই চিন্ময় হইয়া উঠে। মানুষ আত্মস্থ হয়, এই আত্মস্থ অবস্থাই চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদের হইয়াছিল। এই জাগ্রত জীবনের খেলাই তিনি কৃষ্ণলীলার ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের মহামিলন-পরিচয়ের মুহূর্ত্তগুলি গানে সুরে সৃষ্টি করিয়া গেছেন। আধুনিক কবিদের মত নিজের প্রাণের সঙ্গে কোন পরিচয় না রাখিয়া, শক্তিহীন সমালোচনার তরঙ্গ-ভঙ্গের ভাবুকতায় হাবুডুবু খাইয়া, শুধু কেবল বালুতটে ফেনা ছড়াইয়া, কীর্ত্তির ফেনা রঙিন করিয়া যান নাই। আধুনিক কবিরা আত্মাকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমের মধুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সকল রসের—সকল রূপের সঙ্গে প্রাণমনে সবিকল্প পরিচয় করিয়া আত্মায়-আত্মায় রমণে যে আনন্দ তাহা আস্বাদ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সমুদ্রপারের তীর হইতে শুক্‌না সমুদ্র-ফেনা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বোঝা ভার করিয়াছেন।

তাই আজ ডাক দিয়া বলিতেছি, হে আমার বাঙ্গলা আপনাকে চিনিবার সুযোগ আপনিইত হইয়াছে। আত্মা-অর্ঘে বল্গা দিয়া, এ জীবন-রথকে চালাও, জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ তোমার ইহাই পথ, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই : —নাই। আজিকার এই সাহিত্যের দরবারে আমি পুরানো কথাটিই আবার বলিতে আসিয়াছি। গীতি-কবিতা কি ? গীতি-কবিতার প্রাণই বা কি ? গানের প্রাণই বা কি ? কেননা বাঙ্গলা দেশে যাহাকে পদাবলী সাহিত্য বলা হয় বা তাহার পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারায় যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলগুলিই সুরে গান হয়। আমাদের গান ও বিলাতী গীতি-কবিতায় কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য না বুঝিলে দেশের প্রাণের সঙ্গে ঠিক পরিচয় লাভ হইবে না।

বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়। যে কবির আত্মায় সমস্ত বিশ্বের এই রূপ প্রতিভাত হয়, আর তাহা কবির মনের রূপের ছাঁচে গড়িয়া উঠে, সেই কবির কার্য্যই এই গীতি-কবিতা ; কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।

আমাদের দেশে চণ্ডিদাস রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন। সেই আনন্দের সুরের রসে সব কথাগুলি ভিজান। মানুষের যে প্রাণের আকৃতি, সে যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া স্বাভাবিকভাবে পাখীর গান গাওয়ার মত গলা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই হইল—বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ। সেই জন্য আমি বলিতে চাই, বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর হইতে গানই বাহির হইয়াছিল, ইংরাজীপ্রমুখ যে বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে, তাহারই ফল এই বিলাতী গীতি-কবিতা। এ ধারা বাঙ্গলার নিজস্ব নয়। মনকে, চক্ষুকে, প্রাণকে ঠিক ঐ বৈদেশিক শিক্ষার ছাঁচের ভিতর দিয়া না লইয়া গেলে, ও গীতি-কবিতার ধারা সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া দুষ্কর। গীতি-কবিতায় থাকা চাই,—তাহার ভাবের একাত্ম-রস আর সেই রসের একটি পরিপূর্ণ স্বরূপ ফুটাইয়া তুলাই তাহার কাজ। যেখানে সেই রস খুব গাঢ় ও খুব অল্প কথা বা ভাবের দ্রুতকম্পনের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবে, সেইখানে গীতি-কবিতার সার্থকতা। সেই

ভাবের ও রস-সৃষ্টির মুহূর্ত্ত যখন কবি তাঁহার নিজের আত্মায় প্রতিফলিত আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনি তাহা রূপান্তরে পরিণত হয়। আমরা আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই জিনিসটি পাই না ; এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু গান যখন আসে, তখন সুর আসে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কথা, শুধু সেই রূপকের—সুরের সেই রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। সেইখানে সুরের সঙ্গে রসিক কবির আত্মার স্বানুভূতি জাগে, পরস্পর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে, তাহাতেই সুর ও কথা আপনিই আসে। যে গান রসের সৃষ্টি-মূর্ত্তিকে সুরের রূপে ঢালাই করিয়া দেয়, সেই গানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি। ইংরাজী গীতি-কবিতায় ভাবের যে দোলন বা গতির প্রকাশ অধিকাংশই কবির মনের গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গলা গান তাহা নয়, তাহার গতি আত্মার আপনার নিজস্ব। তাহার সুরের ও ভাবের মাদকতা জাগে, সেই উন্মত্ততায় সে গানের ধারা সৃষ্টি করে। ইহাই সেই 'সাধিতে নিজ মাধুরী।' আমাদের দেশের মেয়েলী-ছড়া, গাথাকে গীতি-কবিতার স্তরে ফেলা যাইতে পারে বটে, তবে তাহার ছাঁচও বস্তুর নিজের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির প্রাণের ছাপ নাই, বস্তুর অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় সরস থাকে। এই বিলাতী গীতি-কবিতার আমদানীতে আমরা ঠিক নিজেদের রাখিতে পারি নাই। আমাদের আত্মস্থ হইবার পথে, এই পথ—এই ছাঁচ প্রকাণ্ড অন্তরায়। কেন না, বস্তুর সহিত ইহা আমাদের সম্যক্ পরিচয় করাইয়া দেয় না। একটা কুহেলিকাময় আবরণের ভিতর আমাদের যে নিশ্বাস, তাহা রুদ্ধ হইয়া আসে। এই যে ভাব, ইহা সত্যও নয়, অসত্যও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, এই এক অদ্ভুত অবস্থায় আধুনিক গীতি-কবিতা দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মাটির রসের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের দেহের ও মনের রসের একটা অন্তরের মিল আছে। সেই রসের টানে, সেই রসের আবেশে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার দেশের প্রাণের পরিষ্কার নিখুঁত পরিচয় করাইয়া দেয়। বিলাতী Lyric-এর আর একটা দিক্ আছে, তাহাতে অনন্তের দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু অনন্ত দুইটা হয় না ; আপনাকেও দেখাইব, অনন্তকেও দেখাইব, তাহা হয় না। কল্পনা যেখানে মূক, মানুষ সহজেই সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। একটা কোন স্বচ্ছন্দ পরিষ্কার প্রাণের অনুভূতির কোন রেখাও পড়ে না ; কোন রূপের দ্বারাও প্রকাশ করিতে পারে না। বাঙ্গলার কবিতায় চণ্ডিদাস-রামপ্রসাদের যুগে, কি কবিওয়ালাদের সময়েও এ ভাব তাঁহারা তাঁহাদের গানে কখনও আনেন নাই। তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই।

তাই সেই বাঙ্গলার গান মানুষের জীবনের ধারায় সাধনের পথে আত্মার প্রতিধ্বনি, যেন রাগে সুরে মাখামাখি করিয়া তন্ময় হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আবার সেই আত্মার গভীর নিগম দেশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাবগুলিকে গলাইয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যেন গলিয়া রস-নির্ঝর ধারায় ঝড়িয়া পড়ে। তাহাই আবার সুরের রঙে, ভাবের রঙে রঙিন হইয়া, এক নূতন জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করে, সেই ধ্যান-লোকেই কাব্যলোকের রূপান্তরের অনুভূতি হয়।

প্রথম কথা, আদর্শ কি? কাহাকে বলে? আদর্শ সেই পরিপূর্ণ রসের আকর লীলামৃত সুন্দর অনন্তশক্তির আধার শ্রীভগবান্। তিনি নিজেতে নিজেই অধিষ্ঠিত—স্বাধীন, সেই জন্য অনন্ত। লীলার মধ্যে যিনি বিশৃঙ্খলাকেও সুশৃঙ্খলায় লইয়া আসেন; সেই চিদ্‌ঘন-আনন্দ-সুন্দর পুরুষ, জড় ও জীবের যিনি আশ্রয়, লতা-গুল্ম, পশুজীবন, মানবজীবন, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য্যলোক, মহাব্যোমে অনন্ত কোটী নক্ষত্ররাজী যাঁহার খেলার বুদ্‌বুদ্‌, যিনি প্রতিরূপেই স্বপ্রকাশ, তিনিই এই বিশ্বের আদর্শ। তিনিই সুন্দর, তিনিই কল্যাণ, তাঁহার সৃষ্ট, অনন্ত রূপই সুন্দর এবং সব সৃষ্টিই সেই জন্য সুন্দর। যেখানেই তাঁহার সুন্দর রূপের প্রকাশ হয়, সেখানেই উজ্জ্বল বিভোর আলোকচ্ছটায় সৌন্দর্য্য শতগুণেই ফুটিয়া উঠে। স্বপ্রকাশ স্বাধীন আত্মার যে অনুভূতি ও সৃষ্টি, তাহাই কল্পকলার রূপসৃষ্টি। আর যে রূপের অনুভূতির আদর্শ ও রূপে অঙ্গাঙ্গি ভাবে পূর্ণ সরস হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। সেই মুহূর্ত্তেই আমরা চিদানন্দ-ঘন-রসের স্ফূর্তি যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অনুভব করিতে পারি। সৌন্দর্য্য সেইজন্য সকল রকমের স্বাধীনতার উপরই ফুটে। জীবনের সাধনার ধারায় যখন মন-প্রাণ-দেহের সর্ব্ববাধা-বন্ধনবিহীন ভাবে আবেগে অনন্তের দিকে মুখ তুলিয়া চায়।

প্রাণের ভিতর সেই অনুভূতি যখন দেহ-মন-প্রাণে একাঙ্গীভূত হয়, তখনই জীবনের রূপান্তর। এ রূপান্তর বুদ্ধের জীবনে হইয়াছিল, যখন বুদ্ধ মহাতপস্যার পর গেহকারককে নিজের ভিতরেই চিনিতে পারিলেন। এই রূপান্তর—চণ্ডিদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির-অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন-রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিল। রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূরণ হইতে লাগিল। এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে

গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই যে মানুষের জীবনের ধারায় সাধনাঙ্গের একটা সহজ দিক্ আছে, সেই রূপের পর রূপের অবিরাম রূপস্রোতে অনুভূতি ও সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিয়া ফেলে ;—অমনি রূপের আসল রূপ ধরা যায়।

বাঙ্গলাদেশের এই যে গানের ধারা—এই যে কল্পকলার ধারা, যাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না, বাঙ্গলা দেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের—সকল সৃষ্টির—সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যে সহজ সরল আদর্শ আমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠে, সেই আদর্শ ঐ রূপের মধ্যেই চিত্রে, সুরে, কথায় নানারূপের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ হয়, যেমনই প্রাণে অনুভূতি হয়, অমনি রূপ-সৃষ্টি। এমন করিয়া রূপের পর রূপ, মূর্ত্তি, স্রোতের মত লীলা-চাঞ্চল্য বারিধি-বুকে লহরে লহরে দুলিয়া উঠে। সেই লীলাতরঙ্গের যে দোলন-রেখা, সেই রেখার লীলার মধ্যে আমিও একটা রেখা, আমার সেই তরঙ্গ, আমার সেই দোলন, আমিও সেই অনন্ত লীলামৃতের মধ্যে রস-রেখায় রসিয়া আছি। আমি কখন এক, কখন বহু ; আবার এই এক ও এই বহুর মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি। দোল চলিয়াছে, খেলা চলিয়াছে, আমি 'জনমি-জনমি' আমার দেহ-মন প্রাণ দিয়া এই রস-সাধন করিতেছি। সেই রস-সাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুভূতির সঙ্গেই আমার যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বানুভূতি, তাহা হইতেই আমার কল্পকলার সৃষ্টি। তখনই প্রাণের ভিতর আদর্শের পরিপূর্ণ রসানুভূতি হয়।

বাঙ্গলা দেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে, তাই আমি সেই গান ও সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাঙ্গলা দেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দের জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল।। ঘরে ঘরে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রতি গৃহেই ভক্তের ভগবান্ অধিষ্ঠান করিলেন। প্রতি গৃহেই গোবিন্দের মন্দির উঠিল। সে অমিয়ভরা হরিধ্বনি মুসলমান-সভ্যতার ছাঁচকে বদল করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করুন, দেখিবেন—আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণন পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর সে রসচিত্রের ও সুরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real তাহার বিচার করিতে পারেন কি ?

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোহে ধরিলেক গিয়া॥
'কে রে' 'কে রে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।'
নিত্যানন্দ বোলেন, 'প্রভুর বাড়ী যাই॥'
মদ্যের বিক্ষেপ বোলে কিবা নাম তোর ?
নিত্যানন্দ বোলেন অবধূত নাম মোর॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥
দয়া হইল জগাইয়ের রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল দুই হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি মূঢ়।
দেশান্তরি মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মনে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যাথে চক্র আসি উৎপন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে না দেখিল॥

প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু! রাখলি জগাই।
দৈব সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

এই যে বৈষ্ণবের শক্তি ও প্রেমের চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই প্রেম-ধর্ম্মের স্রোতে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সাহিত্য কল্পকলা গঠিত হইয়াছিল; তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই যে চরিত-চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? Realism না Idealismএর কল্পকলা? আমি বলিব এই যে, অভিনবরূপ চরিত্র-সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গলায়ই সম্ভব, কেন না, ইহা বাঙ্গলায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য। সেই সত্যের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস অতি নিখুঁত তুলিকায় সংযমের সহিত তাহার সমস্ত ভাবটি ও চিত্রটি একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। যখন দরদরধারে রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে, তখনও সেই দুই জনের মাঝে দাঁড়াইয়া 'মোর ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর' ইহাতে কি প্রেমের জাগ্রত রূপান্তর হয় নাই? ভগবান্ আমাদের এই দুই হাত দিয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আমরা কত রকমের খেলাই তাঁহার সঙ্গে খেলিতেছি! কত দুঃখই তাঁহাকে দিতেছি, তবুও প্রেমময় আয়—আবার সেই আয় বলিয়াই ডাকিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দের এ প্রেমলীলা কি ঠিক সেই শ্রীভগবানের আদর্শের অনুভূতির রসে সিঞ্চিত নয়? কোল দিয়া মার খাইয়া, তেমনি হাসিয়া খেলা করিতেছেন। নিত্যানন্দের জীবনে সাধনের ধারায় যাহা রূপান্তর হইয়াছে, চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কল্পকলা রস-সৃষ্টিতে সেই রূপান্তরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রস-সাধনার ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট ফুটিয়াছে। সেই জীবনকে আদর্শ করিয়া মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া, আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে ও কেহ কেহ সেই রূপান্তরের পরিচয় ও জীবনের সাধনের ও কল্পকলার ধারায় গীতিকবিতা ও গানের সৃষ্টিতে বেশ ফুটিয়াছিল, সৃষ্টিতে বেশ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সেই পরিপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টিতে পঁহুছিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের যে মধুর রসের সাধন, তাহার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই অপূর্ব্ব সখ্য, দাস্য-বাৎসল্যমিশ্রিত যে অকিঞ্চন সমরস, তাহা আর কোন সাহিত্যে নাই। এই রসসৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিরা সেই

আদর্শেই নিজেরা সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত রূপ-লাবণ্য, তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর, তাঁহার সেই অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার সংযম ও হৃদয়ে সমাহৃত অনুপম প্রেম, যে বন্যা বাঙ্গলায় আনিয়াছিল, সে ভাবের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ভাবের ধারায় বাঙ্গলার সাধনার সঙ্গে এক অতি নিগূঢ় যোগ আছে। চণ্ডিদাস ও বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা তাহার এই রস-সাধনা, এই সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বলোককে প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলা তখন মৃদঙ্গের মেঘগুরুনিস্বনে ও হরিধ্বনিতে মুখরিত ছিল। পবনে গগনে সে দিগ্‌দিগন্তে প্রেমের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া দিত। সেই মহাপ্রেমিক যখন মহাসমুদ্রের বুকে রূপের নৃত্য দেখিয়া, আপনাকে সেই সৌন্দর্য্য-রসসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্বেলিত মহাসাগরের মহাপ্রাণের সঙ্গে যখন একাত্ম হইয়া রূপের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাইয়া নির্বিকল্প-মহামিলন লাভ করিয়াছিলেন, সেই এক চন্দ্রমাশোভিতা নিশা! শ্রীভগবানের রূপের তৃষ্ণা কেমন রূপের ধারার ভিতর দিয়া রূপে রূপে মিলিত হইয়াছিল! সে লীলা, সে খেলা, সে প্রেমের অজেয় তুলনা কোন দেশের সাহিত্যে মিলিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, এই রূপ, এই সুন্দরের হাসি, তাঁরই রূপ, তাঁরই হাসি। তাঁরই এই উন্মাদনা, তাঁরই এই উন্মত্ততা, তাঁরই এই আবেগ, তাঁরই এই আকুলতা। চন্দ্রমাও তাঁহার, আমি তাঁহার, তিনিও তাঁহার। এ যে রূপে রূপে মিলন—প্রাণে প্রাণে মিলন। শ্রীনিত্যানন্দের এই যে উত্তম অধম বিচার না করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার কাহিনী বাঙ্গলার গানের একটা দিক্, বাঙ্গলার ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ, তাঁহার এই লীলায় লীলায়িত।

"ভকতি রতনখানি, উড়াইয়া প্রেমমণি, নিজগুণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তারি ঠাঁঞি, দান করে জগত বেড়িয়া॥"

লোচনদাস গাইয়াছিলেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা, হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥"

এই যে অভিমানশূন্য বৈষ্ণবের প্রাণ, এই যে অযাচিত প্রেমদান, এ আদর্শ বাঙ্গলারই নিজের। নিত্যানন্দ অবধূত তাহারি জীবন্ত—জাগ্রত—রূপান্তরে মূর্ত্তপ্রকাশ ছিলেন।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, এই বৈষ্ণব-সাধনা বাঙ্গলা নিজের আত্মার অধ্যাত্ম-

সাধন হইলেও, তাহার একটা গতি আমরা ধরিতে পারি। সকল শক্তির ধারাই এক। একবার করিয়া কুটস্থ, একবার করিয়া কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচ, আর একবার করিয়া সম্প্রসারণ। চণ্ডিদাসের জনমের পর যে ভাব, যে প্রেমের সাধন তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল, আবার সম্প্রসারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই ভাব বাঙ্গলাকে কাব্যে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সকল রূপের সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, আবার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েই, বাঙ্গলার সকল সমৃদ্ধি ছিল, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

তাহার পর একটা যুগ আলো ও অন্ধকারে কাটিল। শক্তি আবার কূর্ম্মবৎ সঙ্কোচে পরিণত হইল। শক্তি ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ, জাতির নানারূপ হীনতার মধ্যে মুসলমানের অত্যাচার, সব মিলিয়া দেশ আবার অন্ধকারে ডুবিয়াছিল; নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার!

সেই অন্ধকারের মাঝেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গলার কাব্যের ধারাকে অন্যদিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণের গানের সুর তখন মিলাইয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বরের শিবায়ন অনেকটা বাঙ্গলার যাত্রার পূর্ব্বাভাস বলিলেও বলা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গালী আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

এই যে কাল ও কালধর্ম্ম, তাহার মধ্যে আমরা একটা সত্য ধরিতে পারিতেছি। বাঙ্গলার যে খাঁটী প্রাণ, বাঙ্গলার বাঙ্গালী জাতির যে বৈশিষ্ট্যের ধারা, তাহার প্রাণধারাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহারও একটা স্রোত চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মুসলমানী রাজার যে বিজাতীয় সভ্যতা, তাহার দ্বারা অভিষিক্ত যে ধারা, তাহাও চলিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির খাঁটী কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতির অখাঁটী কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারার কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও, তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। এক দিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে

পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্ট্যই ভগবানের অভিপ্রেত। বিশেষেই রূপ সৃষ্টি হয়।

রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তনের প্রথমেই গাইলেন,—

"গিরিবর! আর পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥"

এই বাৎসল্য-রসের চিত্র ও গানটিকে এই কেরঙ্গ-যুগে ঘোরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই বাঙ্গলার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঘর ছাড়িয়া

আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক দিয়া দেখিতে চাই।

গিরিরাণী মেনকা গিরিবরকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "ওগো, আমি যে আর উমাকে প্রবোধ দিতে পারি না," শুধু এই প্রথম ছত্রটি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহাতে রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার সুরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। তাহার পরের চিত্র সন্তানের অভীষ্ট বস্তু না পাওয়ার জন্য মেয়ের সেই অভিমান, ঠোঁট ফুলাইয়া কান্না, স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, এ সকল দিক্ কেমন অঙ্কিত জীবন্ত চিত্রের মত ফুটিয়াছে, সন্তান যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। এই কয়টি ছত্রের পর পুনর্ব্বার—

'আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে'

এইটা ফিরিয়া আর একবার বলায়, মা'র বেদনার গভীরতা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর,—'আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি কোথা রে।"

এইখানে আমরা আর একটি নূতন রহস্য পাই, মেয়ে মা মা বলিয়া অঙ্গুলি ধরিয়া যখন চাঁদের দিকে দেখায়, সেই হাত বাড়াইয়া দেখার ভিতর সেই ছোট মেয়েটির প্রাণের ভিতর যে রূপের ডাক, তার তৃষ্ণা, সেই পথে মিলিবার অজানিত আশা ও শব্দহীন ভাষা, তাহার ভিতর মেনকা রাণী তাহার বুদ্ধির দ্বারা 'কোথা যেতে চায়' ইহা ভাবিয়া পাইলেন না। কোন্ অজানিত মহাশূন্যের পানে এই ছোট মেয়ের প্রাণ ধায় কেন, তাহা মেনকা নিজের মনে মনে ঠিক্ ধরিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'চাঁদ কিরে ধরা যায়' বলিলে, সে দুরন্ত মেয়ের মত বসন-ভূষণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মা মেনকা তখন যেন আর সামলাইতে পারিলেন না। পিতা গিরিবর উঠিয়া কন্যাকে ভুলাইলেন। মুকুরে মুখ দেখিয়া মা উমা তখন শান্ত হইল। তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

'জগজ্জননী যার ঘরে।'

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল না, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা, আজও পর্য্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটিকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য রসের ছবি, ইহা বাঙ্গলার ঘোরো রস হইলেও ইহার 'বিশ্ব' মোহ নাই। বাঙ্গলার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গলার সকল রং গঠন হাবভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের

গানের যে প্রাণ, যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়।

আমি তুলনায় সমালোচনা করিতে চাই না। আমি আধুনিক বাৎসল্য-রসের একটি বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ এমনি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে চাই।

খোকা মায়ে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব পূজার বেলায়,
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

যৌবনেতে যখন হিয়া—
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে,
জড়িয়েছিলি সঙ্গে সঙ্গে ;
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে,
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে,
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এ সকল ছন্দের ভিতর এবার আমরা দেখিব যে, বাৎসল্য-রস কেমন ফুটিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘোরো বাৎসল্য-রস নাই,—কিন্তু ঘোরাল রকমের

রস আছে বটে। এখন দেখিতে চাই, এর কি রকম বাৎসল্যরস। মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে,

'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'

কোন খোকা আজও পর্য্যন্ত

'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

বলিতে পারে কি না জানি না। ইহাতে কবি বোধ হয়, বুড়ো খোকার মত আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তাহার জবাবগুলিও মায়ের মুখে তাঁহার নিজের বুলি বসাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী। ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৪-এর শ্লোকে আছে,—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া গেছেন। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা এই ইচ্ছার স্থানে মায়ের মুখে প্রজাপতি ঋষির বাক্যটি বসাইয়া দেওয়া খুব সম্ভবও নয়। কেন না, বেদ তাহার পরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন —আশ্চর্য্য নয়!

বিশ্বমায়ের অন্তরের ভিতর মা হইবার ইচ্ছা অথবা মায়ের অন্তরের মা হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, এবং নারী তাহার নারী-জন্মের সংস্কারগত বুদ্ধিতে এ কথা মনে করিতে যে পারে, তাহা বলিতে পারেন। তবে তাহাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম করিবার বুদ্ধি মায়ের মধ্যে থাকে কি?

তাহার পর কবি যতগুলি শ্লোক রচিয়াছেন, সবগুলির ভিতর কোন একটিতেও মা'র কথা নাই। মায়ের মুখের দার্শনিক কবির বুদ্ধির ভাষা ছন্দে গাঁথা। ইহাতে বাৎসল্য-রসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাসই পান না। যৌবনে মাতার অঙ্গে-অঙ্গে সৌরভের মত মিলিয়া থাকা, নিত্যকালের পুরাতন হওয়া, জগতে স্বপ্ন হইতে এই আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার তাহার মায়ের রূপে ফুটিয়া উঠা একটা বুদ্ধির কারচুপি হইতে পারে, ইংরাজী সাহিত্যের ধারার বুদ্ধি-রস হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে বাৎসল্য রস বলে না। যে বাঙ্গালী সত্য পিতা হইয়াছে, যে বাঙ্গালী সত্য মাতা হইয়াছে, সে এমন করিয়া ভাবেও না, মনেও করে না। তারপর কবি ঐ কবিতার শেষে বলিতেছেন,—

জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে!

এই শেষ কয় ছত্রে একটা সত্য সত্যই মায়ের প্রাণের ভাবের কথা বটে, তাহা অস্বীকার করি না, বিশ্বের ধন বলিয়া সন্তানকে মনে করা খুব অসম্ভবও নয়, তবে কোন স্বাভাবিক মাতাই নিজের ছেলেকে 'বিশ্বের ধন' মনে করেন না। জগতের সেরা মাণিক মনে করিতে পারে, কিম্বা সন্তানের মুখে ভগবানের সৃষ্টি-সম্পর্কের গূঢ় বাৎসল্য-রস প্রাণে জাগিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকাশ এরূপ নহে। ইহার আগাগোড়াই কবিতা নয়, রস নয়, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া কবিতার প্রাণ সৃষ্ট করিয়া তোলা। ইহা বাঙ্গলার গান, রাগিণী, কবিতা নয়; তাই আবার বলিতে হয় যে, বুদ্ধিমান্ অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই ধারায় যে স্বর্গের কল্পনা ও আভাস পাই, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছল ধারায় নিজেরা আর্দ্র হইয়া যাই, এমন করিয়া সেই গলাইয়া মজাইতে পারে শুধু প্রেম। প্রেমই সেই সুরের ধ্যানে আমাদের এই সুখ-দুঃখ-সিঞ্চিত জীবনকে সত্য জীবন করিয়া তুলে। পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে সত্য বস্তু দেখি প্রেম, এই মানুষের যে প্রেম, এই মানুষের যে বাৎসল্য, এই মানুষের যে মাতৃত্ব, তাহার সঙ্গে জগন্মাতার যে ভাব, সে সত্য অনুভূতি, রূপে, ভাষায়, সুরে রামপ্রসাদের গানে ফুটিয়াছে, তাহা এই আধুনিক শিশু কবিতার জন্মকথায় নাই, থাকিতেই পারে না। কেন না, মাতার প্রাণের পরিচয় ইহাতে নাই, আছে শুধু জ্ঞানের বোঝা, তাহার দার্শনিক তত্ত্ব, মাতার যৌবনের সৌরভের স্মৃতি আর যে রহস্যের নিগূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, সেই রহস্যের কথা।

'সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?'

এই যে রহস্যের ভিতর এক প্রশ্ন তুলিয়া খাড়া করা, এ রহস্য জগতের সকল রহস্যে মিলাইয়া দেখার মত ভাব, কবির নিজস্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুসন্ধানের পরিচয় হইতে পারে, ইহাকে রহস্য-রস বলা যাইতে পারে। এত বিচার বিপত্তি মা'র হয় না। মাতা সন্তানের মুখে বিশ্বের সকল পরিচয়ই পাইতে পারেন ও বিশ্বের মধ্যে সন্তানের সকল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কগুলি দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহা এমন বিচার করা পর্দ্দা-ঠিক করা শুষ্ক জ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, সে মাধুর্য্য আর এক রসের ধারা। সেই রসেই বাঙ্গলার জাত বজায় থাকে ও আছে; এই আধুনিক

কবিতায় বাঙ্গলার জাত মারা গিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিতায় এমন করিয়া আমাদের জাত হারাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। আর একটা কথা, রামপ্রসাদের ঐ গানে শুধু বাৎসল্য-রস নহে, মধুর রসের ভিতর যুগল সম্বন্ধের ভিতর বাৎসল্য কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে ফুটিয়াছে, তাহা একটু মনকে ঠিক করিয়া দেখিলে বুঝিবার অসুবিধা হইবেও না। দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য আছে, বিশিষ্ট জাতি আছে, তেমনি কবিতারও জাতি আছে।

ইহা ত গেল বাঙ্গলার খাঁটী কবি রামপ্রসাদ। ইহাকে অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেহ ফেলিবেন না; কিন্তু বাঙ্গলার কবি-চিন্তামণি চণ্ডিদাসের যশোদার বাৎসল্য সম্বন্ধে একটি গান আছে। সেটি এই :—

"তুমি মোর প্রাণ-পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন তারা।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা॥
মরুক এমন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হ'তে বাপু ধেনু গোঠে মাঠে
না পাঠাব বন দিয়ে॥
কি বলিব মন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে।

জানি বা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥
অনেক অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥
চণ্ডিদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায় ॥"

ইহাও সেই ঘোরো ধাৎসল্য-রস, তাহা ঠিক, কিন্তু এ ছাড়িয়া যে কখন বাৎসল্য হয় না, তাহাও ঠিক।

"অনেক অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥

মাতৃ-হৃদয়ের ভিতরের যে কথা, তাহা কি ব্যক্ত হয় নাই? খাঁটী বাঙ্গলা ভাষায় ছেলের "ভাল মন্দ কিছু হওয়া" মা ছেলের সম্পর্কে সে কি প্রাণের অন্তরতম রসের কথা ফুটিয়া উঠে; তাহা যে মাকে জানে, সেই সে বুঝে। যে জানে না, তাহার বুঝিবার উপায় মা'র আশীর্ব্বাদ। আধুনিক কবিতায় যে ছত্র দুইটিতে—

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই।
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।"

আর চণ্ডিদাসের—

"আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।"

এই দুই শ্লোকের সঙ্গে যে ভাবের মিলন আছে, তাহাতে কি প্রমাণ হয় না, বৈষ্ণবের বাৎসল্য সজীব—সত্যি নাড়ী কাটার ব্যথার সাড়া? ইহাতে মাতার যৌবন-স্মৃতি-সুরভি মা'র মনের মধ্যেই আছে, ছেলেকে সে কথা জানাইবার

অবসর হয় নাই। সন্তানকে পাইয়া মা'র মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া মাতৃত্বের সার্থকতা হইয়াছে, দার্শনিকতা করিয়া কবির মুখে তাঁর জন্মকথা কহিবার অবসর পান নাই।

চণ্ডিদাসের যশোদা ও রামপ্রসাদের গিরিরাণী এই দুই চরিত্র-চিত্রের যে রঙ তাহা খাঁটী বাঙ্গালী মায়ের রঙে অঙ্কিত। মায়ের মুখের অঙ্কন, তাঁহার মুখের কথা ক'টি শুনিলেই তাহা বেশ কেমন আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে, মায়ের মতই মনে হয়। 'কোথা হইতে?' বা 'কোথায়?' এ সব প্রশ্ন তাহার মধ্যে পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা না থাকিতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্ত্তমানের মাতৃত্বেই পূর্ণতমরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাতেই ডুবিয়া গেছে। এখানে জীবন মাতৃত্বে ও বাৎসল্যের মধুর রস-মুহূর্ত্তে কেন্দ্রগত স্থির ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল। এই প্রেমের চেয়ে সুন্দর কি আছে, এই মাতৃত্বের মত পূর্ণতা আর কি আছে? 'কোথা হইতে' ও 'কোথায়' ছেলের মুখের রূপ দেখিয়া মায়ের মনে ঠিক ঐ ভাবের রস ফুটে, এমন তো কখন মনে হয় না।

তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালীকার্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্যকাল হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকনা মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের তান্ত্রিক সাধনাঙ্গের ধারাও তখন কিছু বিশুদ্ধ ছিল না, অথচ রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুই সাধন-পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত

তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবদেবী—চরিত্রের দুর্গতিই রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হয়,—যেমন আধুনিক কালের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, রামমোহনের দ্বারা সে নষ্ট-ধর্ম্ম ও লুপ্ত দেব-দেবী-চরিত্রের উদ্ধারসাধন বা সময়োপযোগী কোন সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই। যাহা রামমোহনের প্রায় শতাব্দীকাল পরে পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার তীরে তীরে কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে তাহার আভাস, উন্মেষ, তাহার বিকাশ, তাহার প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের জীবনে সেই মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু রামমোহনে তাহা ছিল না,—হয় নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না, বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব —যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে, ধর্ম্মকে, জাতিকে, সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাঁহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধন এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।

রামমোহন আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুর গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন। রামমোহন গান ধরিলেন,

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর কর।"

আর রামপ্রসাদের গানের সুর এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে।

"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি, ভবে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো।১
ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌বো না গো ॥২
মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো ॥"

ইহার সঙ্গে চণ্ডিদাসের,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি,
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দুইজনের একই পথে পৌছিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।

রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলায় আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে নাই। রামপ্রসাদ এই জগৎকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া, আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে বিশ্ব-মাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া। বাঙ্গলাদেশে, বাঙ্গলাভাষায় তাহার আগে বা পরে, অমন আগমনী কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। আজিও বাঙ্গলার পল্লীগৃহে সহরের কোলাহলের মাঝে শরতে মহামায়ার সে আগমনী, পরিপূর্ণ সুরে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ গাইয়া বেড়াইতেছে।

রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের যে রূপান্তর হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য। মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি চায় না, সে তখন তাহার প্রিয়তমের সহিত প্রাণের লীলাভঙ্গে আনন্দরস ভোগ করে—কে তখন তোমার মায়াবাদের সূত্র প্রতিপাদ্যের ধার ধারে। তাই রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।"

ইহার সঙ্গে মহাপ্রভুর,—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে—

বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।

রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, সেই সকল প্রমাণ তুলিয়া দেখান বাহুল্য ভয়ে আমরা দেখাইলাম না। দু' একটা স্থান দেখাইলেই সুধীজন তাহা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"* * * যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পানপূর্ব্বক আপন আপন ইষ্ট-দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপহাস করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়?"

রামমোহন রায় আজ নাই! রামমোহনের তর্ক-বিচার-ক্ষমতার কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না ও আমরাও করি না। কিন্তু প্রাণের অনুভূতির কাছে এই তর্ক-বিচার ও শাস্ত্র মীমাংসা গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, আর ইষ্টদেবতা, ভগবান্ যে এই আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া লীলার মধ্যে আনন্দঘন চিন্ময়-রস আস্বাদন করিতেছেন, শঙ্করশিষ্য রামমোহন তাহা বুঝেন নাই। শাস্ত্রদর্শী রামমোহন তখনও রামানুজ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহা হইলে তাঁহার এই মায়াবাদেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে বাঙ্গলার শিরোমণি; তাঁহার পাণ্ডিত্যও কম ছিল না, শাস্ত্র ঘাঁটিতে তিনিও বিশেষ মজবুত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বড় কথা, আসল কথা, খাঁটী কথা এই যে, এই সব শাস্ত্রের অনুশীলনের উপরে যে প্রেমের সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা রামমোহনের ছিল না। আর সেই কারণেই দেশকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

আশা করি, রামমোহনের এই বেদান্তী মায়াবাদী ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত খিলান আলোচনা করিয়া সুধীজন দেখিবেন। আরব, পারস্য ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্ত-মিশ্রিত খিঁচুড়ির উপর ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে বুঝিলে দেশের

অনেকটা মঙ্গল হইবে, এবং তবেই আমরা এই ফেরঙ্গযুগকে সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। কবি গাইয়াছেন—

"বহুতক সাহস করো জিয় আপনা।
তেহি সহবাসে ভেট না সপনা॥"

জীবনে বহুতর সাহস কর, সেই প্রাণপতির সহবাসের খেলাই চলিতেছে। এ জীবন স্বপ্ন নয়,—সত্য। মায়া নহে, মিথ্যা নহে। অণু-পরমাণু হইতে বিরাট বিশ্ব সব সত্য, সবই তাঁর রূপ। ইহাই সত্য। এই সত্য হারাইয়াছি। মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, পুরুষত্ব হারাইয়া এই স্ত্রী-জন-সুলভ আধুনিক দুর্ব্বল প্রেমের সাহিত্যে মসগুল্ হইতেছি। আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদের জীবনের উপর সে বিশ্বাস, সে আত্মনির্ভর হারাইয়াছি। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে চাষা মাটির সঙ্গে কেমন করিয়া প্রাণ দিয়া পরিচয় লাভ করিতেছে, তাহা বুঝিবার কোনও সাধনা নাই। দেখিতেছি ধানের ক্ষেতের দোলা, আর ঐ আকাশের মেঘের রঙ। কিন্তু তাহার জীবনের পৃষ্ঠা আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের,—এই খোস-পোষাকা কর্পূর-সাহিত্যের,—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে, বিশ্ব-সাহিত্য তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? তাহাদের প্রাণের ভাবাভাব, সুখ দুঃখ, তাহাদের যে বিচিত্র রূপের লীলা, তাহা কি কখন একদিনের, এক মুহূর্ত্তের অনুভূতিতে আনিতে পারিয়াছ? বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ত দূরের কথা—সে সাধনা, সে সাধনের পথে যাহারা যায় নাই, তাহারা ত তাহা কোন রূপেই প্রাণের অনুভূতিতে আনিতে পারিবে না। যদি পারিতে, তাহা হইলে মা'র, এ সাহিত্য-মায়ের অঞ্চলে অমনি সোনা ফলাইতে পারিতে, তোমাদের মানব-জন্ম এমন পতিত জমির কাঁটা ও ঘাসে ভরিয়া যাইত না; আবাদ করিলে সোনা ফলিত। শুধু-তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ কাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নব যৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

বাঙ্গলার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার প্রাণের স্রোতকে

অনাবিলভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবি-ওয়ালার দল, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গলার খাঁটী কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্যরস, তাহার কথাও কহিব।

এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে সে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল, আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে। একদিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্যদিকে বাঙ্গলার নিজের ধারা। কবে মাটি আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশবাসী অসহরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। একদিকে এই অরূপের বিশ্ব-মোহ, তাহার সে জ্ঞান নাই; তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই—সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গলার আত্মা। জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল, এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল, আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গৃহনক্ষত্র জ্যোতিষ্কের দূরাগত পদধ্বনি কানে আসিতেছে, বাঙ্গলা এ মিথ্যা রূপক ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গলার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

শাক্ত সাহিত্য ধারায়—রামপ্রসাদ

(প্রথম পল্লব)

[বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষত্ব, বিশ্ব-বাঙ্গলার গীতি-কবিতার ইতিহাসের দুইটি ধারা,—একটি শাক্ত ধারা ও আর একটি বৈষ্ণব ধারা। শাক্ত সাহিত্যের ধারায় রামপ্রসাদ। কবিকঙ্কন হইতে শাক্ত ধারা প্রবাহিত। বাঙ্গলা সাহিত্যের বৌদ্ধধারা অস্পষ্ট কিংবা লুপ্ত-প্রায়। পরবর্ত্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারায় বৌদ্ধধারা তাহার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারে নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারায় বৌদ্ধ সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ধারা লুক্কায়িত আছে। শিবশক্তি অভেদাত্মক বলিয়া "শিবায়ণ" গুলি শাক্ত ধারার অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাক্ত ধারায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। ইহা বাঙ্গলায় পলাশী যুদ্ধের কাল।

রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে প্রবেশের পথে এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে অনেক-গুলি বাধা আছে। একাধিক রামপ্রসাদ ছিল কি না ? রামপ্রসাদের গানের শ্রেণী বিভাগে প্রথম শ্রেণী—সাধনের সময় রচিত। ২য় শ্রেণী—সাধন হইতে সিদ্ধির পথে যাইতে রচিত। ৩য় শ্রেণী—সিদ্ধি বা সমাধির অবস্থায় রচিত। রামপ্রসাদের উপর সংস্কৃত মুসলমানী ও বৈষ্ণব প্রভাব ছিল।]

১

আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গলার প্রাণকে খুঁজিতে যাওয়া আমার স্বধর্ম্ম। বাঙ্গলার গানের এই সুর ও রূপের মধ্যে আমি বাঙ্গলার প্রাণকেই খুঁজিতেছি।

(১) বাঙ্গলার গানের একটা স্বরূপ আছে।

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কথন নাহিক হয়।"

বাঙ্গলা সাহিত্যে, শিল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, বাঙ্গলার ধর্ম্মসাধনায়, বাঙ্গালীর দশকর্ম্মে—সমাজস্থিতি ও গতির ব্যবহারের—যত বিভিন্ন বিচিত্র রূপের জন্ম হইয়াছে, সমস্তই বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে। এক বহু হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে।

"নবরে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব।"

সেই এক আরো বিচিত্র হইবে—আরো বহু হইবে—লীলার কি অন্ত আছে? চক্ষে যে রূপ দেখি, শ্রবণে যে গান শুনি, তা এই চক্ষু কর্ণের বাহিরে কোন অপরূপ স্বরূপের আভাস আনিয়া দেয়। বাঙ্গলার প্রাণের সেই স্বরূপের খোঁজেই আমি বাহির হইয়াছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন বাঙ্গলার প্রাণের সেই স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করি। সেই স্বরূপের আনন্দঘন বিগ্রহ—আমার শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গলার এই শ্যাম-শ্যামা যেন আমার প্রাণ শতদলের পাপড়িতে পায়ের পাতা রাখিয়া লীলা কল্লোলে তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে পারে। বাঙ্গলার প্রাণের এই যে স্বরূপ, তাহার সহিত মুখোমুখি পরিচয় না হইলে,—আত্মায় আত্মায় সে রমণ না হইলে, সৃষ্টি হইবে কি করিয়া, নাদ ফুটিবে কোন্ রন্ধ্র দিয়া, বাঙ্গলার প্রাণের এই স্বরূপের সংস্পর্শে ভিন্ন রসের উপচয় হইবে কি করিয়া, রস না হইলে রূপ ফুটিবে কোন্ পথে, সাহিত্য ও কল্পকলার রূপান্তরই বা হইবে কি প্রকারে?

কবি সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু কবিও অমনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণে রসের উপচয় হওয়া চাই। সেই রস হইতে রূপের জন্ম কল্পকলার রূপান্তর। কিন্তু স্বরূপের বিহনে যে রসের সৃষ্টি হয় না। রস না হইলে যে রূপ আসে না। কাজেই স্বরূপের সাক্ষাৎ আগে চাই। কিন্তু সাধন না করিলে ত স্বরূপের সাক্ষাৎ হয় না। বাঙ্গলার গানে, বাঙ্গলার কল্পকলায় আমি তাই বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপকে আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। কেননা সাধন-ভ্রষ্ট কবি স্বরূপের সাক্ষাৎ না পাইয়া যে রূপের সৃষ্টি করে তাহা সৃষ্টিই হয় না। সে সৃষ্টি বাঙ্গালীরও হয় না। কাজেই বিশ্বেরও হয় না। তাহা সৃষ্টিকে ভ্যাংচায় মাত্র। বিশ্বে যদি বাঙ্গালীর কোন স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে, তবে সে তার বিশিষ্টতার জন্যই। বাঙ্গালীর এই বিশিষ্টতা তার প্রাণের স্বরূপেরই প্রকাশ।

এই বিচিত্র বিশ্বে সকল জাতিরই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। যে জাতির বৈশিষ্ট্য নাই—সে জাতি বাঁচিয়া নাই। অস্তিত্ব থাকিতে পারে। বাঙ্গালী তাহার অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু এক মৃত অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া ফেরে নাই। বাঙ্গালী বিশ্বে এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে যে সকল রূপের জন্ম হইয়াছে—রূপ বৈচিত্র্যের ধারায়, বাঙ্গালীর শিল্পে, সাহিত্যে ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে বহু বিচিত্র রূপ দেখা দিয়াছে—রস মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিশ্ব তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই—সে বিশ্ব হইতে পারিয়াছে। বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করিতে পারে বলিয়াই সে বিশ্ব। তা যদি সে না পারিত তবে সে বিশ্ব হইত না, আর একটা বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলার

প্রাণের স্বরূপ হইতে অনন্তকাল জন্মিতে পারে বলিয়াই ত, বাঙ্গলার রূপ অনন্ত, আর বাঙ্গলার প্রাণ অমর। বাঙ্গলার এই অনন্ত রূপ ও অমর প্রাণ—বিশ্ব সৃষ্টির—দুর্ব্বার লীলা স্রোতে একটা বৈশিষ্ট্য চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ত আজ বাঙ্গালী তাহার প্রাণের স্বরূপ লইয়া আবার একবার বাঁচিতে চায়। তাহার গানে তাহার কল্পকলার রূপান্তরে তাহাকে আবার একবার ফুটাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে চায়।

কিন্তু আজ যে দেশের মেঘ নিঙড়াইলে এক ফোঁটা জল বাহির হয় না, সেই দেশে বসিয়া আচম্‌কা এমন এক বিশ্বের নাগাল যদি কেহ পাইয়া থাকেন, যে সেই ধারকরা ফেরঙ্গ বিশ্বের অঞ্জন ব্যতিরেকে আমি আমার মায়ের রূপ দেখিতে পারিব না, এই ফেরঙ্গ বিশ্বের ডাকের গহনায় না সাজাইলে আমার মায়ের রূপ দেখিয়া ফেরঙ্গ-বিশ্ব খুসী হইবে না—অতএব ফেরঙ্গ গাউনে সাজাইয়া মাকে, মাতৃভাষাকে লইয়া ফেরঙ্গ বিশ্বের হাটে ধাও, ধাও। আমি সন্তান, আমি ইহা পারিব না। আমি বাঙ্গালী, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা এই কাপুরুষোচিত নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তোমরা বিশ্ব বলিয়া একটা কথা তুলিয়াছ। (১) কেন তুলিয়াছ তা বুঝিতে পারি। তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিভিবার আগে যেমন একবার জ্বলে—তোমাদের এই জ্বলুনিও তাই। দেওয়ালীর কতকগুলি সবুজ পোকা ইহাতে পুরিবে মাত্র, কিন্তু জানিও—বাঙ্গলাতে পতঙ্গ ছাড়াও জীব আছে। বিশ্বের অতটা অনুকরণ-চিকীর্ষু ধর্ম্ম সমাজ-সংস্কারের শতবর্ষব্যাপী প্রহসনের উপর যবনিকা পতন হইয়াছে।...দুর্ম্মূল্য বলিয়া বিশ হাজারে একজন করিয়া বাঙ্গালীরও একশ বছরের মধ্যে এই প্রহসন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ অনুকরণ ও প্রহসন যুগের অন্তে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধিতে আবার বাঙ্গালীর লুপ্ত ধারায় বান ডাকিয়াছে। শাক্ত-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, নবযুগোপযোগী সার্ব্বভৌম সমন্বয় আবার দেখা দিয়াছে। ধর্ম্মের আসরে ইংরাজী বক্তৃতা প্রায় বন্ধ। দক্ষিণেশ্বর ও গেণ্ডারিয়ায়—পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে আবার আসন হইয়াছিল, গাজনের ঢাক ও সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ আবার বাজিয়া উঠিতেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধারায় আবার শতদল বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গানের ধারায়—আবার তার হারাণো সুর—নব বৈচিত্র্যে নব রূপে দেখা দিবে। আর বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতেই তাহার জন্ম হইবে। সাধক আসিয়াছিলেন,—সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এইবার সুর ও রূপ আসিবে—আসিতেছে। (১) তাই তোমাদের এই বিশ্বের প্রলাপে দৃকপাত করিবার অবসর আমাদের নাই।

বাঙ্গলার প্রাণের ধারায় রামপ্রসাদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের কবিওয়ালাদের

গানের ধারার কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম। (১) পর্ব্বত-বন্ধুর উপল-বিষম ভেদ করিয়া প্রাণের স্বরূপ হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে—যাহার তীরে তীরে মন্দিরচূড়া, শ্যাম তরু-বীথির উপর মাথা জাগাইয়া আকাশ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, যে মন্দিরে বসিয়া চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ বাঙ্গলার অভেদাত্মক শ্যাম-শ্যামাকে গান শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া বাঁধিয়াছে, যে মন্দিরের নিম্নতম সোপানে দাঁড়াইয়া—তীর্থযাত্রী,—চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের কণ্ঠ শুনিয়া পাগল হইয়া ছুটিয়া যাইতেছে,—সেই ধারা, সেই নদী—আজ যে বাধা পায় পায় পাইতেছে,—তা ঐ শূন্যগর্ভ পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল একখণ্ড শুষ্ক তৃণের মত,—তাহার প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া লইয়া যাইবেই যাইবে।

"বিশ্ব" আজ বাঙ্গলার প্রাণের ধারায়, গানের ধারায় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার গানে যদি বাঙ্গালীর প্রাণ থাকে,—তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর প্রাণের ধারায় পাষাণ "বিশ্ব" টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে,—বাঙ্গালীর গানে বিশ্ব ডুবিবে। পথের বাধা দূর না করিয়া বাঙ্গালী অগ্রসর হইবে কিরূপে ?

"বিশ্ব" সাজিবার "বিশ্ব" সাহিত্য রচিবার কথা মুখে আন কি করিয়া—আমি বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর জাতি সকলের উত্থানে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অক্ষম,—'বিশ্ব' নাম মুখে আনিতে তোমাদের লজ্জা হয় না! ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন—এই সমস্ত জাতির গত ২৫।৩০ বৎসরের একটা রঙীন ফেনিল মাদকতাপূর্ণ সাহিত্যের যে খেলো ইংরাজী তর্জ্জমায় রস-বৈচিত্র্যের ধাঁচা নকল করিয়া, ফেরঙ্গ খোসায় দেশী ও বিদেশী প্রাণের যে খিঁচুড়ী দেশ বিদেশে পরিবেষণ করিতে ধাবিত হইয়াছ—ইহা কি, কেন সৃষ্টি হইয়াছে ? ভাবিয়াছ—ইহার বুঝি কোনদিন কোন বিচার হইবে না ? এই অদ্ভুত বিসদৃশ সুর ও রূপের একত্র সমাবেশ, যাহাতে রসাঙ্গসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে—একত্রীভূত ও একাত্ম হয় নাই—হইতে পারেও না,—যাহা,—না এ—না ও—দুইয়ের বার; তাহাই লইয়া ফেরঙ্গের হাটে কোন্ অধম বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ? যাদুকর ভালুকের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তুড়ি দিয়া দিয়া তাহাকে নাচায়। এ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের গলায় সেই ফাঁসির সূত্র ধরিয়া আছে ঐ ফেরঙ্গ বিশ্ব, ফেরঙ্গ-বিশ্বের হাতের তুড়িতে বাঙ্গলা সাহিত্যের নব যৌবনের দলের যে ভালুক-নাচ তাহা আজকার বাঙ্গলাতেই সম্ভব। কেন না বাঙ্গলার কেশরী জানি না কোন্ গহনে আজ গা ঢাকা দিয়াছে, তাই আজ সিংহের বিচরণ-ভূমিতে গলায় ফেরঙ্গ ফাঁস বাঁধা অধম ভালুকের নাচ দেখিতে হইতেছে।

লজ্জা হয় না মুখে 'বিশ্ব' নাম উচ্চারণ করিতে? বিশ্বের ধুয়া ধরিয়া—যে পাশ্চাত্যের ঘরে সিঁধ কাটিতে চাও,—বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার নকল করিয়া এত মতে হাত মক্স কর, আমি বলি কি একবার—

মশারি তুলিয়া দেখরে আপন মুখ।

পাশ্চাত্যের এই জাল মশারি তুলিয়া একবার আপনার মুখ দেখ, নইলে—

তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
তোমার আপন ঘরে যায় যে চুরি।

বিশ্ব ও বিশ্ব-সাহিত্য লইয়া যে এত মাতামাতি করিতেছ, বুঝি মনে করিয়াছ, বাঙ্গালী কোন জন্মে বিশ্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা জানে না?

স্থুল শরীর ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং—অর্থাৎ এই ব্যষ্টি বা পৃথক্ পৃথক্ শরীরে উপহিত চৈতন্য বিশ্ব নামে অভিহিত হয়। আর—

এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং—অর্থাৎ এই স্থুল শরীর সমূহের সমষ্টিতে যে চৈতন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই বৈশ্বানর ও বিরাট।

যে বাঙ্গালী সাধনের দ্বারা জানিয়াছে যে "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"—

যে বাঙ্গালী গাহিয়াছে—

শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে
মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালী তাহার জীবনের সাধনায়, তাহার কল্পকলায়, তাহার গানের রূপান্তরে বিশ্বের দেখা পায় নাই? যে দেশের জল বায়ুতে এই তত্ত্ব মিশিয়া রহিয়াছে যে—"যত্র জীব তত্র শিব"—"শিবশক্তি অভেদ"—

যে বাঙ্গালী "কালো মেঘ উদয় হল অন্তরে অম্বরে" দেখিয়া গাহিয়াছে—

"মা আমার অন্তরে আছ,
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা—"

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালীর বিশ্ব দেখা হয় নাই? দেব বৈশ্বানর একবার প্রজ্জলিত হও। তপোবনের আবর্জ্জনা, শুষ্ক তৃণ পল্লব বাতাসে মর মর করিতেছে, একবার তোমার পবিত্র দাহনে সমস্ত কলুষ ভস্মীভূত কর।

২

রামপ্রসাদের পর হইতেই বাঙ্গালীর এই মায়ের রূপ বাঙ্গালীর চক্ষু হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। মায়ের এই প্রতিমা আবার মন্দিরে মন্দিরে গড়িবার

আয়োজন হইয়াছে। "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" যে মাতা, তাঁর রূপ ধ্যান আবার কল্পিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রাণে যখন স্বদেশীর এক নূতন জোয়ার আসিয়াছিল, তখন সেই প্রলয় পয়োধিজলে—মায়ের

"ডান হাতেতে খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ ;
তাঁর তুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নিবরণ।"—

এই রূপও অন্ধকারে তড়িৎ শিখায় একদিন উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের মাতৃমূর্ত্তি, আর রামপ্রসাদের মাতৃমূর্ত্তির ভাব ও রূপে পার্থক্য আছে। এই দুই কিছুতেই এক বস্তু নয়। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, ধ্যানস্তিমিত-লোচন সাধকের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে, বাঙ্গালীর মায়ের যে রূপ একদিন দেখা দিয়াছিল—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে
গলিত চিকুর আসব আবেশে
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে—

এ কার রূপ? এই ত বাঙ্গলার প্রাণের রূপ; এই ত বাঙ্গালীর মায়ের রূপ।

কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নবনীলনীরদতনু-রুচিকে,—
কে রে,—নবনীল জলধর কায়, হায় হায়—
কে রে নিৰ্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল।
পদ, রক্তোৎপল জিনি
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী!

রামপ্রসাদ বলে আমার মায়ের রক্তপদ্মজিনি এই চরণ যুগল কোন্ বিশ্ব-শিল্পী নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল? আমার মায়ের এমন চরণ থাকিতে ধরণী রসাতলে যায় কেন?

বাঙ্গলার প্রাণের এই এক রূপ, বাঙ্গালীর গানে এই এক সুর। রামপ্রসাদ বাঙ্গলার সাধনায় ও কলায় এই রূপের রূপান্তর ঘটাইতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গলার আর এক রূপের কথা আপনাদিগকে আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি (১) সেই।

থির বিজুরী বরণ গৌরী
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর!

এই রূপের সাধনায়, জীবনে ও কাব্যে রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন চণ্ডীদাস।

বাঙ্গলার গানে এই দুই রূপেরই রূপান্তর হইয়াছে। এই দুই রূপই এক বাঙ্গলার প্রাণ হইতেই জন্মিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব—একই প্রাণের রস-বৈচিত্র্যের রূপ-বৈচিত্র্য মাত্র। একই প্রাণের স্বরূপ হইতে ইহাদের জনম বলিয়া—ইহারা অভেদাত্মক। চণ্ডিদাস বাঙ্গলার কান্তভাব লইয়া তাঁহার কাব্যের রূপান্তরে তাহাকে ভাগবত সত্যে উপনীত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বাঙ্গলার মাতৃভাব লইয়া তাহাকেও কাব্যের সেই শেষ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন!

প্রসাদ বলে, 'মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে, সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।'

বাঙ্গলার গীতি কবিতার ইতিহাসে—বৈষ্ণব কবিতার যেমন একটি ধারা বহিয়া গিয়াছে—শাক্ত কবিতারও তেমনই একটা ধারা প্রবাহিত আছে। বৈষ্ণব গীতি কবিতার ধারার কথা আমি বলিয়াছি। (১), শাক্ত কবিতার ধারাও আমি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম (২), হয়ত পরিষ্কাররূপে বলিতে পারি নাই। রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ত্ব করিয়া যাহাকে মনোযন্ত্রে বাদ্য করিয়া হৃদিপদ্মে নাচাইয়া গিয়াছেন, যে এলোকেশীকে হৃদয়ে ধরিয়া "গয়া গঙ্গা কাশী" বৃথা মনে করিয়াছেন,—ভাক্ত পথের সাধক হইয়া সেই ষড়-দর্শনের "অন্ধগুলা"কে গালি দিয়া শুধু তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণের কথা "দেঁতোর হাসি" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া—"মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে"—এই বিশ্বতত্ত্ব তার-স্বরে রটিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী হইয়া নিজেকে "ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা" জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডকে গোষ্পদ তুল্য ভাবিয়া ভ্রূক্ষেপ করেন নাই,—"মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া"—"সেই তিমিরে তিমির হরা" ব্রহ্মময়ী মাকে আজ বাঙ্গলার "অন্ধ আঁখি" দেখিতে পায় না সত্য,—কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের অতীতের দুই তিন শতাব্দীর অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে যে, রামপ্রসাদের এই—

"ঢল ঢল জলদবরণী,"—

এই—"শোভিত শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিনী"—বাঙ্গালীর কত দিনের কত যুগের আঁধার অতীতকে আলো করিয়া আছে। রামপ্রসাদের অতীতের তিন তিনটি (১) শতাব্দীর যবনিকা একে একে উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে—সে দিনের বাঙ্গালী কবির ধ্যানে—এই মাতৃমূর্ত্তি কিরূপে প্রকট হইয়াছিল—

ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে, গলে মুণ্ডমাল॥

হায় হায় করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥
পিঠে লম্ববান তার শোকে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার ॥
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
বাকসনা কুল যেন দুপাটি দশন ॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা।
নাচায়ে অবনি তলে প্রেত ভূত দানা ॥
মড়ার আতড়ী কেহ করিয়া উত্তরী।
অঙ্গুলীতে আরোপণ কেশ কুশাঙ্গুরী ॥
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করেন নব কপাল ভাজনে ॥

কবিকঙ্কণের এই স্বপ্ন—বাঙ্গালীর সাহিত্যের ধারায় যে স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে—একদিন রামপ্রসাদের গানে তাহারই চরম বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণ গীত রচনা করেন নাই, কাজেই গীতি কবিতার ধারায় তাঁহার কাব্যের আলোচনা আমি করিব না। চণ্ডীর উপাখ্যান ব্রত লইয়া যে সমস্ত বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের নিকট কাহার ঋণ কত, তাহার পরিমাণ না করিয়া শুধু এই মাত্র বলিব যে, মুকুন্দরামের কবি প্রতিভায় বাঙ্গালীর গৃহস্থালী বাঙ্গালীর সমাজ—বাঙ্গালীর চরিত্র বিশ্লেষণ—এক কথায় বাঙ্গলার রূপ ও রস যেরূপ নিখুঁত অঙ্কিত হইয়াছে,—আর কোন কবির তুলিকা সেই অসাধ্য সাধন করিতে পারে নাই। গীতি কবিতার না হইলেও মুকুন্দরাম শাক্ত সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন কবি (১) শাক্ত সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারার সহিত মুকুন্দরামের এই সৃষ্টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

শাক্ত সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ বাঙ্গলার এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস আপনা হইতেই তাহার বিচিত্র অধ্যায়গুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরে। আমরা ভুলিতে পারি না, বাঙ্গালী একদিন বৌদ্ধ হইয়াছিল (১)। কে জানে কত শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র জাতি জগদ্গুরু বুদ্ধের ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল।

তারপর সমস্ত জাতি যখন বৌদ্ধধর্ম্মের জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করিবার জন্য পাশ ফিরিতে লাগিল, তখন সেই আলোড়নের দিনের ইতিহাস খুঁজিবার জন্য মন্দির, মঠ, এমন কি মসজিদেও প্রত্নতত্ত্ববিৎকে যে বহুবার আনাগোনা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত। এবং বাঙ্গলার সাহিত্যের ধারা যিনি অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেও ঐ বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমাজ্ঞাপক বহু ধ্বংসাবশেষ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে যে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহাও অকুতোভয়ে স্বীকার করিতে হইবে।

"ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যগুলি ঠিক গীত বলা যাইতে পারে কিনা বিশেষজ্ঞরা তাহার সমাধান করিবেন। বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য যেরূপ স্বাতন্ত্র্য-গরিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল—বৌদ্ধ সাহিত্যের সেরূপ কোন উজ্জ্বল স্বতন্ত্র ধারা এখন আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। (১) সে শ্রমণ নাই, সে বৌদ্ধ বিহার নাই, মঠ নাই, মন্দিরে মসজিদে তাহা আত্মগোপন করিয়াছে। বর্ণাশ্রমকে সমভূমি করিয়া বৌদ্ধের সাম্যমূলক যে সমাজ-বিন্যাস, তাহার কোন চিহ্নই ত বাঙ্গলা আজ দেখাইতে পারে না। পরবর্ত্তীকালে নব্য হিন্দুর পুনরুত্থান-যুগের এক বিষম ভেদমূলক জাতিবিভাগের সমাজ বিন্যাস আমরা পাইলাম। সে বর্ণাশ্রম আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না,—সে বৌদ্ধের সাম্যবাদও রহিল না। তাই পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে শাক্ত বৈষ্ণবের ধারায়, বৌদ্ধ সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় নাই। যেমন মন্দিরে মসজিদে বৌদ্ধ মঠ লুকাইয়া আছে, ভেদবাদী সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্তের সাম্যমূলক সমাজ গঠনের আদর্শ আছে, তেমনি বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাহিত্যে বৌদ্ধ সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ধারা লুকায়িত আছে। "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে লুপ্তধারার দুই একটি ফেনা মাত্র। পরবর্ত্তীকালে রূপান্তরে কি করিয়া ঐ লুপ্তধারা বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যিকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহা একদিন অবশ্যই কেহ অন্ধকার হইতে তুলিয়া দেখাইবেন। "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যের ধারার সর্ব্বশেষ কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী (১) কিরূপে ক্রমে কাব্যের বিষয়গুলি বৌদ্ধের "ধর্ম্মঠাকুর" হইতে হিন্দুর দেব দেবীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন তা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যে—

"শরণ লইনু, জগত জননী ও রাঙ্গা চরণে তোর
ভব জলধিতে অনুকূল হইতে, কে আর আছয়ে মোর ?
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু, দোষ করে রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা রুষিবে পড়িয়া কাঁদিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥

হরি-হর ব্রহ্মা ও পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি।
বিপদ সাগরে—তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি ॥"

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের এই সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই কি আমরা রামপ্রসাদের কাব্যের রূপান্তরের পূর্ব্বাভাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না? বৌদ্ধ সাহিত্য কি করিয়া কালে শাক্ত সাহিত্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, ইহা কি তাহারই একটা দৃষ্টান্ত নয়?

শিবের প্রসঙ্গ লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে যে সমস্ত কাব্য রচিত হইয়াছে, "শিবশক্তি অভেদাত্মক" বলিয়া আমি সেই সমস্ত শিবায়ন কাব্যগুলিকেও শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছা করি। গীতি শাখার ইহাও একটি ধারা। খুঁজিলে কাব্যাংশ ইহাতে একেবারে মিলে না এমন নয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী ছাড়িয়া যখন আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসিয়া পড়ি, তখন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সহিত যুগপৎ আমাদের সাক্ষাৎলাভ ঘটে।

৩

ভারতচন্দ্রকে আমি শাক্ত সাহিত্যের ধারাতে রাখিয়াই দেখিতে চাই। ভারতচন্দ্রে গীতি-কবিতা আছে সত্য, তবে তাহাতে শক্তি-সাধনার গান অতি অল্প। নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহারা ভারতচন্দ্র ও তদনুগামীদের হস্তে হিন্দুর দেবদেবীর নানারূপ অশ্লীল আচরণে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া, দেবদেবী-বিরোধী—রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যিকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া যদি অপাপবিদ্ধ দেবদেবীগণ গর্হিত অশ্লীল আচরণে প্রবৃত্ত হন, তবে পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি! কিন্তু হতভাগ্য দেবদেবীদের জন্য আর একটা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আখড়া খুলিবার ব্যবস্থা করিলেই ত চলিত। একেবারে যে কালা-পাহাড়ী মুদগর রামমোহন তাহাদের বিরুদ্ধে চালাইলেন—তাহাতে ভ্রষ্ট দেব-দেবীদের চরিত্র সংশোধনের কোনওরূপ সুব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে প্রাণে মারা বড়ই নিষ্ঠুর কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ভারতচন্দ্র ত বাঙ্গালীর সাধনাঙ্গের কবি নন। রাজসভায় রাজ-ভোগে ভোগায়তন-পুষ্ট-দেহ কবি, অতুলন শব্দঝঙ্কারের কবি,—বাঙ্গলার গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবনের ধারা হইতে দূরে,—মুসলমানী বিলাসের আওতায় কবি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাধনাও ভারতচন্দ্রে সুর ও রূপ পায় নাই। সেই সাধনাঙ্গের কবি—রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের গানের রূপান্তরে (১) শিব-শক্তি যেরূপ কল্প-

কলায় ও তত্ত্বাঙ্গে রূপান্তরিত হইয়াছেন,—সেই মাতৃভাবের সাধনায়—কোন্ ঐতিহাসিক অশ্লীলতার গন্ধ পাইলেন? যদি তা না পাইয়া থাকেন,—আর রামপ্রসাদের কালী সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভ অসম্ভব বিবেচিত না হইয়া থাকে,—তবে রামপ্রসাদের কালীর রূপ—ধ্যান ও নামজপ,—বাঙ্গালীর ছাড়িবার কি হেতু বা প্রয়োজন ছিল? রামমোহনের—দেবদেবীমূর্ত্তি-বিদ্বেষ,—রামপ্রসাদের মূর্ত্তি সাধনার পাশে কি অনাবশ্যক এবং অনুচিত স্পর্দ্ধা ও দাম্ভিকতা নয়? রাম-মোহনের আগমনের অন্য যে প্রয়োজনই থাক,—ভারতচন্দ্রই যদি রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হন, তবে রামপ্রসাদ সত্ত্বেও তাঁহার আবির্ভাবের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে। আর ভারতচন্দ্রে কি অশ্লীলতা ছাড়া আর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না? কি তীব্র আঘ্রাণ-শক্তি! আমি শিবশক্তি তত্ত্বের একটি গান ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধার করিতেছি—

ভব সংসার ভিতরে ভব ভবানী বিহরে
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নরনারী কলেবরে
গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে
দোঁহে নানা কেলি করে।
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুইজনে
দেহী দেহরূপে চরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
একি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে।

কবি রায় গুণাকর বলিতেছেন যে, তিনি নিশ্চিত মনে টের পাইয়াছেন যে—ভব আর ভবানী—অভেদাত্মা হইয়াই ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন—গুণাতীত হইয়া ও নানা গুণ লইয়া, চেতন অচেতনে, স্থাবর জঙ্গমে, নরনারী কলেবরে,—সমস্ত জীবের অন্তরে,—উত্তম অধম নির্ব্বিচারে,—সমগ্র বিশ্ব চরাচরে—'দোঁহে নানা কেলি' করিতেছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি শিব আর শক্তির কেলি প্রসূত। এই 'কেলি' শব্দটির ভিতরে যদি কোন সাহিত্যের ইতিহাস লেখক কোন কিছু গন্ধ পান তবে আমরা নাচার। বাঙ্গলার বৈষ্ণব বলিয়াছেন—

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম—

কাজেই সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী কামায়ন। বাঙ্গলার শাক্ত বলিলেন যে,
"মূলাধারে সহস্রারে বসিয়া মা আমার
* * * হংস সনে
হংসীরূপে করে রমণ।"

কাজেই সমগ্র শিব ও শ্যামা সঙ্গীত কামশাস্ত্র! শাক্ত ও বৈষ্ণব ছাড়িয়া, প্রকৃতির উপর পুরুষের বীক্ষণ, যদি দূরবীণ লইয়া নিরীক্ষণ করা যায়, তবে তাহাও বড় আশাপ্রদ মনে হইবে না। অমন যে বেদান্তের ব্রহ্ম, মায়ার সহিত তাহার সংস্পর্শটাও খুব নিরাপদ নহে। কাজেই বলিতে হয়,—

"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ দোঁহা ও গানে সরুহ যে ভণিতা করিয়া গিয়াছেন তাহা এই :

জামে কাম, না কামে জাম
সরুহ ভণতি অচিন্ত্য সোধাম।

জনম হইতে কাম, না কাম হইতে জনম (১) সরুহ বলেন, যে সে ধাম অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্য ধামের খবর যাহাদের কাছে পৌছায় না, তাহাদের একটা জাতির আজনম সাধন লইয়া, সাহিত্য লইয়া এই বাচালতা ও ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় না দিলেই কি নয় ? ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা—জন্ম দিল রামমোহনের শ্লীলতাকে ? প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল, তুলিলেই কে জানে কি গরল উঠিবে ? আমরা বাঙ্গালীর শাক্ত সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায়,—এইরূপ নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক আবেষ্টন ও পরিবেষ্টনের মধ্যে রামপ্রসাদের গীতি কবিতায় আসিয়া পৌছিলাম।

রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথে এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। নাম, রূপকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার—একটা অছিলা—শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাইয়া বসিয়াছে। যে চরম অদ্বৈতজ্ঞানে নাম, রূপ মিথ্যা প্রতিভাত হয়,—প্রতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্ত্বা লুপ্ত হয়—সে অদ্বৈতজ্ঞানে, সে অদ্বৈত সমাধিতে ডুবিয়া যে ইংরাজী-নবিশ বাঙ্গালী নাম, রূপকে মিথ্যা ভাবিয়াছে,—আমি তা মনে করি না। পরম্পরাগত যে নাম জপ ও রূপ ধ্যানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী ধর্ম্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে,—ঐ ফেরঙ্গ যুগের বিকৃত আদর্শে সাধন-ভ্রষ্ট বাঙ্গালী, অনাচারী হইয়া, যে দায়িত্বহীন অধর্ম্মে বা পরধর্ম্মে গা ভাসাইয়াছে,—বাঙ্গলার

চিরন্তন নাম-রূপের বর্জ্জনে আমি তাহারই পরিচয় পাইতেছি। কাজেই রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে বাঙ্গলার চিরন্তন সাধন-ভ্রষ্ট ফেরঙ্গ-বাঙ্গালী, আজ প্রবেশ করিবে কোন্ পথে ?

এক অতি বীভৎসা উলঙ্গিনী রমণী মূর্ত্তির নাম জপে ও রূপ ধ্যানে, আজ ইংরাজী জানে এমন কয়জন বাঙ্গালীকে হাতে পায় ধরিয়া রাজী করান যাইতে পারে—আমি জানি না। অথচ ইঁহারাই রামপ্রসাদের সাধনার ও কল্পকলার—একমাত্র অভ্রান্ত মল্লিনাথ!

এই কালী নামের পশ্চাতে,—এই হর-হৃদবাসী সর্ব্বনাশী, বিবসনা, এলো-কেশীর রূপের পশ্চাতে,—এমন একটা জ্ঞান বিজ্ঞান মিশ্রিত আছে—যাহাকে ফেরঙ্গ যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালী জন্ম সত্বেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ আর তা হয় না। একশ বছরে এই তফাৎ দাঁড়াইয়াছে। শুধু কি সে জ্ঞান নাই? যে ভাবের ভাবুক হইলে রামপ্রসাদের গীতি মন্দিরে প্রবেশের অধিকার জন্মিতে পারে, সে ভাবের কণামাত্রও আমরা আজ দাবী করিতে পারি না। এই অজ্ঞানে, অভাবে, —এমন কি মনে কত কুভাব পর্য্যন্ত লইয়া আমরা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের গানের মন্দিরে প্রবেশের পথে দাঁড়াইয়াছি। এই মন্দিরে নানা কোঠা আছে, সর্ব্বশেষ মণিকোঠা আছে।

লোকে বলে একাধিক রামপ্রসাদ ছিল, তাঁহাদের গান একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আমি এই কিংবদন্তী স্মরণে রাখিয়া সমস্ত গানগুলি যতবার খোঁজাপাতা করিয়াছি, ততবারই একজন শিল্পীর হাতের নিদর্শনই পাইয়াছি। যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, আশা করি দয়া করিয়া, কেহ আমার এই ভ্রম দূর করিয়া দিবেন। এই গানগুলিতে একজন শিল্পীর হাত দেখা গেলেও ইহার রচনা সৌষ্ঠবে, ইহার ভাবের ক্রমিক উৎকর্ষতার মধ্যে একটা সাধক-জীবনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস অতি সহজেই চক্ষে পড়ে।

আমি মোটামুটি হিসাবে, বহু খণ্ডন্তর ও বিভাগ মুছিয়া দিয়া, মাত্র দুইটি শ্রেণীতে রামপ্রসাদের গানগুলিকে সন্নিবেশ করিতে চাই। একশ্রেণীর গান সাধনের সময় রচিত, আর এক শ্রেণীর গান—সিদ্ধি বা সমাধির অবস্থায় রচিত। অবশ্য সাধন হইতে সিদ্ধির পথে যে সমস্ত গান রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে আর এক তৃতীয় শ্রেণীতে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাবের ন্যূনাধিক তৌল করিয়া সেগুলিকে হয় সাধনা কিম্বা সিদ্ধির কোঠার গানের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া, নিপুণ সমালোচনা না হইলেও, কবির উপর নিতান্ত অবিচার হইবে না।

রামপ্রসাদের গানে কৃত্রিম লিপিচাতুর্য্য কম। ভারতচন্দ্র হইতে এইখানে তাঁহার পার্থক্য। তথাপি চরিত্র বিশ্লেষণে, ভারতচন্দ্র হইতে রামপ্রসাদের ক্ষমতা কত ত কিছুতেই নয়, চাই কি বেশীও হইতে পারে। রামপ্রসাদে সংস্কৃত ও মুসলমানী প্রভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়; কিন্তু ভাবে ও প্রকাশে, রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ অভিনব, অনুপম, অদ্বিতীয়। মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিতে কালীর মাহাত্ম্য যে বাঙ্গালী শুনিয়া আসিয়াছে, সেই বাঙ্গালী রামপ্রসাদের প্রসাদী-সঙ্গীতে জগজ্জননীর সহিত এমন এক আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, যাহা সত্যই বাঙ্গালীকে এক আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিবার অধিকারী করিয়া গিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের মত ছন্দের গতি-বিন্যাস, শব্দের ঝঙ্কার বামপ্রসাদে নাই। কবিতায় বুদ্ধির খেলা যুক্তির মার-প্যাঁচ ইহাতে কম। অবিচারে লোক-রুচির সমর্থন, রাজানুগ্রহের মোহ ও মাদকতা, আত্মাবমাননা এ কিছুই রামপ্রসাদের ছিল না। ভারতচন্দ্রে ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে আমরা প্রথমেই রামপ্রসাদের স্বাতন্ত্র্য, গীতি কেশরীর রাজসভা হইতে দূরে পল্লীপ্রান্তে নির্জ্জন গরিমায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

রামপ্রসাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর
(দ্বিতীয় পল্লব)

[রামপ্রসাদ একজন সাধক ছিলেন—তাঁহার সাধনাই তাঁহার কাব্যে ও গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।—কালী মূর্ত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ সাধনা। বাঙ্গালীর একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের তুলনা—

রামপ্রসাদের সাধক জীবন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার গানের বিভিন্ন স্তর। রামপ্রসাদের গানের মূলতত্ত্ব এই:—বিশ্বের আদি অন্তে সৃষ্টি প্রবাহে যা কিছু ঘটিতেছে তা সমস্তই বাজীকরের মেয়ে, তার শ্যামা মায়ের নাচ। এই বিশ্ব-নৃত্যই কালীর নৃত্য। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তই মায়ের নৃত্যের তালে তালে জাগিয়াছে। ইহার একটা পাপ আর একটা পুণ্য, এইরূপ পৃথক করিয়া রামপ্রসাদ দেখেন নাই। এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের দার্শনিক দৃষ্টি একই প্রকার উদার। এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণব বাঙ্গলার একই প্রাণ হইতে জন্মিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদই বিশ্বকবি—কেননা তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও বাঙ্গলার কবি বিশ্বকবি হইতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান চণ্ডিদাসেও আছে, রামপ্রসাদেও আছে। দেহ শয়তানের, আর আত্মা ভগবানের, ইহা খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা, ইহা বাঙ্গালীর সাধনার কথা নয়। শাক্তেরও নয়, বৈষ্ণবেরও নয়। দেহতত্ত্বের গান চণ্ডিদাসেও আছে, রামপ্রসাদেও আছে। কারণ, বাঙ্গলার একই স্বরূপ হইতে ইহাদের জন্ম। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথাই আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই নহে, এক।]

সাধন সময়ে রামপ্রসাদ যে সমস্ত গান রচনা করিয়াছিলেন—তাহাতে ভোগায়তন দেহের জন্য অনিত্য সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া—প্রথম নামে রুচি আনিবার জন্য কত মতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ মনকে প্রথমেই বুঝাইয়াছিলেন যে—ওরে মন, যদি অভয়পদে বাসা লবে, তা হ'লে অনিত্য সুখের আশা তুমি ছাড়।

মন করো না সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
হয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যাজে আলয়
বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো
শিবের দৈন্য দশা।

* * *

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে
ও মন সুখের আশা বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
ক'রোনা এ কথায় গোঁসা
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ
ডাকের কথা আছে ভাষা।

চণ্ডিদাস বলিয়াছেন, "সুখ দুঃখ দুটি ভাই।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ।" বিভিন্ন সাধনপথে অন্তর্দৃষ্টিতে সেই একই অনুভূতিতে যে বাঙ্গলার সাধকেরা উপনীত হইয়াছিলেন ইহা তাহার প্রমাণ।

রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি সংসারী ছিলেন। তাঁহার অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। তিনি অভিমান করিয়া জগজ্জননীকে কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে মায়ের দয়াময়ী নাম একেবারেই মিথ্যা, নইলে—

'কারু দুগ্ধেতে বাতাসা'
আমার এম্নি দশা শাকে অন্ন মেলে কৈ ?
কারু আছে কত ধন জন, হস্তি অশ্ব রথচয়
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ?

জগজ্জননীর নিকট এই স্নেহের অভিমান ; আর এমন প্রাণস্পর্শী সরল শিশুর কণ্ঠে তাহার প্রকাশ বাঙ্গলার গীতি কবিতার এক অমূল্য সম্পদ। একদিকে সাংসারিক অসচ্ছলতা, আর একদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজানুগ্রহের প্রবল মোহ— রামপ্রসাদ সাধনের প্রথম অবস্থায় এই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া প্রথমেই মনকে বুঝাইলেন—মন গোঁসা করো না,—অনিত্য সুখ কিছু নয়। একদিকে মনকে এইরূপ বুঝাইতেছেন—আর একদিকে—জগজ্জননীর নিকট অভিমান আব্দার এমন কি স্নেহমাখা তীব্র মধুর ভর্ৎসনা করিতেছেন। সাধকের জীবনের এই অবস্থা কল্পকলায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, নাম জপ বলিয়া একটা আবহমান কালের সাধন পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলাও ভুলিতে পারে নাই। রামপ্রসাদের সাধক জীবনে, ও সেই সাধক জীবনের যে রূপ ও সুর তাঁহার গানে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই প্রসাদী গানে, নাম জপের বহু নিদর্শন আমরা পাই। রামপ্রসাদ সাধনের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথে নানা ভাবে এই নাম-জপকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই নাম-জপের বিরুদ্ধে তর্ক উঠিয়াছিল এবং উঠিবে। কিন্তু রামপ্রসাদ বলেন—

কালী যার হৃদে জাগে
তর্ক তার কোথা লাগে
এ কেবল বাদার্থ মাত্র—খুঁজে দেখ ঘট পটেরে।

তাই রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ রসনাকে কালী নাম জপিবার জন্য, রসনাকে বশ করিয়া শ্যামা নামামৃত রস গান ও পান করাইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম
করে জপ না কালীর নাম কি তব উৎকট রে।

শ্রুতিরসে তত্ত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে কালী বলে কাল কাটরে।

আমরা এই গানের ভিতর কি দেখিতেছি? একটা জগজ্জয়ী সাধনার পূর্ব্বাভাস। তর্কে বিরতি, নামে রুচি, হস্তকে নাম জপ, রসনাকে নাম কীর্ত্তন। শ্রবণেন্দ্রিয়কে অন্য নাম না শুনিয়া—কালী নাম গান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই অবস্থার ও এই শ্রেণীর আরও অন্যান্য বহু গান দেখা যায়।

১। কালী কালী বল রসনারে—
২। ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব,
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস,
বলতে নারিস দুর্গা শিব?
৩। ডাকরে মন কালী বলে—
৪। মনরে তোর চরণে ধরি, কালী বলে ডাকরে ওরে মন—
৫। কালী নাম জপ কর যাবে কালীর কাছে
কালী ভক্ত জীব যে ভাবে যে আছে।
৬। কালী কালী বল রসনা।
৭। কালী তারার নাম জপ মুখেরে
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে।—

প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রেণীর। আবার যেখানে সাধক অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে—আর কালী বলে ডাকব না—সেগুলিও বাহ্য অভিমানের আবরণে বস্তুতঃ নাম জপের গান—যেমন—

১। আর তোমায় না ডাকবো কালী
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে
মা হয়ে তার মাথা খেলি।
২। মা বলে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাক্‌লে এসে দেখা দিত,
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হ'লেম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই॥
৩। মা, মা, বলে আর ডাকবো না—
ডাকি বারে বারে মা, মা, বলিয়ে—

মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে—
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে—
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।

নাম জপ করিতে করিতে যখন কালীর কালঘনরূপ ধ্যানে প্রকট হইতেছে না—এ সেই অবস্থার গান। মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ছেলে যখন হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে—অথচ মার দেখা নাই—ইহা সেই অবস্থায় সন্তানের অকৃত্রিম অভিমানের গান, কল্পকলায় কি সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে। অপর কোন সাহিত্যে ইহার তুলনা কি আমায় কেহ দেখাইতে পার ?

নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সাধকের মন ইষ্টদেব বা দেবীর রূপ-ধ্যানে মগ্ন হয়। রামপ্রসাদ কালী মূর্ত্তির যে ধ্যান করিয়াছেন, শাক্ত সাহিত্যের ধারায় সেই মূর্ত্তি কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সাধক ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পথে জাগ্রত রহিয়াছে। এই কালী মূর্ত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটা বিশেষ সাধনা। বাঙ্গালীর একটা বিশেষ সাধনা রামপ্রসাদের জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য ধারার একটি রূপকে রামপ্রসাদের কল্পকলা শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে লইয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদ যে সমস্ত গানে কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই গানগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি গান কালীর বাহিরের রূপ বর্ণনায় নিয়োজিত। সেগুলি সম্ভবতঃ সাধনের প্রথম অবস্থায় রচিত। ইহা ছাড়া কালীর রূপ বর্ণনার সঙ্গীতগুলিতে শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য ও কলার প্রসাধন দেখিয়া মনে হয়, ইহা নিশ্চিতই প্রথম অবস্থার লেখা। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কাব্যে, ও গানে, ছন্দ ও শব্দ বিন্যাসের প্রতি যে একটা প্রসাধন লক্ষ্য করা যায়, ইহা তাহারই পরিচয়। ভারতচন্দ্র এই কলা-প্রসাধনে সিদ্ধ হস্ত। কিন্তু ছন্দের গতি আর শব্দের ঝঙ্কার আমি কবিতার বহিরাবরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ভারতচন্দ্রের কালী ও শিবের রূপ বর্ণনায় ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু ভাব ও ছন্দে মাখামাখি হইয়া কল্পকলা রূপান্তরিত হইয়া ভাগবত সত্যে উপনীত হইতেছে ইহা ভারতচন্দ্রে নাই তাহা নয়, তবে অতি অল্প। রামপ্রসাদের কালীর রূপ বর্ণনাবহুল অনেকগুলি সঙ্গীত—এইরূপে ভারতচন্দ্রের কল্পকলার রাজ্যকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। বরং ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারে যেখানে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দণ্ডায়মান—সেখানে অনেক স্থানেই রামপ্রসাদ হইতে ভারতচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাব্য ত শুধু ছন্দ আর শব্দ ঝঙ্কার নয়। কাজেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের রাজ্য হইতে রামপ্রসাদের কাব্যরাজ্যের পরিসর অনেক উচ্চে—দূরে অবস্থিত ও বিস্তৃত।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বাঙ্গালী নিশ্চিতই এ কথা জানিত। কিন্তু আমাদের আজ এ কথা আবার নূতন করিয়া বলিতে ও শুনিতে হইতেছে।

ভারতচন্দ্র—কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা মূর্ত্তির শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা তাঁহার অনুপম 'অন্নদামঙ্গল' আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কালী—

লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে।

ভারতচন্দ্রের শিব—

লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল, হুমু হুমু হুমু যোগিনী বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া। ইত্যাদি।

অথবা—

মহারুদ্ররূপে, মহাদেব সাজে, ভভম্ভম ভভম্ভম
শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা, ছলচ্ছল টলট্টল
কলক্কল তরঙ্গা॥
ধবক্ ধবক্ ধক্ ধবক্ জ্বলে বহ্নি ভালে, ববম্বম ববম্বম
মহাশব্দ গালে।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে অরেরে অরে দক্ষ
দেরে সতীরে॥

এই শাক্ত সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করিয়া যদি আমরা ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবির কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করি—তবে দেখিতে পাই যে, শিবের রূপ বর্ণনায় যে ছন্দ ও শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য তাহা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী হিসাবেও গৌরবব্যঞ্জক। কবি গোবিন্দদাসের কালিকা মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে শিবের এইরূপ রূপবর্ণনা আছে। যথা—

সুর নদী চন্দ্রিম মুকুট মাল ভূষণ ফণিমাল
কুন্তল সোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বলে আধ মিলন রজত
ধরাধর অঙ্গ দ্যুতি॥

আর একটা—

নৌমি নন্দি কেশ ঈশ, কণ্ঠে কাল কূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেব দেব বন্দিনী
অৰ্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ,—মৌলি কেলি চতুরঙ্গ
অৰ্দ্ধ ভঙ্গ অতিরঙ্গ সোহে জহ্নু নন্দিনী।
রঙ্গনাথ লোক পাল অৰ্দ্ধ অঙ্গ বাঘছাল
ব্যোমকেশ শেষমাল ভালে ইন্দু মোহিনী।

এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের শিবের রূপ বর্ণনার একটা সঙ্গীত উদ্ধার করিতেছি।

হর ফিরে মাতিয়া শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।—
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম ভো ভো ভো ববম ববম
বব বম বব বম গাল বাজিয়া।
মগন হইয়া প্রমথনাথ, খেটক ডমরু লইয়া হাত
কোটী কোটী দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মালা
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গর্ব্ব মানিয়া!
* * *
শব আভরণ গলায় শেষ দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া,
বদন ইন্দু, ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল
লহরী উঠিল কল কল কল জটাজুট মাঝে থাকিয়া।

রামপ্রসাদের কল্পকলা এখানে তাঁহার পূৰ্ব্বগামী ও সমসাময়িক কবিদের কল্পকলার সমান আসন মাত্র দাবী করিতেছে।

রামপ্রসাদের কালীর রূপ-বর্ণনার সঙ্গীতগুলি উদ্ধার করিতেছি—

১। এলোকেশে, কে শবে, এলোরে বামা?

২। সমরে কেরে কালকামিনী?
কাদম্বিনী বিড়ম্বনী, অপরা কুসুমা পরাজিতা বরণী কে রে রমণী?

৩। ও কার রমণী সমরে নাচিছে
দিগম্বরী দিগম্বরোপরে শোভিছে।

৪। সমর করে ও কে রমণী ?

রণোন্মত্তা রুধিরাপ্লুতা এই কালী মূর্ত্তিকে রামপ্রসাদ পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতগুলিতে যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কল্পকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কল্পকলার অপরিণত অবস্থারও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর—

১। ও কেরে মনোমোহিনী
ঐ মনোমোহিনী
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা মণি মরকত কান্তিছটা—

২। হের কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে
কে রে নবনীল জলধর কায় হায়, হায়
কে রে হরহৃদি হৃদ্‌পদে দিগবাসে ?

৩। ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে
গলিত চিকুর আসব আবেশে।

৪। নবনীল নীরদ তনুরুচিকে ?

৫। আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীণা নগণা লাজ বিরহিতা ভুবন মোহিতা
একি অনুচিতা কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবরগতি আসব আবেশ
লোলিত বসনা গলিত কেশ
সুর নর শঙ্কা করে হেরি বেশ
হুঙ্কার রবে রে দনুজ-দলনী

* * * *

বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,—
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী।

৬। ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ
বসন বিহীনা কে রে সমরে—

৭। ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে ?

৮। মা, কত নাচ গো রণে !

রামপ্রসাদ এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলিতে—সাধনের প্রথম অবস্থায় সমসাময়িক কবিদের অনুসৃত পদলালিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের দৃঢ় সংকল্পের একান্ত প্রয়োজন। সাধক

মাত্রেই তাহা জানেন। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন—আমি আর অসময়ে কোথায় যাব? মায়ের চরণ তলেই পড়ে রব। মা যদি আর জায়গা না দেয় তবে না হয় বাহিরেই পড়ে থাকবো, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে থাকবো—দেখি মায়ের দয়া হয় কিনা। মা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়—আমি দুহাত বাড়িয়ে চরণ তলে পড়ে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

মায়ের চরণ তলে লব স্থান লব
আমি অসময়ে কোথায় যাব। ইত্যাদি

এইখানে সাধনায় ও কল্পকলায় রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে।

তারপর যখন সাধন পথে এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তিনি অগ্রসর—তখন পথ দেখিতে দেখিতে একদিন তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—যে বাসনা মনে করিয়া অগ্রসর হইলাম—তার ত কোনই চিহ্ন দেখা যায় না, আমায় দয়া হবে কি না-হবে ঠিক ঠিক বলিয়া দাও—

এলোকেশী দিগ্‌বসনা
কালী পুরাও মনোবাসনা
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশমাত্র নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না-হবে দয়া
ব'লে দে মা ঠিক ঠিকানা।

ইহাও সাধনের একটি অবস্থার কথা। সাধন-পথের এই গানে রামপ্রসাদ ক্রমশঃ তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের লিপিচাতুর্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া নিজের সহজ সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছেন।

যখন এইরূপ নামজপ ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে—সাধকেরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে থাকেন—তখন সাধনের বিঘ্নগুলি একে একে তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত একশত বিঘা নিষ্কর জমি রামপ্রসাদ গ্রহণ করিলেও তিনি ভারতচন্দ্রের মত রাজার সভাকবি হইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

মায়ের নিকট 'নুন মিলে না আমার শাকে' বলিয়া আদুরে ছেলের মতন অভিমান করিয়াছেন, তেমনি গাহিয়াছেন—

কাজ কি মা সামান্য ধনে
ও কে কেঁদেছে গো তোর ধন বিহনে।

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে
যদি দেও মা আমায় অভয়চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে।

তারপর ষড় রিপুর সহিত দ্বন্দ্ব। মনের সহিত বোঝাপড়া। এগুলিও সাধন পথেরই গান। সাধক একবার মনকে বুঝাইতেছেন, আবার অবুঝ মনের সহিত গোঁসা করিতেছেন, আবার কখনও বা মনের বিরুদ্ধে মায়ের নিকট নালিশ করিতেছেন—।

১। মনরে তোর চরণ ধরি
কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন—

২। মন জান নাকি ঘটবে লেঠা
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি
দিনের সুদিন যেটা।

৩। মন তুমি দেখরে ভেবে
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য
মরিতে হবে

৪। মন হারলি কাজের গোড়া
তুমি দিবানিশি ভাব বসি
কোথায় পাব টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।

৫। মনরে তোর বুদ্ধি এ কি ?

৬। মনরে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে বেড়িয়ে কেন
বেড়াও ক্ষিতি ?

৭। মন কালী কালী বল—

৮। তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন
ওরে আমার শুয়া পাখী
আমারি অন্তরে থেকে আমারে দিতেছ ফাঁকি

৯। আয় দেখি মন তুমি আমি
দুজনে বিরলেতে বসি রে।

১০। মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রৈল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

তারপর মনের সঙ্গে গোঁসা করিতেছেন—

১। ভাল নাহি মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন
কুপথে চলে?

২। নিতি তোরে বুঝাবে কেটা
বুঝে বুঝলি নারে মনরে ঠেঁটা
কোথায় র'বে ঘর বাড়ী তোর
কোথায় র'বে দালান কোঠা?

আবার মনকে বুঝাইতেছেন—

১। আয় দেখি মন চুরি করি তোমায় আমায় একত্তরে
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ যদি আনতে পারি হ'রে।

২। সামাল ভবে ডুবে তরী
ও মন, তুমি পরের ঘরের হিসাব কর
আপন ঘরে যায় যে চুরি।

পুনরায় দুঃখিত চিত্তে মায়ের নিকট নালিশ করিতেছেন—

১। ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস্
বলতে পারিস্ দুর্গা শিব?

মাকে বলিতেছেন—

১। দুঃখের কথা শুন মা তারা
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা
যাদের নিয়ে ঘর করি মা—
তাদের এম্নি কাজের ধারা
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা
সুখের ভাগী কেবল তারা।

২। ঘরের কর্ত্তা যে জন স্থির নহে মন
ছ'জনেতে কল্লে সারা।

৩। ভূতের বেগার খাটিব কত ?
তারা, বল আমায় খাটাবি কত ?
আমি ভাবি এক হয় আর
সুখ নাই মা কদাচিত
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায় এ দেহের পঞ্চভূত

* * *

ও মা যার সুখেতে হব সুখী
সে মন নয় গো মনের মত।

৪। মা, আমায় ঘুরাবে কত ?

কাঞ্চনের মায়া ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইতে যে এক সময়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়, এই গানগুলিতে সাধক জীবনের সেই স্তরের কথা বলিতেছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগে, মনের বাসনায়,—ভগবানের লীলা নাই—ইহা শয়তানের খেলা, ইহা পাপ,—এ তত্ত্ব খ্রীষ্টানী তত্ত্ব, এ তত্ত্ব রামপ্রসাদের সাধক জীবনে ও কল্পকলায় স্থান পায় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থাতে রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

মন গরীবের কি দোষ আছে
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝে গেছে
ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল
ফল ফলাচ্ছ কলা গাছে
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে
ওমা তুমি দুঃখ তুমিই সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্রে যে সূতার কাটনা কেটেছে
ও মা মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপি খেলা খেলিছে।

কর্ম্মফল, জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব—এই গানের কল্পকলায় ফুটিতে চাহিতেছে—কিন্তু আমি এই গানের রূপান্তরে যে কথাটি বুঝাইতে চাই তাহা হইতেছে এই যে—বিশ্বের আদি অন্তে সৃষ্টি প্রবাহে—এই লীলাস্রোতে যা কিছু ঘটিতেছে—সাধক রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে—তা সমস্তই—বাজীকরের মেয়ে শ্যামা মার 'নাচ'।

এই বিশ্বনৃত্যই কালীর নৃত্য। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত। ইহার কোন বৈচিত্র্যই মায়ের চরণাঘাত ভিন্ন জাগে নাই। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তই মায়ের নৃত্যের তালে তালে জাগিয়াছে। মনের প্রত্যেক বাসনাতেই মায়ের নৃত্য চরণ-নূপুর রুনু ঝুনু ধ্বনিত হইতেছে। ইহার একটা পাপ আর একটা অপাপবিদ্ধ বলিয়া লেভেল আঁটিয়া দূরে রাখা—বাঙ্গলার শেষ শক্তিসাধক শেষ শক্তি গায়ক রামপ্রসাদ সমীচীন মনে করেন নাই। এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদাত্মা। এইখানেই বাঙ্গলার প্রাণের এক স্বরূপের পরিচয়।

তারপর ক্রমে যখন সিদ্ধির কাছাকাছি গিয়া উপস্থিত হইতেছেন তখন সাধক ও কবি একাত্ম হইয়া যে সাধনা-গানে রূপান্তর করিতেছেন তাহার সত্যই তুলনা নাই। আমি আধুনিক বাঙ্গলার 'অন্ধ আঁখি'কে আবার তা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে বলি। কেন না ইহা সত্যই 'তিমিরে তিমিরহরা'।

ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
কি করবো আর ভবের হাটে
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বাঁধরে বুক এঁটে সেটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি ভবের মায়া বেড়ী কেটে।

শ্যামা মা ঘুড়ি উড়াইতেছেন এই ভব সংসার বাজারের মাঝে। "মায়াদড়িতে" সকল ঘুড়িই বাঁধা কিন্তু "ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা।" তথাপি

ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।

এইবার রামপ্রসাদ কাটা-ঘুড়ির মত শূন্যে উধাও ছুটিয়াছেন। তাঁর কল্পকলায় এই তার আভাষ—

আর ভুলালে ভুলবো না গো
আমি অভয়পদ সার করেছি
ভয়ে হেলবো দুলবো না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলবো না গো
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বলবো না গো
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো।

এইবার "ঠিক ঠিকানা" অনেকটা সাধকের করতলগত হইয়াছে। যে মৃত্যু-

ভয় দেখাইয়া মনকে তিনি কত শাসাইয়াছেন, সেই শমনকে এবার তিনি দূর হইয়া যাইতে বলিতেছেন এবং না গেলে "সোজা" করিয়া দিবেন এমন আভাষও দিতেছেন। কেন না এখন তিনি—

ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকোহাজা

এখানে তিনি শ্যামা মাকে কয়েদ করিয়াছেন—

১। মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি
হৃদি পদ্মে বসাইয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।

শমনকে স্পষ্ট কেমন বলিতেছেন—

২। দূর হয়ে যা যমের ভটা
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা
বলগে যে তোর যমরাজাকে
আমার মতন নিছে কটা
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা
প্রসাদ বলে কালের ভটা
মুখ সামলিয়ে বলিস বেটা
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা।

৩। যারে শমন যারে ফিরি
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি?

৪। ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে

৫। 'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি

৬। কালী নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়ায়ে—
ওরে শমন তোরে কই আমিত আটাশে নই
তোর কথায় কেন রব সয়ে?
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে হুম্‌কো দিয়ে।

সাধক এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠ। তিনি মশারি তুলিয়া নিজের মুখ দেখিয়াছেন।

তিনি এবার নিজেকে জানিয়াছেন "ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা"। বাঙ্গালী একদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও—যে সাধনে নিজেকে ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা জ্ঞানে যমরাজকে মুখ সামলাইয়া কথা বলিতে স্পর্দ্ধা করিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালীর গানের রূপান্তরে সাধনা শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে—তার পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালীকে সেই সাধনভ্রষ্ট কে করিল? গানের রূপান্তরে সেই সরল স্বাভাবিক সুর—কিসের কৃত্রিমতায় ডুবিয়া গেল—? সাহিত্য জীবন ও সাধনায় এ ব্যবচ্ছেদ কেন হইল? আজ শতমৃত্যু ভয়ে ভীত বাঙ্গালী কেন মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল? আমায় বলিয়া দাও কোন্ বিশ্বের সহিত সঙ্গমে তার কপালে ইহা ঘটিল? অন্ধকার বিশ্বের অন্ধতম কোণে বাঙ্গলা সাহিত্য এতদিন নাকি ধুঁকিয়া মরিতেছিল। আজ শতবর্ষ তার উপর দিয়া উদার বিশ্ব সাহিত্যের আলোক চম্‌কিয়া গিয়াছে। কূপের ভেক সাগরে পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? আজ বাঙ্গলায় যে অন্ধকার—সাহিত্যে, জীবনে ও ধর্ম্মে, আজ বাঙ্গলায় যে প্রাচীর ঘেরা অন্ধকূপের সৃষ্টি—বাঙ্গলার ইতিহাসের পাতা এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া আমাকে দেখাও—তার কোন্ পাতায় বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে?

আপনারা আমাকে যত ইচ্ছা গালি দিন—কিছু আসে যায় না। আমার 'প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না'—তাই একথা আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতেই হইবে। যাঁহারা বাঙ্গলাকে এ যুগে বিশ্বের সাগর সঙ্গমে লইয়া গিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছেন—আমি তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি না।' বাঙ্গলাতে বসিয়া—একদিন যার সাধনা ও কার্য্য বাঙ্গালীকে 'ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা' এই উপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে,—সেই বাঙ্গালী সাধক—সেই বাঙ্গালী কবিই আমার নিকট বিশ্বকবি। কেন না তাঁর কাব্যে, তাঁর সাধনায়—বিশ্ব যিনি, বৈশ্বানর বিরাট যিনি, তিনি উপহৃত হইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বাঙ্গলার কবি বিশ্বকবি হইতে পারিয়াছেন। রামপ্রসাদের গীতি-কবিতার আলোচনায় আমি তাহাই বলিতে চাই।

কালীর বাহিরের রূপবর্ণনার প্রসাদী সঙ্গীতগুলিকে আমি কৃষ্ণচন্দ্রীয় শব্দ যুগের কাব্য বলিয়া ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতার সহিত তুলনা করিয়া আসিয়াছি। এমন কি এই স্তরে অনেক দিকে রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না—তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সাধনের ধাপে ধাপে উঠিতে গিয়া যখন কালীকে বাহির ছাড়িয়া অন্তরে দেখিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার কাব্যে যে

রূপান্তর ঘটিতে লাগিল—তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যলোককে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ ও তার পূর্ব্বে ও পরের কত যুগকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া ফেলিল—গ্রথিত করিয়া বাঙ্গলার গান—বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্তকে কোন্ উর্দ্ধে লইয়া গেল। কাব্যের এই অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর বস্তুতই বিস্ময়াবহ।

আমার বাঙ্গলার শ্যামলশ্রী। পায়ের তলে এই কচি সবুজ ঘাস,—মাথার উপর ঐ আকাশের নীলিমা—ইহার মধ্যে বসিয়া—

১। নবনীলনীরদ তনুরুচি কে।

২। কে রে নবনীল জলধর কায়—হায় হায়,

আমার মায়ের এই ছবি রামপ্রসাদ আঁকিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এবার যে বাহির হইতে অন্তরে আসিয়া উদয় হইতেছেন—সমস্ত দেহে, মনে প্রাণে, সাধক মায়ের আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন। আপনারা বোধ হয় মায়ের এই আবির্ভাব পর্য্যন্তই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি বলিব সাধকের নিকট মা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দেন। এ কথা লইয়া তর্ক বৃথা। ইহা লইয়া কেহ তর্ক করে না। আমিও করিব না।

বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান আছে। চণ্ডিদাসেও আছে—রামপ্রসাদেও আছে। দেহ শয়তানের,—আর, আত্মা ভগবানের—ইহা পাদ্রীরাই এ যুগে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা বাঙ্গলার সাধনার কথা নয়,—শাক্তেরও নয়, বৈষ্ণবেরও নয় কাজেই যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে তেমনি শ্যামা সঙ্গীতে—দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ইষ্টদেবদেবীর অনুপম লীলা-মাধুর্য্য প্রথম আস্বাদিত হইয়া পরে কাব্যে ও গানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'মাতৃভাবে' রামপ্রসাদ তত্ত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহতত্ত্ব ও সাধনা প্রণালীতে যে আভাস ও ইঙ্গিত আমরা পাই,—চণ্ডিদাসেও ঠিক তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি। কেন এরূপ হয়? চণ্ডিদাস রামপ্রসাদ ভিন্ন নয় এক। বাঙ্গলার একই স্বরূপ হইতে ইহাদের জন্ম।

রামপ্রসাদ বাহির ছাড়িয়া এবার হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে চলিলেন। এক ডুবে কুলকুণ্ডলিনীর কূলে গিয়া উঠিলেন। এইবার প্রাণের খেলা—এইবার অন্তরঙ্গ সাধনা। আমরা দেখিব কল্পকলায় তাঁর কি রূপ বিকাশ হইয়াছে। রামপ্রসাদ অগাধ জলে ডুব দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

কে জানে গো কালী কেমন
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।

কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদাযোগী করে মনন
আত্মারামের-আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন
মহাকালে জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ হাসে, লোকে ভাবে, সন্তরণে সিন্ধু গমন
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

কেবল মহাকাল কালীর মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, জীব—শিব না হইলে এই কালীর মর্ম্ম তেমন বুঝিবে না। প্রাণের যে অনুভূতি এই গানের রূপান্তরে ফুটিতেছে—যে দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব—একসঙ্গে কল্পকলার রূপান্তরে প্রকট হইতেছে—তাহার কাছে ষড়দর্শনের ও শাস্ত্রবিদ্যার অসার তর্ক—আমি আবার বলি, 'গোস্পদের সঙ্গে তুলনীয়' এই সমস্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। কেন না আমার তাহাতে অধিকার নাই। কথার দ্বারা ইহার বিশ্লেষণ ও সমীকরণ হয় না। ইহা সাধনের অঙ্গীভূত। সাধন ব্যতিরেকে, দীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে ইহার ঠিক ঠিকানা মিলিবে না। বাঙ্গালী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা মহলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মণিকোঠার পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই মণিকোঠার চাবি যাহাদের হাতে ছিল—আজ তাহারা কে জানে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে। আমি ইহার খবর জানি না। আপনাদের যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, মন. মুখ এক হয়,—কাপট্য, শাঠ্য ও জাড্য দোষ দূর হয়, তবে আবার হয়ত একদিন মা কৃপা করিয়া—এই বিশ্বের বিদ্যালয়ের পথে পথভ্রান্ত বাঙ্গালীকে আবার তাঁর মন্দিরের মণিকোঠার দিকে ডাকিবেন। পঞ্চবটী তলে যে সাধক সে দিন আসিয়াছিলেন—সেই মায়ের পূজারীকে আবার তিনি পাঠাইবেন। আমি বাঙ্গালীর গানের কথা, কল্পকলা ও তার রূপান্তরের কথা বলিতে বসিয়াছি। কেবল তাহাই বলিব।

আমি তত্ত্বমূলক গানগুলির দুই চারিটি উদ্ধার করিতেছি।

১। দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দে সে মগনা।

২। সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে
স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।

৩। সে কি শুধু শিবের সতী ?
যারে কালের কাল করে প্রণতি
ষটচক্রে চক্র করি কমলে করে বসতি
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি সহস্রদলে করে স্থিতি।

৪। হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নানা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা।

৫। আমার মনে বাসনা জননি
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ-ল-ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী।

এই গানটির গাঁথুনির মধ্যে সাধন ও তত্ত্বকথা এমন মিশ্রিত যে, সাধক ও সিদ্ধ ব্যতীত, কেবল সাহিত্যালোচনায় ইহার অর্থবোধ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৬। শমন আসার পথ ঘুচেছে
আমার মন সন্দ দূরে গেছে
আমার ঘরে ত নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে।

৭। তারা আছ গো অন্তরে মা আছ গো অন্তরে
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা।
একস্থান মূলাধারে অন্য স্থান সহস্রারে
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।

ইহার সহিত চণ্ডিদাসের—

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল
তার তলে মণিপুর পরমশিবের স্থল।

এই তত্ত্বগানটির ষটচক্র সাধনার নিতান্তই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথাই আমরা এ যুগে শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু মণিকোঠার খবর লইলে দেখা যাইবে বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপে, শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই নহে—এক।

রামপ্রসাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রসাদী সঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রভাব

(তৃতীয় পল্লব)

[রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কিনা তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে বৈষ্ণবের উপর শ্লেষ আছে। ইহা বৈষ্ণবের নিন্দা নয়, অবৈষ্ণবের নিন্দা। ইহা বিদ্বেষ নয়, ইহা বিদ্রূপ বা কৌতুক। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকার্ত্তন এই দুইখানি গীতিকাব্যই রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধের মধ্যে রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। কালীকীর্ত্তনের ভাষার সাক্ষী বৈষ্ণব-প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ। বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সাক্ষীও বৈষ্ণব-প্রভাবের আর এক প্রমাণ। আগমনী ও বিজয়ার বাৎসল্য-রসের সৃষ্টিতেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে বৈষ্ণব-প্রভাব শুধু নয়, বৈষ্ণব-সাধনে প্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক সাধনাতেই সিদ্ধ অবস্থা, বিদ্বেষের অতীত অবস্থা। রামপ্রসাদ সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধ পুরুষের বিদ্বেষ থাকে না। রামমোহনের বৈষ্ণব বিদ্বেষ আছে। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত একদিকে চণ্ডিদাসের ধারা, অপরদিকে রামপ্রসাদের ধারা, এই দুই ধারা হইতেই পৃথক—এমন কি উল্টা ধারা। রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত বাঙ্গলার প্রাচীন সাধনার ধারা হইতে জন্মে নাই। বাঙ্গলার প্রাণের সহিত ইহার যোগ নাই। বাঙ্গলা ইহা গ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের গান, সমগ্র জীবনের গান, জীবনের কোন অংশের গান নহে। রামপ্রসাদ মূর্ত্তি-বিদ্বেষী নহেন। তীর্থ মাহাত্ম্যের অস্বীকারকারীও নহেন। লৌকিক সংস্কারের প্রতি কটাক্ষও ইহা নহে। ইহা সাধনের বিভিন্ন স্তরের একটা উচ্চস্তর মাত্র।]

আমি আবার বলি যাহারা দেশের দশকর্ম্মের এক কর্ম্মও না করিয়া নব্য-ন্যায় দায়ভাগ ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব এবং শাক্ত আর বৈষ্ণব এই সব চারিসিকি মিলাইয়া ষোল আনা বাঙ্গলার প্রাণের হিসাব করেন। আমার দুঃসাহস হইতে পারে—কিন্তু আমি তবু বলিব—যে তাঁহারা দেশের অন্তরঙ্গ সাধনা হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই যে দাঁড়ে বাঁধা তোতাপাখীর বুলি আওড়াইতেছেন—ইহার মূল্য এক কাণাকড়িও নয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যাঁহারা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারিয়াছেন যে, রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা দেশের দুর্ভাগ্য—পাশ্চাত্যোৎসাহে এতই বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের

ঐতিহাসিক লেখকদিগকে এমনই অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছেন যে, দশকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এরূপ অপকর্ম্ম তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন।

রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া যাঁহার লেখনী কলঙ্কিত—বাঙ্গলা সাহিত্যের যত বড় ইতিহাসই তিনি লিখুন না কেন, আমি বলিব—তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারায় বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ খুঁজিয়া পান নাই। ইহা আমার হয়ত দুঃসাহস। কিন্তু দুঃসাহসের আজ অন্ত নাই বলিয়াই এরূপ ঘটে।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কিসে? বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাঁহার বৈষ্ণবের উপর শ্লেষ আছে। 'বিদ্যাসুন্দর'—রামপ্রসাদের নিতান্তই প্রথম অবস্থার রচনা। আর এই গ্রন্থে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা প্রচলিত ধারাকে অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র। শুনা যায় শাক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে রামপ্রসাদ তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থরচনা উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বৈষ্ণবের উপর ব্যাঙ্গোক্তিকে সত্যসত্যই রামপ্রসাদের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যেমন কবির উপর, ততোধিক কাব্যের উপর অবিচার। কবির বর্ণনার কোন কৌতুকাবহ ব্যাঙ্গোক্তিকে যাঁহারা বিদ্বেষ ব্যতিরেকে আর কিছু ভাবিতে পারেন না—তাঁহাদের কাব্যালোচনা সমালোচনার অতীত নহে।

সাধন-অনভিজ্ঞ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন তরুণ যুবক কৃষ্ণচন্দ্রীয় শাক্তযুগের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া—অপরিণত বয়সে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন—সেই বিস্তৃত কাব্য হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করিয়া যিনি রামপ্রসাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রমাণ করিতে চান—তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারায় একজন পথভ্রান্ত পথিক ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

ছত্র কয়টি এইরূপ—

খাসা চীরা বহির্বাস, রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকন গুধড়ী গায়, বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটী দুটী।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥

সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবৎ ॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥
কেমনে করিল কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী ॥

(চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ—প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর)

ইহা একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের দুর্গতির আলেখ্য। ভেকা লোককে ভুলান, এক এক জনার দুটী দুটী ধুমড়ী, গাঞ্জিকা প্রসাদে লাল চক্ষু—ইহা ত বৈষ্ণবকে নিন্দা নয়। বৈষ্ণব নামধারী অবৈষ্ণবের নিন্দা। তারপর খাসা চীরা বহির্বাস—ইহা ত সহাস্য কৌতুক—ইহাতে বিদ্বেষ কোথায় ?

বিদ্যাসুন্দরের পর রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন। এই দুইখানিই গীতিকাব্য। এই দুইখানি গীতিকাব্যই রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-প্রভাব দ্বারা (বিদ্বেষ নয়) অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের বৃন্দাবন লীলার—যশোদা ও গোপালের বাৎসল্যভাবে ভরপুর না হইলে, রামপ্রসাদের পক্ষে—মেনকার ও গৌরীর বাৎসল্যরস কাজের রূপে রূপান্তর করা অসম্ভব ছিল।

ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধারণ ধর্ম্ম-কলহের মধ্যে রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্ত্তনে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক আজু গোঁসাঞীদের পল্লব গ্রাহিতায় আমি আশ্চর্য্য না হইয়া পারিতেছি না। কালীকীর্ত্তনে ভাষার সাক্ষীই বৈষ্ণব প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ।

দর দর ধরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা

ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিনী রব উভয় বাদ···ইত্যাদি। এমন কি বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সাক্ষীও বৈষ্ণব-প্রভাবের প্রমাণ দিতে পারে।

কাতর কামিনী বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন সরমজল উপজেল।

ইহা শুধু ভাষায় নয়—ভাবেও বৈষ্ণব। যাহাকে বিদ্বেষ করা যায় তাহা কি কবির ও কাব্যের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করে ?

আগমনী ও বিজয়ার বাৎসল্য রসের যে সৃষ্টি—তাহার কথা আমি আপনাদিগকে আর একবার বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি। বাঙ্গালী গৃহস্থের বালিকা কন্যার শ্বশুরালয় হইতে আগমনের গানই 'আগমনী,' আর শ্বশুরালয়ে গমনের গানই 'বিজয়া'। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, গৃহস্থালীর কথাই কবির কাব্যলোকে কল্পকলায় রূপান্তরিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহা ঘরকন্নার স্নেহরসের ব্যাপার হইলেও—এই রচনাটিতেও রামপ্রসাদের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বৈষ্ণব প্রভাব ও বৈষ্ণবীয় সাধনায় বিশেষ প্রবেশেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বেষ ত দূরের কথা, সাধনাঙ্গে প্রবেশ না থাকিলে—বৈষ্ণবীয় ভাব লইয়া রামপ্রসাদ কখনই কল্পকলার রূপান্তরে এতদূর সফলকাম হইতে পারিতেন না।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিনী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহন মোহিনী ॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে,
মদন পলায় ডরে ॥
কুটিল কটাক্ষ শরে।
জিনিল কুসুম শরে ॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ
সখী বকুলে বানাইল বেশ
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥

*　　*　　*

চারু অপাঙ্গ কাম-কানন।
নাসা তিলক খর শরাসন ॥
সেই শ্যামসুন্দর মানস মৃগবর।
ভাবে বুঝি করিয়াছে সন্ধান ॥

তারপর এইবার আমি রামপ্রসাদের যাহা বৈশিষ্ট্য, সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থার কয়েকটি গানের সাক্ষ্য আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

১। মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে
অন্তরে শ্যামা।

উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ
যেজন পাঁচেরে একাকার ভাবে তার হাতে
মা কোথা বাঁচ ॥

জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের নকল করিয়া বাঙ্গলার তোতাপাখিগণ বোধ হয় ইহাকে হিনোথিজমের ক্যাটেগরিতে ফেলিবেন। আমি কল্পকলার অভিব্যক্তিতে ক্যাটেগরি বড় ভয় করি। আমি হিনোথিজম বুঝি না। বুঝিতে চাই না। আমি দেখিতেছি জীবন ও তাহার সাধনা। সাধনার অনুরূপ কল্পকলার রূপান্তর। ভেদ শুধু উপাসনা পদ্ধতিতে। বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন স্তরের অধিকারী—পাঁচ রকমের বিভিন্ন উপাসনাই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উপাস্য পাঁচ নয়—এক। জীবনে, সাধনে, রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ এই কথাই বলিলেন। চণ্ডিদাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার সাধনার বৈচিত্র্য আছে ও থাকিবে। কিন্তু বৈচিত্র্য অর্থ বিদ্বেষ নয়। বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপটি জাগিলেই—এই ভ্রমে আর পড়িতে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত গানটিতে এই প্রমাণ হইল যে রামপ্রসাদের শক্তিসাধনায় পাঁচেরে এক করিয়া ভাবিবার অধিকার আছে। বৈচিত্র্যে বিকশিত যিনি—তিনি এক-মেবাদ্বিতীয়ম্। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের বাঙ্গালীও করিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, এই সাধনে সিদ্ধকাম হইয়া গিয়াছে। তারপর—

২। কালী হলি মা রাসবিহারী।
৩। মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
৪। যেই শ্যাম সেই শ্যামা।
৫। কালীঘাটে কালী তুমি,
মাগো কৈলাশে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী,
গোকুলে গোপিনী গো মা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধকের গানেও আমরা ধর্ম্মবিদ্বেষ আঘ্রাণ না করিয়া পারিতেছি না। যে যে সাধনই অবলম্বন করুন—সিদ্ধ অবস্থা যে বৈষ্ণব বিদ্বেষের অতীত অবস্থা তাহা রামমোহন যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন বই কি? রামপ্রসাদ সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষে কোন দ্বেষই থাকিতে পারে না। যদি বল কেন, রামমোহনে ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ছিল, তার এক উত্তর এই যে, পণ্ডিত ও মেধাবী রামমোহন সিদ্ধপুরুষ

ছিলেন না। বাক্‌বিতণ্ডা, শাস্ত্র মীমাংসায় তিনি জগজ্জয়ীও যদি হইয়া থাকেন তথাপি তিনি সিদ্ধিরূপ মণিকোঠার নিম্নতম সোপানেও পৌঁছিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ ও রামমোহনকে জোর করিয়া একই ধারায় দাঁড় করাইবার চেষ্টার মত হাস্যকর চেষ্টা আর কিছুই হইতে পারে না। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে যদি কোন ধারা আসিয়া থাকে তবে তাহা যেমন চণ্ডিদাসের ধারা হইতে তেমনি রামপ্রসাদের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—এমন কি উল্টা ধারা, আমার এই কথা লইয়াই কথা উঠিয়াছে। যখন কথা উঠিয়াছে তখন কথায় যতদূর সম্ভব আমি আবার পরিষ্কার করিয়া আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিব।

আমি বলিয়াছিলাম এবং দীর্ঘ এক বৎসর আবার ভাবিয়া দেখিয়া বলিতেছি যে রামমোহনের সঙ্গীত ধারা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই, রামমোহন তাঁহার ব্রহ্ম সঙ্গীতে বাঙ্গলার প্রাণের ধারার বিনাশকারী বিজাতীয় এক অস্বাভাবিক ধারাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রামমোহনের ধারা বাঙ্গলা গ্রহণ করে নাই।

রামপ্রসাদকে ছাড়িয়া রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীতে আসিবার পূর্ব্বে প্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও দু' একটি কথা আমি বলিব। নাম জপ, রূপ ধ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের গানের রূপান্তরে আমরা সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থার গানগুলিকে কেবল বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে না। ইহার অঙ্গাঙ্গী সাধনরসে মনকে না ডুবাইতে পারিলে কল্পকলার রূপান্তরও হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

প্রসাদ গাহিতেছেন—

১। এবার কালী তোমায় খাব
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা
দুটোর একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে সেই কালী তার মুখে দিব।
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনমানসে পূজিব।

ইহা কেবল একটি উচ্চাঙ্গের সাধন নয়। কল্পকলারও এক অতি বড় রূপান্তর। এই অবস্থাতেই সাধক আবার গাহিতেছেন—

২। এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ॥

"মা বিরাজে সর্ব্বঘটে" ইহাকেই আমি "সাক্ষাৎ দর্শন" বলিতে চাই। এই ভাবের অনুরূপ কথা অনেক পাওয়া যায়। কাব্যের রূপান্তরে কবি সাধন রাজ্যে কোথায়, কোন অবস্থার মধ্যে গিয়া পৌছিয়াছেন তাহা শুদ্ধ মনে অনুভব করিবার ক্ষমতাও হয়ত বা আজ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই অবস্থাতেই সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কোলের গ্রাম্য ব্যাকুল খেলাশ্রান্ত সন্তানের গান—

৩। কেবল আসার আশা ভবে আসা, আশা মাত্র সার হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো ॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল।
মা খেল্‌বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো ॥

৪। সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।

এই সমস্ত গানগুলিতে সাধক জীবনের এক অতি উচ্চ অবস্থার মধ্যেও কত বৈচিত্র্য বিদ্যমান—এক দিকে যেমন তাহার নিদর্শন আবার অন্যদিকে কবির কল্পকলার কি চরমোৎকর্ষ তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

সাধন না জানিয়া, সিদ্ধ না হইয়া কেবল তর্ক দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণের কথাকে রামপ্রসাদ 'দেঁতোর হাসি' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, ভেদ-অভেদ, জড়-চৈতন্য, প্রভৃতি তত্ত্ব নিরূপণ কল্পকলার উদ্দেশ্য নয়। তবে কল্পকলা যদি জীবনের অভিব্যক্তি হয়, তবে তত্ত্ব রূপে রসে কল্পকলায় ফুটিয়া উঠে। রামপ্রসাদের গানেও তাহাই হইয়াছে। এ গান সমগ্র জীবনের

গান। ইহা জীবনের কোন অংশের গান নয়। ইহার কোন অংশকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে অংশকে বুঝা যাইবে না।

প্রসাদ গাহিয়াছেন—

১। এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ
ডেলা দিয়ে ভাঙে ডেলা॥

২। অজ্ঞানেতে অন্ধ জীবভেদ ভাবে শিবাশিব
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥

অনেক সাহিত্যিক প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, রামপ্রসাদ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। এবং তাঁহার সমস্ত সাধক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত গানগুলির মধ্য হইতে দুই একটি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া প্রমাণ করিতে চান রামপ্রসাদ রামমোহনের মতই মূর্ত্তি-দ্বেষী। রামপ্রসাদের সাধন ও কাব্যকে ইহার চেয়ে ভুল বুঝা আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই একটি ছত্রে দেখুন "মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া" শিব, শিবা অভেদ এক মায়াতীত অথচ তিনি নিজে মায়া। মায়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। মায়া মিথ্যাও নয়। এখন কায়া ?

সাধকের উপাসনা হেতু তাহার কায়া বিদ্যমান, কায়া সত্য। মায়াতীত হইতে মায়া ও কায়া সর্ব্বত্রই তিনি। এবং এই কায়া উপাসনা হেতু। ইহা কি মূর্ত্তি-বিদ্বেষের প্রমাণ ? তিনিই

১। সগুণা নির্গুণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা হীনমূলা
মূলাধার অমলকমলবাসিনী।
আগম নিগমাতীত তিনি মাতা তিনি পিতা
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।

২। উপাসনা ভেদাভেদ ইথে কোন নাহি খেদ
মহাকালী কাল পদভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই তার আর নিদ্রা নাই
থাকে জীব শিব কর তারে।

রামপ্রসাদের এই মাতৃভাবের সাধনায় মূর্ত্তি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া জীব

শেষে শিব হইয়া যায়। শিব ও শক্তি তত্ত্বকে অনেক দার্শনিক অদ্বৈতবাদের একটা রূপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবন কোন 'বাদ' নয়। কোন 'বাদের' মধ্যে জীবনকে বাঁধা যাইতে পারে না। আমি বলি শঙ্করকে তর্জ্জমা করিয়াও বাঙ্গালী শিবশক্তির উপাসনা গ্রহণ করে নাই, মাধ্বকে তর্জ্জমা করিয়াও বাঙ্গালী রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করে নাই। শঙ্কর ও মাধ্ব চিরকালই শঙ্কর ও মাধ্ব থাকুন। এবং বাঙ্গালীও চিরকাল বাঙ্গালীই থাকুক। আমি বলি বাঙ্গলার শিবশক্তি, কৃষ্ণরাধা, শঙ্কর ও মাধ্বের দর্শনের রূপক ব্যাখ্যা নয়। এই দুই বিচিত্র সাধনা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতেই জন্মিয়াছে। ইহা বাঙ্গলার বাহিরের কোন কিছুর নকল বা তর্জ্জমা নয়—হইতেই পারে না। যে শঙ্কর অদ্বৈতে জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত, বাঙ্গলার শক্তিতত্ত্ব তাহার নকল ত দূরের কথা তাহার স্পষ্ট প্রতিবাদ। রামপ্রসাদের সাধনতত্ত্বে ও কল্পকলায় জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই। ইহা যে হয় নাই তাহার সবচেয়ে বড় কারণ যে ইহা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। যে প্রাণের স্বরূপ হইতে বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্ব জন্মিয়াছে সেই প্রাণের স্বরূপ হইতেই শক্তি তত্ত্বও জন্মিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর লীলাতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব অভেদ।

রামপ্রসাদের—

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয়
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে
কর্ত্তা বলে সবাই বলে।

ইহা মায়াবাদ নয়। ইহা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সংসার-বৈরাগ্যও নয়। উহা শুধু উদ্‌ভ্রান্ত বাসনারাশিকে গুছাইয়া আনিয়া সাধনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা মাত্র।

তারপর এই যে গানটি—

ওরে নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে
যত শুন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে—
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
ওরে আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।

ইহা সাধনার প্রথমাবস্থার গান নয়। ইহা সেই সময়ের গান যখন মাকে বলা হইতেছে—

"ওরে মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।"

কোন বিশেষ আচারের যখন আবশ্যক হইতেছে না, এবং "যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে" অর্থাৎ কোন বিশেষ মন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায়ও জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত ত হইলই না, বরং ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে দেখা দিতে লাগিলেন। ইহা বৈষ্ণবের সেই সাধনা—"যাহা যাহা নেত্র যায়—তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" স্বগুণ ও কায়া বাদ দিয়া নির্গুণ ও মায়াবাদের যে সাধনা—তাহা রামপ্রসাদের কল্পকলায় বা সাধনে পাওয়া যায় না।

মন কর কি তত্ত্ব তারে
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।

ইহার ভক্তির গান, ভাব ও রসের সৃষ্টি—ইহাকে অভাবে ধর্ত্তে পারা যায় না। কেন না ইহা ত অভাবের গান নয়।

অদ্বৈতবাদীর যে মুক্তি রামপ্রসাদ তা জানিতেন। বেদান্তের তত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল ইহাও এক অতি বড় মিথ্যা কথা। যেমন আজও যাঁহারা জানিবার তাঁহারা জানেন তেমনি শতাব্দী পূর্ব্বে যাহাদের বেদান্ত জানিবার কথা তাঁহারা জানিতেন।

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে
এই বাদানুবাদ করে সকলে?
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে।

কিন্তু রামপ্রসাদ 'জল হয়ে সে মিশায় জলে' চাহেন নাই। সাধনের অতি উচ্চ অবস্থাতেও—

আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
তিনি জানেন যে
কাশীতে মরিলে শিব দেন 'তত্ত্বমসি'।

কিন্তু— ওরে, তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী।

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল নাত বাসি
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালী নামের ফাঁসি।

আর একটা গান—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

ইহাই শঙ্কর মুক্তির স্পষ্ট প্রতিবাদ। বাঙ্গলার বৈষ্ণব যে সে—

নরক বাঞ্ছয়ে তবে সাযুজ্য না লয়।

ইহাই বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদাত্মার নিদর্শন। রামপ্রসাদকে মূর্ত্তিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে উদ্ধার করেন—

১। ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
২। ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না?
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা?

কিন্তু ইহা কি কালাপাহাড়ী মূর্ত্তি-বিদ্বেষ? ইহা মাত্র সাধনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উঠিবার জন্য উদ্যম ও ব্যাকুলতা।

যখন "কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে" তখন এবং কেবল মাত্র তখনই ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তির কাজ নাই। যখন ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তির জ্ঞান হইল তখনি মাটির মূর্ত্তির কাজ নাই। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তি হইয়া উঠে নাই, বাহিরে মেঘ দেখিয়া যাহাদের অন্তরে কালো মেঘ উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে মানস শিখি নৃত্য করিয়া উঠে না, তাহাদের জন্য কি রামপ্রসাদের সাধনায় কালাপাহাড়ী বিদ্বেষ-মুদ্গরের ব্যবস্থা আছে?

ইহা কোন্ অবস্থার কথা? কোন্ অধিকারের কথা? বাহিরে মেঘ দেখিয়া সাধক গাহিয়া উঠিলেন—

কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে
নৃত্যতি মানস শিখি কৌতুক বিহরে

* * *

ইহজন্ম পরজন্ম বহু জন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে॥

একদিন বাঙ্গলার আকাশে মেঘ উদিত হইলে শ্রীরাধিকার নয়নের তারা স্থির হইয়া যাইত—'কেন মেঘ দেখে রাই অমন হলি ?'

আবার সেই বাহিরের মেঘ—মেঘবরণীরূপে অন্তর অম্বরেও উদয় হইত।

কিন্তু আজ বাঙ্গলার আকাশের মেঘ ছিনিয়া সে রূপের নিছনি আর কে কাব্যে ফুটাইবে ?' তেহি দিবসো গতা—।

রামপ্রসাদকে অনেকে যেমন মূর্ত্তিদ্বেষী তেমনি তীর্থ মাহাত্ম্যের অস্বীকারকারী বলিয়াও বলিয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ সাধনের প্রথমাবস্থায় রামপ্রসাদ তীর্থে গমনের জন্য বহু গানে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

১। আমি কবে কাশীবাসী হব
সেই আনন্দ কাননে গিয়া নিরানন্দ নিবারিব,
গঙ্গাজল বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব।

২। "অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী" প্রভৃতি গানগুলি তীর্থবিদ্বেষী নহে। তবে "কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী" প্রভৃতি গানগুলি সাধনের সেই অবস্থার পরিচয় দেয়—যখন সর্ব্ব ঘটে ব্রহ্মময়ী বিরাজ করেন দেখা যায়—যখন

মা—ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।

তখন তীর্থে যাইবার কি প্রয়োজন থাকে ?

তারপর কতকগুলি অভিমানাত্মক গানে রামপ্রসাদ তীর্থে যাওয়ার বিরুদ্ধে গাহিয়াছেন। গঙ্গাকে তিনি বিমাতা জানিতেন। কাজেই গঙ্গাতীরে তীর্থবাস কালীর তনয় হইয়া তিনি করিতে পারেন না।

কেন গঙ্গাবাসী হব ?
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব।
আমি এমন মায়ের ছেলে হইয়ে বিমাতাকে মা বলিব।

ইহা তীর্থের প্রতি বিদ্বেষ নয়। লৌকিক সংস্কারের প্রতিও কটাক্ষ নয়। ইহা কাব্যের, ইহা সাধনার রূপান্তর। ইহা সেই বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থার কথা, যখন সাধক গাহিয়াছেন—

"এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥

ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।”

প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের তুলনামূলক বিচার
(চতুর্থ পল্লব)

বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, “রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল,” এবং “যে বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয় সেই বৎসরের শেষ ভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।”

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরে রামমোহন যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। যদিও রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসর ও রামমোহনের জন্মের বৎসর সকলের মতে একই বৎসর বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। মত বিভিন্নতা আছে। কিন্তু আমার দুঃসাহস এই যে, আমি বলিয়াছিলাম, আবার আজো বলি যে, “রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন—রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন।” আমি যাহা বলিয়াছিলাম, আবার আজ তাহাই ভাল করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। বাঙ্গলা সাহিত্যের উক্ত ইতিহাসে রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমি মনে করি বাঙ্গলা সাহিত্যের আর একখানি ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন। যাহাতে লেখা থাকিবে রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন রামমোহন। রামমোহনের বহু রচনা হইতে এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রমাণ উদ্ধার করা কিছুই কঠিন কার্য্য নয়। রামমোহনের বৈষ্ণব বিদ্বেষের পরিচয় দেওয়া আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাঙ্গলার গীতি কবিতার ধারায় রামপ্রসাদের “শ্যামা সঙ্গীতের” পর রামমোহনের “ব্রহ্ম সঙ্গীতের” যৎসামান্য আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য। এই আলোচনা করিতে গিয়া আমি সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দুই

একটি মতের প্রতিবাদ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে আমার বলিবার কথা এই, বাঙ্গলা সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারায় রামমোহনের "ব্রহ্মসঙ্গীত" ও রামপ্রসাদের "শ্যামাসঙ্গীত" একই শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ একথা আমি স্বীকার করি না যে, রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল রামমোহনের কণ্ঠে সেই গানই উত্থিত হইয়াছিল। কল্পকলার রাজ্যে যদি জাতিভেদ কল্পনা করা যায়, তবে রামপ্রসাদের গান আর রামমোহনের গান এক জাতির অন্তর্ভুক্ত কখনই হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, রামপ্রসাদের গান বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গানের যে ঢং, যে ভাব, যে দ্যোতনা—তাহা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই। এবং বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপের সহিত যে কবির পরিচয় আছে, সে কবি কখনই এমন গান বাঁধিতে পারে না। ইহাতে যে সকল প্রভাবের আরোপ আছে, সে প্রভাব বাঙ্গলার প্রাণের সহিত মিশ খায় নাই। কাজেই রামমোহনের গান কোন গান হয় নাই। কল্পকলার কোন রূপান্তর তাঁহার গানের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এবং আমার বিশ্বাস বাঙ্গলার প্রাণের সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল না। কেন না, তাঁহার কল্পকলায়, তাঁহার গানে বাঙ্গলার প্রাণের কোন পরিচয় মিলে না।

বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে যে বিচিত্ররূপ ও সুরের দোল উঠিয়াছে—তাহা চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলার রূপান্তরে আপনারা দেখিয়াছেন। এমন কথা আমি বলি না যে, চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের যে বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপের প্রকাশ—তাহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। আমার বাঙ্গলার প্রাণের অনন্তরূপ—অফুরন্ত বৈচিত্র্য। সুতরাং রামমোহনের "ব্রহ্মসঙ্গীত" চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের ধারা-বৈচিত্র্যের পার্শ্বে বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপের আর এক বিচিত্র-রূপ বলিয়া যদি এ যুগে আত্মপরিচয় দিতে পারিত তবে তাহাতে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত তাহা পারে নাই। চণ্ডিদাসের সৃষ্টি আর রামপ্রসাদের সৃষ্টি বিচিত্র। কিন্তু বিচিত্র হইলে ত তাহারা মূলে বিচ্ছিন্ন নয়। রামমোহনের গানে যে স্বাতন্ত্র্য, যে পার্থক্য আমরা সহজেই লক্ষ্য করিয়া থাকি—সে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বিচ্ছেদের। রামমোহনের গানের মূল খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে, ইহা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই। সেইজন্য একদিকে যেমন প্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মসঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নাই, তেমনই অন্যদিকে ইহা বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপের কোনও

নূতন রূপ বা সুরের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া কলাকলার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে গান বলে, যাহাকে কাব্যের রূপান্তর বলে, ব্রহ্মসঙ্গীতে তাহার কিছুই নাই। কলাকলার দিক দিয়াই কাব্যের বা গানের বিচার। সে বিচারে রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের মূল্য কি আমরা তাহারই নিরূপণের চেষ্টা করিব।

প্রথমে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে প্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এক শ্রেণীতে "ব্রহ্মসঙ্গীতকে" পর্য্যবসিত করিবার কি হেতু ছিল।

আপনারা দেখিয়াছেন, প্রসাদী সঙ্গীত একটা সাধক জীবনের ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাস। সাধনার শেষ অবস্থায় রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন —ইহাই সাধনার রূপান্তর। এই অবস্থায় রামপ্রসাদ তীর্থ পর্য্যটন, বাহ্য পূজানুষ্ঠান, নৈবেদ্য ও ছাগ মহিষ বলিদান, কোন বিশেষ স্থানে বা কালে, কোন বিশেষ ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তির সম্মখে কোন বিশেষ আচার এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট দেবীকে পূজা করিবার কোন আবশ্যক বোধ করেন নাই। কেন না যে সিদ্ধির জন্য উহার প্রয়োজন সে সিদ্ধি এখন তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার গানে ও কলাকলায় যে অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে—তাহা তাঁহার তৎকালীন সিদ্ধ অবস্থারই অনুরূপ। কলাবিৎ ও সাধক তখন এক হইয়া মিশিয়া গিয়া নিজেকে যে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন—এই সৃষ্টি হইতেছে সেই পরিণতি। ইহা লৌকিক ধর্ম্ম সংস্কারের প্রতি কোন কটাক্ষও নহে—ইহা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী কোন মতবাদও নহে—ইহা কোনওরূপ সমাজ বা ধর্ম্ম সংস্কারও নহে। ইহা কলাবিদের স্বাভাবিক সৃষ্টি। যাহাকে আমি আইডিয়েলিজম (Idealism) বা (Realism) কিছুই বলি না। যাহাকে আমি নেচারেলিজম (Naturalism) বলিয়া কতকটা বলিয়া আসিতেছি।

রাজা রামমোহন একজন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁহার ব্রহ্ম সমাজের ট্রাষ্টডীডের একস্থানে আছে যে, পরমেশ্বরের কোন প্রচলিত নাম জপ বা রূপ ধ্যান লইয়া ব্রহ্ম উপাসনা বা সঙ্গীত চলিতে পারিবে না। এই উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে সুতরাং চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের সঙ্গীতের কোনই স্থান নাই। রামমোহনপন্থী উপাসকমণ্ডলী চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের গীতিধারা হইতে এইরূপে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ও শাক্তের সাধনধারা হইতেও তাঁহারা আত্মরক্ষা (?) করিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক যাহাকে নব্য সমাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই নব্য রামমোহনী সমাজের জন্ত, রামমোহন

যেমন প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধন ছাড়িয়া নামরূপবিহীন, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার ব্যবস্থা করিলেন তেমনই ঐ "নব্য" সমাজের জন্য তিনি এক শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করিলেন। এই ব্রহ্মসঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সংস্কার। কলাবিৎ বা কবির কাব্য সৃষ্টি নহে।

রামমোহন মূর্ত্তি-বিদ্বেষী ধর্ম্ম সংস্কারক। তিনি ব্রহ্মের কোন বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীতও ভগবানের নামরূপকে পরিত্যাগ করিল। নামরূপ লইয়া রামপ্রসাদ যে সাধনা ও কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—ইহা সে সাধনাও নহে, সে কাব্যসৃষ্টিও নহে। রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থায় যখন রামপ্রসাদ রটনা করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যে "মা বিরাজে সর্ব্বঘটে," যখন "যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে"—যখন আহার করিতে করিতে মনে হয় "আহুতি দেই শ্যামা মারে," যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—জীব মরিয়া শিব হইয়াছে,—যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত মুহূর্ত্তে আসিয়া এক সঙ্গে দেখা দিয়াছে—এবং জন্ম জন্মান্তরের যবনিকা অপসারিত হইয়া যাওয়ার পর রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

"ইহ জন্ম পর জন্ম বহুজন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে"

—যখন তিনি বলিতেছেন "ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি"। সেই অবস্থায় কাব্যের রূপান্তরে যখন এক সৃষ্টির পর আর এক সৃষ্টি আসিয়া দেখা দিল তখনকার অবস্থায় বাহ্যিক পূজানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্য্যটনাদির অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল সেই সমস্ত গানকে সাধক জীবন ও কলাবিদের জীবন হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া রামমোহনের মূর্ত্তি বিদ্বেষী কতকগুলি গানের সহিত তুলনা করিয়া যে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা তাহা তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিকে অবমাননা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুলনীয় বস্তু সম অবস্থার হওয়া চাই। রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থার গানের পশ্চাতে যে একটি নামজপ, রূপধ্যান ও জবা বিল্বদলে মূর্ত্তিপূজার দীর্ঘ সাধনা বিদ্যমান,—রামমোহনের সাধন ধারার প্রবেশ পথের প্রথমেই রামপ্রসাদীয় সাধন পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবেধ। এই উদ্দেশ্যমূলক ধর্ম্ম সংস্কার প্রসূত। কাজেই কল্পনার রূপান্তর ঘটিবার অবকাশ ইহাতে কম এবং বস্তুতঃ রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে কল্পকলার কোন রূপান্তর ঘটে নাই।

রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত কবির কাব্য সৃষ্টি নয়। কলাবিদের কল্পকলার সৃষ্টিও নয়। ইহা যুক্তি তর্ককে, বুদ্ধি বিচারকে ছন্দে গাঁথিয়া এমন এক প্রকার

সঙ্গীতের রচনা—যাহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্কার। বলা বাহুল্য ইহা রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সাধনার তীব্র প্রতিবাদ, রামপ্রসাদের ধর্ম্মসাধনার প্রতি বিদ্বেষ ও তাহার ভ্রম প্রদর্শন।

ধর্ম্ম সংস্কার একটি মহৎ কার্য্য। আমরা রামমোহন প্রদর্শিত রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সংস্কারের বিচার এ প্রবন্ধে করিব না। আমরা এই দুইজন সঙ্গীত রচয়িতার কাব্য সৃষ্টি লইয়া তুলনা করিব।

আমরা দেখিতেছি রামপ্রসাদের সঙ্গীত কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতি। আর রামমোহনের সঙ্গীত ছন্দে বদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার, রামপ্রসাদের সাধনার প্রতিবাদ—কিন্তু কোন কাব্য সৃষ্টি নয়। অথচ এই দুই বস্তু কি করিয়া এক হইতে পারে, এবং ততোধিক বিস্ময়ের কথা যে এক শ্রেণীর এক অবস্থার এক স্তরের কল্পকলায় যাহা পরিগণিত হইতে পারে না—তাহা কি করিয়া সমশ্রেণীর বলিয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে অবিচারে স্থান পাইতেছে?

যে সাধনা, যে রূপ ও সুর রামপ্রসাদের কণ্ঠে অবসান হইতে না হইতে—রামমোহনের কণ্ঠে সেই সাধনার সেই সুর ও রূপের প্রতিবাদধ্বনিরূপে উত্থিত হইল—তাহা কল্পকলার রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির বিচারেও দুইটি পরস্পরবিরোধী সুর বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। বাহিরের তথাকথিত সাদৃশ্য দেখিয়া কি বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন?

রামপ্রসাদ সাধনের এক অবস্থায় গাহিয়াছেন—

মন, তোমার এ ভ্রম গেল না
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তা জান না?

তারপর "ধাতু-পাষাণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে?"

এই সমস্ত সঙ্গীতগুলির সহিত রামমোহনের কতকগুলি সঙ্গীতের যে তুলনা করা হইয়াছে—তাহা এক বস্তু নয়। রামমোহন, সাধক রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থার গানগুলির ভাব লইয়া—রামপ্রসাদের সাধন নাম জপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যে সঙ্গীত রচনার প্রয়াস করিয়াছেন—তাহাতে কোন রূপ ফুটে নাই—কোন সুরের দোল উঠে নাই। তাহা সৃষ্টি হয় নাই। রামপ্রসাদের সমশ্রেণীর সৃষ্টি ত দূরের কথা। যেমন রামমোহন গাহিলেন—

মন একি ভ্রান্তি তোমার
আহ্বান বিসর্জ্জন বল কর কার,
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে ইহা গচ্ছ বল তাকে
তুমি কেবা আন কা'কে একি চমৎকার।

এই গানটি রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়া রচিত। অথচ কলাসৃষ্টির দিক হইতে রামপ্রসাদের গানের সহিত ইহার বিচারও হইতে পারে না, আমরাও সে ব্যর্থ প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। তবে শুধু যে বাহ্যিক সাদৃশ্য কল্পনামাত্র করিয়া রামপ্রসাদ ও রামমোহনের কতকগুলি সঙ্গীত নিতান্ত ভ্রমবশতঃ এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে—সেই সাদৃশ্যও যে সাদৃশ্য নহে আমি বাহির হইতেই তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদের কল্পকলার ইঙ্গিত এইরূপ যে—আমার মায়ের মূর্ত্তি শুধু ঐ ধাতু পাষাণ বা মাটিতেই আবদ্ধ নহে—তিনি দেখিলেন এবং গাহিলেন "ওরে ত্রিভুবনা যে মায়ের মূর্ত্তি"—ইহা অনুভূতির পরেও সাক্ষাৎ দর্শন। রামপ্রসাদের এই সাক্ষাৎ দর্শনের পরিচয় আমরা পাই। রামমোহন গাহিলেন "যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে ইহা গচ্ছ বল তাকে।" ইহার ইঙ্গিত এইরূপ—যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে তাকে ইহা গচ্ছ বলিলে অযুক্তির কাজ হয়: যুক্তি বিচারে যাহা অসিদ্ধ তাহা করিবে কেন? যুক্ত ত বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্কার। কিন্তু ইহা ত কলাবিদের সৃষ্টি নয়।

রামমোহন রামপ্রসাদের ভাব লইলেন—কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি এই কথাটিতে তাঁহার কেমন আটকাইয়া গেল। তিনি মায়ের মূর্ত্তির বিরোধী। তা সে মূর্ত্তি ধাতু পাষাণেই হউক, আর সাধনের পরিণতিতে সাধকের চক্ষে ত্রিভুবন ব্যাপিয়াই হউক। রামপ্রসাদের এই মূর্ত্তি সাধনাও এমন কি তাঁহার এই ত্রিভুবনব্যাপী স্বাভাবিক পরিণতিরও বিরুদ্ধে রামমোহনের ধর্ম্ম সংস্কার। কেন না তাঁহার যুক্তি বলিয়াছে—

১। 'বিভু' নামরূপহীন নিস্ত্রৈগুণ্য—অথচ

২। তিনি সর্ব্বত্র থাকেন

৩। সুতরাং কোন বিশেষ স্থানে ইহা গচ্ছ বলিয়া ডাকা অযুক্তির কার্য্য। এবং এই বিভু যদি মায়ের মূর্ত্তি হইয়া ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া দেখা দেন তবে তাহাও যুক্তিতঃ অগ্রাহ্য।

সাধনার বৈপরীত্যে এই বিপরীত রীতির প্রচলনের চেষ্টা বাঙ্গালী রামমোহন করিয়াছিলেন। আমি এইরূপই বুঝিয়াছি—তাই বলিয়াছিলাম "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন—রামমোহন ঠিক তাহার উল্টা সুর ধরিলেন।"

রামপ্রসাদের কল্পকলার পরিণতিতে দেখা যাইতেছে—ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি—ইহা অনুভূতির বস্তু—ইহা সাক্ষাৎ দর্শন। রামমোহনে এই অনুভূতি ও দর্শন কেহ আশা করিবেন না। কেন না তিনি রামপ্রসাদের সাধন পথকে কুসংস্কার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং যে সাধন পথ তিনি পরিত্যাগ করিলেন, সে সাধনপথের কোন খবর—সিদ্ধি ত দূরের কথা—তাঁহার নিকট উন্মাদ ব্যতীত কে প্রত্যাশা করিবে? এই জন্য রামপ্রসাদের কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতির গানগুলির সহিত রামমোহনের রামপ্রসাদ-অনুকারী গানগুলির বাহ্য সাদৃশ্য কোন সাদৃশ্যই নহে।

"যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে"—ইহা জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া একটা স্পষ্ট উক্তি মাত্র। কিন্তু "ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি"—ইহা অনুভূতি—ইহা দর্শন—ইহা কাব্য—কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। কাজেই আমি আবার আপনাদিগকে বলিতেছি "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গিয়াছেন—রামমোহন তাহার উল্টা সুর ধরিলেন।"

এইবার আমরা দেখিব, রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে কি না।

যে ধারায় চণ্ডিদাসের কাব্য-সৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—যে ধারায় রামপ্রসাদের কাব্য-সৃষ্টি কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে—বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ হইতেই এই দুই বিচিত্র ধারা যে জন্মিয়াছে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত এই দুই ধারার কোন ধারাতেই স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডিদাসের ধারায় জ্ঞানদাস প্রভৃতি আছে, রামপ্রসাদের ধারায় কমলাকান্ত প্রভৃতি আছে। ইহারাই ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছে। রামমোহন এই দুই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়—এই দুই ধারা হইতে বিপরীতগামী। রামপ্রসাদের ধারায় তাহাকে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। তথাপি ব্রহ্ম সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র ধারাও রামমোহন সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা প্রথমতঃ কোন কাব্য সৃষ্টিই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার প্রবহমান ধারাগুলির সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই।

রামমোহনের "ব্রহ্ম সঙ্গীত" যে কোন কলাবিদের কল্পকলার সৃষ্টি নয় তাহা এই ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলিকে কল্পকলার সমালোচনার দিক হইতে বিচার করিলে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন কবি না হইয়াও কাব্য সৃষ্টিতে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন। তাহার একমাত্র উত্তর ধর্ম্ম সংস্কার।

তিনি দেখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণব সাধনার অনুরূপ কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে, গান হইয়াছে। শাক্ত সাধনার অনুরূপ কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, গান হইয়াছে। এই দুই সাধনাই নাম জপ ও রূপ ধ্যানের সাধনা। নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই এই সাধনা মনুষ্যকে, বাঙ্গালীকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যুগে যুগে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের নিগুণ নিরাকারের সাধনায় নাম রূপ গোড়াতেই পরিত্যাগ করিতে হয়। রামমোহনের ব্রাহ্ম সাধনা বাঙ্গলার শাক্ত-বৈষ্ণবের সাধনার স্পষ্ট বিরুদ্ধ ও বিপরীত মার্গের সাধনা। অথচ যখন প্রত্যেক সাধনার অনুরূপ গান আছে কাজেই রামমোহন তাঁহার নিগুর্ণ সাধনার অনুরূপ গান রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন।

১। সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়
রূপের প্রসঙ্গ তাঁর কিরূপে সম্ভবে
২। নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা
নাহি হয় সম্ভাবনা
অচিন্ত্য উপাধি-হীনে অতিক্রান্ত গুণ তিনে
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

বাঙ্গালীর সাধনায়, চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলায় যত সব রূপ ও রসের বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে তাহা রামমোহনের যুক্তিতঃ ও গানতঃ মিথ্যা। এবং চণ্ডিদাস ও রামপ্রসাদ প্রভৃতিরা "অর্ব্বাচীন"। না হইলে এরূপ সব মিথ্যা কল্পনা তাঁহারা করিবেন কেন ? তার পর—

"নিরঞ্জনের নিরূপণ কিসে হবে বল মন
সে অতীত ত্রৈগুণ্য।"

ইহা মনের সহিত যুক্ত বিচার। কিন্তু মনে যে রসের উপজয় হইলে রূপ সৃষ্টি হইয়া স্বয় দেখা দেয়, এখানে সে মন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, যুক্তিও একটা রস, হইবে বা। কিন্তু এই যুক্তি রসের কাব্য সৃষ্টি কল্পকলার ধারায় বস্তুতঃই এক অনাসৃষ্টি সন্দেহ নাই। রামমোহনের নিগুর্ণ ব্রহ্ম সাধনা যেরূপ বাঙ্গলার সাধনার বিরোধী এবং এরূপ হইবার একমাত্র কারণ যে, রামমোহন বাঙ্গলার প্রাণের সহিত পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার সাধনা বাঙ্গলার প্রাণের সাধনার বিপরীত। তাই তাঁহার গান—যদিও গান হয় নাই—বাঙ্গলার প্রাণের গানের ধারার বিপরীত।

যাঁহারা "আর্ট ফর আর্টস সেক" বলিয়া রব তুলিয়াছেন—যাঁহারা আর্টকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতে গেলে আর্টই হয় না বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন—তাঁহারা যদি প্রণিধান করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন—রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ব্রহ্ম-সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছিয়া দিবার পথের কোন খবরই দিবে না। ইহাতে ব্রহ্ম-বিরহ নাই, ব্রহ্মানুভূতিও নাই, আছে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সংস্কার।

রামমোহন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদী, বাঙ্গালীকেও তিনি সেই দিকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার, গান তাঁহার একটা উপায় স্বরূপ। কাজেই গান বাঁধিলেন—

"সে অতীত ত্রৈগুণ্য"

তাই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া কত কত জ্ঞানী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই মায়াবাদ সিদ্ধান্তে নাম-রূপ মাত্রই ভ্রম। রামমোহন নির্গুণ ব্রহ্মের গানের সঙ্গে কাজেই মায়াবাদের গানও বাঁধিলেন।

নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন
প্রপঞ্চ জগৎ তেমন ভ্রমে সত্য দরশন
অতএব দেখ ভেবে যিনি সত্য ভজ তারে
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন।

ইহা মায়াবাদ—শঙ্কর-তর্জ্জমা—এবং ইহাই 'নব্য সমাজের' গান। রামমোহন মূর্ত্তি-বিরোধী। কাজেই তাঁহাকে নাম রূপের বিরোধী হইতে হইয়াছে—নির্গুণ ব্রহ্মের গান বাঁধিতে হইয়াছে—মায়াবাদের গান বাঁধিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়। মায়াবাদ আর নির্গুণ ব্রহ্ম আসিলেই—সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। কাজেই রামমোহন বৈরাগ্যের গান বাঁধিলেন—বিষয়ে বিতৃষ্ণার গান বাঁধিলেন।

সকলি অনিত্য হয় দারাসুত ধনজন
ভুল না মায়ায় আর ত্যজ আশা অহঙ্কার
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জন্ম হরণ।

আর একটা গান আছে, "পুনশ্চ না হবে কায়া।" রামমোহন এখানে জন্মান্তরবাদী-পুনর্জন্মের ভয় দেখাইয়া শঙ্কর-বেদান্তের গান বাঁধিয়াছেন।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে

কোন্ রস হইতে এই গান জন্মিয়াছে—আর ইহা কি গান হইয়াছে?

তারপর তীর্থযাত্রা ও পৌত্তলিকতা—কাজেই কুসংস্কার। এই কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত রামমোহন বাঁধিলেন—

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা
এই সে বেদের ব্যাখ্যা
অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ?

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গান রচনা—বোধহয় গানের ইতিহাসে এই প্রথম। যদিও ইহা একটা সংস্কৃত শ্লোকের তর্জ্জমা। এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই আরও বহু গানে দেখা যায়। যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই—রামমোহন একসঙ্গে এই দুই অস্ত্রই ধর্ম্ম সংস্কারে পরিচালনা করিলেন। আমি বলিয়াছি—তাঁহার গান, গান নহে—ধর্ম্ম সংস্কার। কাজেই এখানেও যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই। প্রাণের যে অনুভূতি জন্মিলে বাহিরের শাস্ত্র বিচার গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়—সে অনুভূতি চণ্ডিদাসে রামপ্রসাদে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের কল্পকলায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষতার যথেষ্ট পরিচয়ও আছে। কিন্তু রামমোহনের সে সাধনার সিদ্ধ অবস্থার অনুভূতি ছিল না। তাঁহার কল্পকলাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাজেই রামপ্রসাদ যার বলে শাস্ত্র-নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন—রামমোহনের সে ভরসা না থাকায় তাঁহাকে তীর্থগমনের বিরুদ্ধে গান লিখিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের দোহাই দিতে হইয়াছে। আমি রামমোহনের গানে সাধনার কোন ইঙ্গিত পাই না, যুক্তির অবতারণা মাত্র দেখিতে পাই। হয়ত আমার দুর্ভাগ্য। কাজেই আমি যাহা বুঝিয়াছি স্পষ্ট তাহাই বলিব।

তারপর রামমোহনের গানে দ্বৈতবাদের প্রতিবাদ আছে—এমন কি প্রত্যক্ষ-বাদেরও অবতারণা আছে।

এখনও এই নিগুণবাদ, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, জন্মান্তরবাদ, বৈরাগ্যবাদ, প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতির যে আবাদ রামমোহনের গানে দেখা যায়, তাহা কল্পকলার রূপান্তর,—না ধর্ম্ম সংস্কার—সুধীজন বিচার করিবেন।

সুতরাং রামমোহনের গান প্রথমে কোন গানই হয় নাই। ইহা কোন কাব্য নয়—কলাসৃষ্টিও নয়। দ্বিতীয়, বাঙলার প্রাণের স্বরূপ হইতে ইহার জন্ম হয় নাই। বাঙলার রসবৈচিত্র্যের রূপ-বৈচিত্র্যে ইহার স্থান নাই। আমি এই দুই দিক হইতেই সংক্ষেপে যতদূর সাধ্য রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের আলোচনা করিলাম। এবং রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরের শেষে জন্মিয়া—বাঙলার নাম রূপকে ধর্ম্মসাধনা হইতে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্কর-বেদান্তের বাঙলা সংস্করণের যতই প্রয়োজন তিনি বোধ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতকে কোন গানের পর্য্যায়ে

ফেলা যাইতে পারে না। এবং বাঙ্গলার প্রাণের সহিত টানিয়া তুলিয়া ইহার কোন যোগ স্থাপন করা যায় না।

কাজেই আমি বলিয়াছিলাম এবং আবার বলিতেছি যে, রামমোহন বাঙ্গলা দেশের ধর্ম্ম সাধনাকে বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার ব্রহ্ম সঙ্গীত বাঙ্গালীর গান হইতে পারে নাই—বাঙ্গলার প্রাণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না বলিয়াই—বাঙ্গলার গীতি কবিতার ধারার নবযুগে—এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ-রেখা—ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ফুটিয়া উঠিতেছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন রামমোহনকে বিচার করিবার অধিকার ও যোগ্যতা আমার নাই। কেন নাই—তা তাঁহারাও বলেন নাই, আমিও বুঝি না। আমাকে ফেরঙ্গ বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। যে সংস্কারে মন্দির ছাড়িয়া—হিমালয় বিন্ধ্য ছাড়িয়া—ইফেল টাওয়ারের কথা মনে আসে—সে সংস্কার বাঙ্গালীর নহে ফেরঙ্গের। সেই ফেরঙ্গ যতই স্পর্দ্ধা করুক—আমি জানি—আমাকে বিচার করিবার, দণ্ড দিবার অধিকার—এই বাঙ্গলা দেশে কেবল এক বাঙ্গালীর আছে—আর কাহারও নাই।

———

কাব্যের কথা

স্তব

নমস্তে নারায়ণ!

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখেদুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়কনায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এই সব লইয়াই ত সংসার, এই সব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনই তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্য্যরস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে; সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়। সকল দাস্তের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে প্রভুরূপে, না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্তকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়। সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতিস্মর। তুমিই বিশ্বমানব;—

অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি, অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই ত তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্ত রূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনি তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও তখনি সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে। কার সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কে তাহা সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর! তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়কনায়িকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভাগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে, আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylark-এর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

Type of the wise who soar but never roam.
True to the Kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দুয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায় তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্য জীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্ম্মে নিযুক্ত হই, সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম্ম করিতে হয় না সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকম গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটা দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্তদিন কর্ম্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্ম্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে

সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবন-যাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায়, কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জ্যাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এইসব কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতন্ত্রতা নাই,—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন জীবনের বাহিরে একটা অন্তঃ-প্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায়, তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্ণসের Ploughman-এর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাস বাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যথা নামক একটি কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে সুখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে জ্বলি,
ধানের চারা উপ্‌ড়ে ফেলি আগাছা কাটা বলি'।

* * * *

শান্তিপুরে, 'তোমার ডুরে', এবুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বক্ষ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের

রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃ-প্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্য-জীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত। দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি অপূর্ব্ব, অনন্ত। বুঝিলাম, যাহা আত্মা, তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ। এ জীবন লইয়াই কবিতা। যে শুধু ছোবড়া খায় সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত-লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্ম্মাণ করা যায় না, সেইরূপ কল্পিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কল্পিত-লোকের কোন সত্তা নাই। এ মিলন-মন্দির সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি"—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই মহামিলন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

"কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি।"

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না। আর কি শুনিতে পাইব না? রাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা মনে করুন।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলন মন্দিরের গীতিধ্বনি। যাঁহারা শুধু বাহিরের দিকটা দেখেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "পূর্ব্বরাগে আবার মিলন আসিল কোথা হইতে?" আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্ব্বরাগের গীতই হউক, কি মলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

চণ্ডিদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি শুনেছি তাহা,
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা।
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে।
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম।

আর একটি এই—

ভালবেসে সখি! নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার
চরণ-মঞ্জিরে।

বলা বাহুল্য, চণ্ডিদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে, তাহার কি হইল। সে যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে,—

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন॥

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পীরিতি মুরতি
কেবা করে পরতীত।
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল।
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া।
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডিদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডিদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন। সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহু দূরে তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আছয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইঙ্গিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে।" আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, "তোমার এ রকম ত হবেই। তুমি যে—

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস।"

তারপর মিলনের ও সম্ভোগের কথা। মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিনু কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা।

এত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তঃদৃষ্টিপরিপূর্ণ। শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা ঐ কোন্ শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে? চণ্ডিদাস জানে; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে। তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল—

কভু না জানিনু কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা।

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে। এ গান তাহারি প্রথম সূত্র। এই বিরহ তারপর সম্ভোগে আরও সুন্দরভাবে, গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
দুহুঁ পরাণে-পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কেমন করিয়া নয়ন তিরোপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য। কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয়। আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই। তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহামিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সম্ভোগেও এক মহাবিরহের ছায়া পড়ে, তাই সম্ভোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

এই কবিতাগুলি Realistic-ও নয় Idealistic-ও নয়; আমি যে মহামিলন-মন্দিরের কথা বলিয়াছি, তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়। তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব। ইহাই বাঙ্গালী কবিতার প্রাণ। বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাইনা কেন? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গলা

কবিতার যে প্রাণ, তাহাই হারাইয়া ফেলিব ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের একথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমই থাকিবে ? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে ? কিন্তু আমি ত কোন গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইব্‌সেন হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটারলিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে। আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলন মন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই। নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

বাঙ্গলা কবিতার সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে।

এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটা ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন

ভাবই সহজে, সরলভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে।* চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম
নয়ন ত মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হতেছিল সম্মিলন ;
নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময়!

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল। আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সই উভয় সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব।
এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি।
এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান। সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্তি!

বহুদিন পরে মোরে মনে ক'রে
এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার।

আমি জান্‌লাম জান্‌লাম—
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে,
মৃতদেহে করলে জীবন সঞ্চার।
সখি! আমি ছিলাম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায়! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারালি আবার।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না। নিধুবাবুর "তোমারি তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে", কিম্বা বিহারীলালের—

"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!"

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মত বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগরাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট স্বরবোধ আছে, সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট স্বরবোধ নাই, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত, তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না! প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধাস্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধুলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে, তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারান ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্যসেবার চেষ্টা

করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য; কিন্তু আমি ত সাধক নহি, সাহিত্যমন্দির প্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলন-মন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

রূপান্তরের কথা

রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু। কল্পনায় যাহার উন্মেষ, সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা। জীবনে তাহার চরম অনুভূতিই জীবনের ধর্ম্ম। কল্পকলা সেই রসের অনুভূতিকে রূপের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুরে, মহাভাবের আবেশে কি অভাবে, মানুষের জীবন-কুঞ্জে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। এই জীবনের রূপ ও রঙের খেলার মাঝে প্রাণ-নিকুঞ্জে যে দিন বাঁশী বাজিয়া উঠে, সে দিন সে মুহূর্ত্তেই *সুন্দর* মধুর রূপে বিশ্ব ভরিয়া যায়, আর অনেক দিনের অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে। জীবনের এই যে অনেক দিনের জড়তা, তাহা নির্ব্বিষ খোলসের মত পড়িয়া থাকে; বিশ্ব-প্রকৃতি মধুররূপে হাসিয়া চায়। এক আত্মা মহা-ইন্দ্র-সম সহস্র কটাক্ষে দেখে, জগতে সুন্দর-কল্যাণ, মধুর-মঙ্গল গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-কাল-মাস-বর্ষ, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা; নদ-নদী, শ্যামায়মান প্রান্তর, অভ্রভেদী হিমালয়, তরঙ্গ-চঞ্চল বিশাল সাগর সেই একই রূপের রূপবৈচিত্র্যে আপনার আত্মবিকাশ করিতেছে।

বাঙ্গলার গীতিকবিতায় আমি সেই আত্মবিকাশের কথাই বলিয়াছিলাম। সেই রূপান্তরের কথা, সেই রূপ হইতে রূপে বিলাস-বিবর্ত্তের কাহিনী, সেই মহাভাবের সাধনা, সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথাই কহিয়াছিলাম।

যে আলো লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে আলোক যে আমার প্রাণে জাগিয়াছে। মরমের 'মণিকোটায়' নিজের যে লুকান আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে ত চাপিয়া রাখা যায় না। আত্মা যে আপনার বিকাশ আপনি আপনিই করে। তাই সেই প্রদীপ হাতে করিয়া ঘরে ঘরে প্রাণের দুয়ারে দুয়ারে সেই নিভান দীপগুলি জ্বালাইয়া দিতে চাই। আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে আমি শুনাইতে চাই। যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গলার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গলা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আমিই দেখিব, আমাদের ঘরে ঘরে সেই প্রদীপ জ্বলিতেছে; আমরাই শুনিব, সেই বাঁশরী কত বিচিত্র রাগিণীতে বাজিতেছে। তোমার প্রাণের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চল, দেখিবে, তোমারই আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, দেখিবে, তোমারই আলোকে চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত হইতেছে। চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা।

আমি শুনিয়াছি, আমার কথাগুলি নাকি অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। আজ আমি সেই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙ্গলা কেমন করিয়া সুখে দুঃখে সোহাগ-আবেগে নিত্য নূতন হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে, রসের সঙ্গে রসের মিলন ও বিরোধে কেমন করিয়া মরা বাঙ্গালী গান গাইয়াছে, তান তুলিয়াছে, সেই গানের কতটা খাঁটী, কতটা মেকি, তাহারই কথা বলিয়াছিলাম। চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার গীতিকবিতার ধারা কেমন করিয়া বহিয়াছিল, মহাপ্রভুর জীবনের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব বেগ ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কেমন করিয়া আবার সেই ধারা, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি আকার ধারণ করিয়াছিল, আবার সেই ধারাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে কেমন করিয়া মধুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত বহিয়া গিয়াছিল—সেই গীতিকবিতার ছবি আঁকিতে-আঁকিতে

ও সেই ধারাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য 'রূপান্তরের' কথা বলিয়াছিলাম। আজ আমি সেই রূপান্তরের প্রাণধর্ম্মের কথা শুনাইতে চাই।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের তর্কবিতর্কের ঘোর মোহজাল রচনা করিলে নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে হয়। যাহা চাই, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লওয়া সহজ,—শুধু তর্কে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। আপনার প্রাণের মধ্যে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের সঙ্গে স্নেহ চাই, শ্রদ্ধা চাই, ভক্তি চাই, প্রেম চাই। তাহা না হইলে, যাহাই বলি না কেন, যত তর্কই করি না কেন, যাহা চাই, তাহা কিছুতেই মিলে না। এই তর্ক-যুক্তি কথা-কাটাকাটিতে যাহা পাওয়া যায়—ইহ বাহ্য। তাই মীরাবাঈ গাইয়াছেন—

"বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা"

আমি দার্শনিক নহি, বিজ্ঞানবিদ্ নহি,—আমি প্রাণধর্ম্মের ধর্ম্মী। আমি সেই প্রাণ-চিন্তামণির আলো লইয়া ঘুরিতেছি—সেই কাব্যলোকের কথাই বলিতে চাই। রূপান্তরের কথা সেই কাব্যলোকের কথা। সে কাব্য-লোক প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে। সে লোক যে মধুর উজ্জ্বল। জীবনের ধারায় প্রাণকে খুঁজিতে খুঁজিতে, যে দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই রূপান্তর হয়। আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয়-লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা, ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।

কথাটি আরও বুঝাইয়া বলিতে হয়। একটি ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, মনের সাধারণ অবস্থায় শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে একটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রূপ কি ফুলের প্রকৃত রূপ, ফুল কি শুধু একদিনে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে? তাহার মধ্যে কি জন্মজন্মান্তরের কাহিনী লুক্কায়িত নাই? কত কাল ধরিয়া সে যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল—কতবার ঝরিয়া ঝরিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল! কে তাহা গণনা করিবে। তাহার রঙের প্রতিরেখায় যে অনন্তকালের ছাপ, তাহার প্রত্যেক পাপড়ীর মধ্যে যে অনন্তকালের সুখ-দুঃখ জড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁটার মধ্যে যে অনন্তকালের বিরহ-বেদনা জাগিয়া আছে। ফুল ত শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের মহাপ্রাণ, তাহারি প্রাণ-কণিকা, সে যে অনন্ত লীলাময়ের লীলা-সহচর। তাহার মধ্যেও যে বিশ্বরূপ জাগিয়া আছে। সকল বিশ্ব যে প্রাণময়, সকল রূপ যে চিন্ময়। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একমেবাদ্বিতীয়ম্! সকল জীব-জন্তু, তরু, লতা, সকল পদার্থ—যাহাকে তুমি

অচেতন ভাবিয়া হেয় জ্ঞান কর, সবই যে সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত, সবই যে একই চিন্ময়, অনন্তরূপে উদ্ভাসিত। ফুলও অনন্ত। তুমিও অনন্ত! তুমি যে তোমার মনগড়া সাধারণ জ্ঞান কি বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে পরিয়া ফুলের এই অনন্ত রূপ না দেখিতে পাও, তাহাতে কি ফুলের স্বভাব, কি ধর্ম্ম বদলাইয়া যাইবে ?

শুধু চক্ষে যাহা দেখি, তাহা ফুলের সাধারণ রূপ। আবার সেই ফুল, যখন আমি তাহাতে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া প্রাণ দিয়া দেখি, যখন সেই ফুলটি আমার ধ্যানধারণার বিষয় হইয়া উঠে, আমার রস-সাধনার মূর্ত্তি হইয়া জাগে, তখনই ত আমার প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণ যে অতল অনন্ত, আর আমার ফুল যে আপন গৌরবে তাহার বিশ্বরূপে, চিন্ময়রূপে, অনন্ত হইয়া আমারি প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া আছে। তাহার সঙ্গে রসের লীলা চলিতেছে —তখনই রূপান্তর।

আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটে বা ঘটিতে পারে। একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু, সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে—

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ-মূরতি!
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

তার পরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে!

সেই—সেই তরঙ্গিত পরাণ-মূরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ তরঙ্গে সেই স্থির শতদল!

সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত!
সকল রকম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্তই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত। আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার
নহ মিথ্যা! সত্য তুমি! সত্যরূপাধার!
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির!
পদতলে কলকলে কাল ঊর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা!

তখনই মনে হয় যে, এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব শুদ্ধ, পবিত্রভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহার সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে যেন কোন্ মহাদেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ। কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। তখনই বাঞ্ছিতকে বলি,—

রাখ বুকে বুক কর গো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, কার পিছে পিছে
শুনি কার শঙ্খধ্বনি—

তারপর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণের দুইটি তীর ভাসাইয়া দেয়, এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে। তখনই গাহিয়া উঠি,—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে

কে দিল বুলায়ে রঙ্গে ?
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুল গাঁথা মালা !
এই যে হৃদয়-মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে !
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে ! তারি আলো জ্বালা ।

তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা—একজনের লীলা। সেই একজনের চরণ-নূপুরের রুণুরুণি প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই। সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য্য সবই যেন নিজে আস্বাদ করে। আমরা যেন তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার আনন্দ-মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে,—

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধূম লেগেছে
*　　*　　*
কে নেয় রে মধু মিটি
হেসে হেসে কুটি কুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি ?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধূম লেগেছে
পরাণ-কমল-মাঝে কি জানি জেগেছে !

যখন দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে "কি জানি জেগেছে," পরেই দেখিলাম "কি জানি জেগেছে।" তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর, তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম,—

ওগো ফুল ! ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পুণ্য সে মিলন-ভূমি !

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন, আমি আবার গাহিলাম,—

কে বলে রে ধন্য ধন্য ?
কে দেয় রে করতালি ?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজঃ
পরাণ-পঙ্কজ
শোভা করে ?

তখনই কি প্রেমিক তাহাকে দেখিতে পায় ? তখনও নহে। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে—

"ঠেকে গেছে প্রেমের দায়।"

এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে! যখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিক দেখিবে, তাহার চোখের কাছে প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দে পূর্ণ আনন্দরূপ ঘন-রসামৃত-স্বরূপ তাহারই প্রেমের প্রেমিক ভগবান্!

এই যে প্রেমের কতকগুলি অবস্থা নির্দ্দেশ করিলাম, ইহার প্রত্যেক অবস্থাই রূপান্তরের অবস্থা, শেষ অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই রূপান্তরের চরম। এই প্রত্যেক অবস্থাই সত্য, এই সমস্ত অবস্থা লইয়াই প্রেমের রাজ্য।

সেই প্রথম যখন রূপ আসিয়া চোখের সামনে দাঁড়াইল, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শেষে যখন সকল রূপের যিনি স্বরূপ, তিনি আসিয়া প্রাণের সম্মুখে প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইলেন—এই সব লইয়াই যে প্রেম, এই সব লইয়াই একটি অখণ্ড সত্য-রাজ্য। ভগবান্ যে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহার নিকট ডাকেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিয়ের ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে আঙুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্যরাজ্য,

ইহার কোন অংশই বর্জ্জন করা যায় না,—করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, কল্পকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিস, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই। আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কল্পকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কল্পকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনাই সার্থক হইতে পারে না। রস-সাধন না হইলে রসসৃষ্টিও বিড়ম্বনা। বিলাসের ধর্ম্মই এই যে, সে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে যে আপন বিলাসের বিষয় লইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ও আপনার আবেগে ইন্দ্রিয়রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয়রাজ্যে পৌঁছায় এবং সেইখানে তাহার রূপে রূপে রসে রসে বিলাসবিবর্ত্ত। মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে এই বিলাসবিবর্ত্তের কথাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের যে বিলাস, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের খোঁজ পায় না, সেই রূপে রূপে রসে রসে বিলাস-বিবর্ত্তের সন্ধান রাখে না, শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের মধ্যে বিলাসকে আবদ্ধ করিয়া সেই বিলাস লইয়া একটা মন-গড়া অসার কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাদের আমি তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না—শুধু বলিব, এই যে বিলাস, যাহার এক দিক্ দেখিতেছ, অপর দিক্ দেখিতে পাইতেছ না—ইহ বাহ্য।

আবার কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা, কল্পকলায় তাহার স্থান নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পকলার রাজ্যে প্রবেশ করিলে কল্পকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। নীতির কথা বল, তত্ত্বের কথা বল, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা আছে, সব কাটিয়া ছাঁটিয়া দাও, ইন্দ্রিয়ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখে আনিও না, মানুষকে দেবতা করিয়া তুল, কল্পকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিও না। জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলার উপরে

হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার ? মানুষ কি এই পর্দ্দাঘেরা নীতি-কথা বুকে বাঁধিয়া মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া মিছামিছি বিনা কারণে দেবতা হইয়া উঠিবে ? মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে ? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না ? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা সয়তানের খেলা ? আমরা কি ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না ? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না ? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মনগড়া শুদ্ধ পবিত্রলোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়াও যেমন, শূন্য-আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ। মিথ্যা কল্পরাজ্যে তাহা স্থান পাইতে পারে, সত্যরাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই ? কাহারও প্রাণে সেই বংশীধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে, কাহারও প্রাণে খুব ক্ষীণ অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হয় ; কিন্তু একেবারে শুনিতে পায় না, এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে ? যদি থাকে, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে, জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। সে যেদিন সেই নিয়মগুলি ভুলিতে পারিবে, সে দিনই প্রথম সত্যরাজ্যে পদক্ষেপ করিবে। সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য কোন কল্পকলার রসসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাহাকেও আমি কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। যে দিন লীলাময় আপনি বুঝাইবেন, সেদিন বুঝিবে। এখন শুধু মহাপ্রভুর ভাষায় এইটুকু বলিয়া রাখি,—ইহ বাহ্য।

কেহ কেহ বলেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণে যাহাতে তত্ত্বকথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণে যাহাতে তাহার প্রচার হয়, কল্পকলার বিষয়কে এমন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহাদেরও উত্তর—ইহ বাহ্য।

আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের সংঘাতে যখন ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, পরাধীন যখন তাহার শৃঙ্খলের ভারে নড়িতে পারে না, তখন কাব্যরস মানুষের প্রাণকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করে ; তাহাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে লইয়া যায়। এই স্বপ্নের জন্য, জীবনকে এই স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য কল্পকলার সৃষ্টি। তাহারও উত্তর—ইহ বাহ্য।

কেহ কেহ বলেন, যাহা শুধু হিতকর, যাহা কোন অশুভ, ক্ষতি, কোন

অমঙ্গল আনে না। তাহাই সুন্দর ও যথার্থ কল্পকলা। তাহাদেরও আমি বলিব—ইহ বাহ্য।

কল্পকলা যদি শুধু আমাদের আনন্দ ও আমাদের জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ধর্ম্ম থাকে না, তাহার আত্মবিকাশ হয় না, আমাদের কতকগুলা ভাবের খেয়ালের ছাঁচে পড়িয়া তাহার জীবনের আসল প্রাণটুকু মরিয়া যায়। তাহার কোন সার্থকতা হয় না। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাপাইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানব-প্রকৃতির গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যখন সে প্রকাশ করে, যখন আত্মার নিগূঢ় কথাটি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখনই কল্পকলার রূপসৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ জ্ঞানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে, মানবের সেই 'ভিতর গাঁয়ের' কথা, কাম-কামনার অতীত যে মাধুর্য্য, সেই আত্মায় রসভোগের যে ব্যঞ্জনা, বিশ্বশক্তির যে মূর্ত্ত স্ফুরণ, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ, কল্পকলা তাহারই চাবি,—সেই চাবি ঘুরাইয়া আত্মা নিজের রূপের আদর্শটিকে সেই অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির করিয়া আনে।

বিশ্বের যে দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখি,—দেখি, প্রতি পত্রে, প্রতি রঙে, প্রতি রূপে সেই আত্মার প্রতিরূপ। ঋতু আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে মানবের কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ, প্রকৃতির বিপ্লব-বহ্নিদাহে, মানুষের নিজকৃত স্বকপোলকল্পিত নানা শক্তির বিকাশে এক মহা সুশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলায় যেন এই বিশ্ব অহরহঃ আন্দোলিত হইতেছে। আঁখির সম্মুখে বাস্তব সত্য-জগৎ প্রতিভাত, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তরতমের যে রূপ, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। কল্পকলা সেই অন্তরের রূপটিকে বিশ্বের বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে, যাহা মায়া বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার সত্যরূপকে জাগাইয়া দেয়। যাহা এমনি আমাদের চোখে পড়ে, যাহার ভিতর সেই অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয় না, কল্পকলার সেই সত্যকে মনের কাছে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া ধরিয়া দেয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের কাছে সেই সত্যকে আনিয়া দেয়। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই কল্পকলার বিভূতি। কল্পকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন। যাঁহারা সত্যের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পরানুরক্তির আসক্তি জাগিয়াছে, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বভাবে সেই পরানুরক্তিতে ভিজিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের ভাব সেই রসের মধ্যে গাঢ়তা লাভ করিয়াছে, সেই প্রাণ-মন-দেহ দিয়া

অনুধ্যান। সেই অহৈতুকী সান্নিধ্যলাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ প্রেমরসে বিভোর হইয়াছে, তাঁহারাই কল্পকলার স্রষ্টা।

মনের যে আকাঙ্খা, সে সত্য বস্তুকে সুন্দর করিতে চায়। শুধু তাহার একটা ভাবের আভাষে প্রাণ ভরিয়া উঠে না, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। সেই রূপরসের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিকে ধরিতে চায়, তাহাতে দোষ হয় এই যে, বস্তু তাহার নিজের স্বাধীন ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। সে তখন আমার আকাঙ্খার, কামনার ভোগ্য দাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাধা পায়। তাই তখন আর সুন্দর থাকে না। বস্তুর যে নিজের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও গতি আছে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, আর সেই জন্যই তাহা সুন্দর। সে যে রস জাগাইয়া দেয়, তাহাই সুন্দর। তোমার আমার মনে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর রসাঙ্গসমূহ মিলিত হইয়া আমার প্রাণের কাছে এমন একটি রূপের দ্বারা রসের আভাষ জাগায়—যাহা সুন্দর—অতি সুন্দর।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত জড় নয়। জড়তা আমাদের মনের মধ্যে, তাই এই চিন্ময় ধামের রূপ মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি। অঙ্গ-সমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আর সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসেই তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পকলার সৃষ্টি। মানব অন্তঃকরণের ভিতর যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মনে যে গভীর জটিল রহস্যগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আপনি খেলা করে, তাহার প্রাণের ভিতরে যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত তৃষ্ণা, যত দ্বৈতের জঞ্জাল। দৈন্য-বিরোধ, যত মিলন-সোহাগের মাধুর্য্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার রাগ অনুরাগ, তাহার ভাব অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের সমগ্র জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহাপরিধির ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে,—এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধরিয়া সৃষ্টি করাই কল্পকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙ্গা-গড়ার লীলা লীলায়িত ভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।

কেহ কেহ বলেন, কল্পকলার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি অপেক্ষা হীন। কারণ, প্রকৃতিতে জীবন উদ্বুদ্ধ, মানবের সৃষ্টিতে তাহা মৃত, প্রকৃতিতে তাহা সজীব জীবন্ত। কল্পকলার উপাদান হয় কাঠ, নয় পাথর, নয় মাটি, নয় মোম, নয় কথা, নয় সুর। এই সব পদার্থও যে সত্য, মৃত নয়, ইহাদের মধ্যেও মহাপ্রাণ জাগিয়া আছে। কিন্তু শুধু এই সব উপাদান দিয়াই ত কল্পকলার সৃষ্টি হয় না। আত্মার অনুভূতি দিয়া সেই সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই অনুভূতিতে যে মহাজীবনের আভাস, তাই এই সব কাঠ-পাথর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের কাছে ধরিতে যাই, প্রকৃতির বুকে যে সব সৃষ্টি আমরা জীবন্ত বলিয়া দেখি, কল্পকলা তাহাই ধরিয়া নব নব রূপে জীবিত জলন্ত সত্তার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের স্বরূপটি ধরিয়া দেয়। সেই জন্য কল্পকলার সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহ বাহ্য। এ সকল কথা সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার কথা নয়। প্রকৃতি যে আদর্শে আপনার বুক হইতে রূপের সৃষ্টি করে, মানুষও সেই একই আদর্শে তাহার প্রাণ হইতে রূপ সৃষ্টি করে। এই উভয় সৃষ্টিই যে সেই লীলামৃত-রসাধার সেই আনন্দ-ঘন মহান্—রসরাজের লীলাভঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ হীন নয়, কিছুই হীন নয়।

কবীর গাহিয়াছেন—

"আপুহি সবমে রমা হৈ,
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহি,
আপুহি সিরজন হার॥
আগে বহুত বিচার ভৌ,
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া,
নহি তহি সংখ্যা আহি।"

আপনি সৃজন করিয়া আপনিই হরণ করিতেছেন। সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, সকল রূপের মধ্যেও তিনি। রূপ ও রঙের যে রঙ্গ, যে লীলা, এর ত সংখ্যাসীমা নাই। জীবনে যাহাদের রূপের পরিচয় ভাল করিয়া হইয়াছে, তাহারাই এই রূপ-রঙের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

অনন্ত রূপের মাঝে এ মন শুধু দু-একটা রূপকেই চিনিতে পারে, ধরিতে পারে, অসংখ্য সুরের হিন্দোল মাঝে একটি সুর হয় ত আমরা চিনিতে পারি, অসীম জ্যোতিরাশির মাঝে আমরা যেন পতঙ্গবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছি। কল্পকলার

রূপের ধ্যানে যখন সমাধি হয়, তখন সেই আসল রূপটি ফুটিয়া উঠে। এই সাধনায় সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না আমি নিগম তন্ত্র সারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

কল্পকলার স্রষ্টা সত্য সত্যই এই রূপের ভিতর দিয়া দর্শন করে, স্পর্শ করে। সে মহাভাবের গান তাহার কাণে অহরহ ধ্বনিত হয়। কলাবিদের প্রাণ সেই মহাপ্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি বাজিয়া উঠে। এই বিশ্ব তাহার কাছে এক বিরাট আয়নার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কলাবিদ্ সেই আর্সিতে নিজের রূপের প্রতিরূপ দেখিয়া নিজ মাধুরী আস্বাদন করেন। প্রতিরূপের ভিতরেই তাঁহার বিলাস-বিবর্ত্ত ফুটিয়া উঠে, তাঁহার আত্মার রূপ বিশ্বের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, বিশ্বের প্রাণের রূপ তাঁহার প্রাণে প্রতিভাত হয়। এই যে অন্তরে অন্তরে রূপের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহাই প্রাণের রূপান্তর।

আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে প্রাণে অনুভূতি, সেই "স্বাদিতে নিজ মাধুরী" প্রাণের সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার রূপান্তর হয় নাই। চণ্ডিদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতিকবিতার প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্ম্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতিকবিতার ধর্ম্ম। কথাটি অপ্রিয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতিকবিতায় সে জিনিসটি পাওয়া যায় না। এই যে শতবর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গীতিকবিতার বিরাট আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোন কর্ম্মই, কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই, কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

"পিতলকি কাটারি কামে নাই অওল
উপর কি ঝক্‌মকি সার"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজী সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা হয় ত বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁদে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ। অনুকরণে কখনও জীবন আসে না,

ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জ্জন করা যায় না। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের আভাস নহে, তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্য মূর্তিমন্ত জ্বলন্ত! সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্যই নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলন কেন্দ্র। আমাদের বিচারবুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু মিলন-মন্দিরে যখন বুদ্ধি সেই রূপের টানে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, আর প্রাণ তখনই সত্যকে অনুভব করিয়া একেবারে গ্রহণ করে। যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাটি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম! ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়। এই প্রেমের সোহাগ-বাঁধন যদি না থাকিত, তবে কি এই যে মহাভাবের অপার আনন্দ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অনন্ত অভাব, অসীম দুঃখ—এই দুইকে মিলাইতে পারিতাম? যত দুঃখ, যত অভাব, যত যাতনা, যত ঘৃণা, যত হিংসা, সেই প্রেমেরই অন্যরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সবের মধ্যেই যে সোহাগের বাঁধন! এই সবই যে অনন্ত প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। যখন সত্য হারাইয়া মেকি লইয়া প্রাণ কাঁদে, তখন সেই অনন্তের পানে মুখ তুলিয়া প্রাণ বাঁচে। জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্ত্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল-বারিধি-বুকে অবিরাম প্রাণস্রোতে টলমল করিতেছে। সেই লীলা-চঞ্চল মূরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্ত্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়,

তখন সেই মূর্ত্তির সহিত অহৈতুকা পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্ত্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। তখনই সত্য রূপান্তর। প্রেমের প্রথম জাগরণে রতির রাগানুরাগ জাগে, সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদনের কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়?—সেই প্রেমের ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির আভাষ প্রাণে—স্ফটিকে সূর্য্যকিরণ-প্রতিবিম্বের মত স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য্য, তাহার স্বরূপকে পাই। তখন বুঝিতে পারি! সে প্রাণের সত্য অনুভূতিতে, নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্যমূর্ত্তি তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপকে সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায়।তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয়! কলাবিদ্ ও কবির রূপান্তর—তাহার দৃষ্টি তাহার প্রকাশ!—সাধক তাহার সাধনায় সমাধিতে—তাই মিলাইয়া আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যায়! এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়লাভ—প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া!

আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডিদাসের গান ছাড়া বাঙ্গলা গীতিকবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডিদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, একথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডিদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল,—তাঁহার সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।

———

বিবিধ প্রবন্ধ

স্বদেশী আন্দোলনের কথা*

আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি-বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবনসঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতির অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবনসঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙ্গালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্বাধীনতাসঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙ্গালী জাতির আত্মনির্ভর-পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে।

জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

---

*১৬ই অক্টোবর দার্জ্জিলিং হিন্দুহলে পঠিত।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

তাহার যথাযথ কারণও ছিল। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানাকারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চির পুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, কেবল মাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্মবলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা ঠোকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল; আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী; বাঙ্গালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙ্গালী তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, বাঙ্গালীর বলবীর্য্য পর্য্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময়ে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিকবেশে আগমন করিয়া আমাদেরই জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপনপূর্ব্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজজাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় আমাদের চক্ষু ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময় ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহু দূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়; আমরাও ঠিক সেইরূপ

নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃক্‌পাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিমা, আমাদের নহে; ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল সত্য; কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইলে বোধ হয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতেছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতে-ছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation লইয়া আমরা এত গর্ব্ব করি, এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই, তার মধ্যে যে কোন অন্ধকার কোণে আমাদের সকল আশা ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য—"So far as it may be" এই বাক্যময় শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই। Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি সেদিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন;—তস্করের গুপ্ত ছুরিকা সেই অন্ধকার কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমরাও ভাল করিয়া Proclamationএর গূঢ় তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি! জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

আর আমরা ভুলিয়াছিলাম ইংরাজের Pax Britanica-য়—ইংরাজ রাজনীতি হইতে উৎপন্ন এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় মহাশান্তি। এই মহাশান্তির প্রসাদে আমরা গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দারূপী পঞ্চায়েত-বেষ্টিত, সহরে সহরে অতি ধীর শান্ত বহুশিষ্টাচারসম্পন্ন লালপাগড়িওয়ালার কোমল-করুণ রুলের স্পর্শে

সর্ব্বদাই শান্তি রসে নিমগ্ন, জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের দল আমাদের শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া চাবুকহস্তে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং ডিভিসনে ডিভিসনে কমিশনারবৃন্দ এই অদ্ভুত শান্তিপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর রাজধানীতে—কখনও বা শৈলশৃঙ্গে—ইহাদের সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা অতিশয় শ্রম-শ্রান্ত বহুভাবনা-ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর আমাদের ছোটলাট বাহাদুর দ্বিতীয় নেপোলিয়নের ন্যায় নৃত্যসভায় পর্য্যন্ত সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কি করিয়া যে এই বাঙ্গালী জাতির শিরায় শিরায় এই মহাশান্তির অহিফেন প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছেন! হায়রে বৃটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগ্য। আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক শান্তি আমাদের জীবনকে আরষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, ইহা যে মৃত্যুর শান্তি, ইহার উপরে কোন দিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না।

আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণচ্ছায়ারূপী এই মহামায়াকুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতলোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তর-বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুসিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না। আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। সেইজন্যই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, কারণ ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু আমাদের চিরকালের ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এক সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্কশাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই, তথাপি আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ নিষ্ফল তার্কিকের কোন অভাবই পরিলক্ষিত হয় না। উপহাস-রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে। তাহাদের শুষ্ক স্বদেশ-প্রেম-বর্জ্জিত

হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া আপনার সুখে অস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু সে তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্তই হতভাগ্য! আর যে ডাক শুনিয়াছে, কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোট খাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জ্জিত হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই হউক, বা ছোট কি বড় রকমের সরকারী জুজুই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক,—সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী—ঈশ্বরদ্রোহী। তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তার্কিকেরা ও উপহাস-রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোন কারণ নাই। আমরা মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি দুটা নিস্ফল তর্ক ও নিস্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘ বাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক, শত যুক্তি শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস-রসিককে উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিবে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; সুতরাং ইহার উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বদেশীয়তা স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্দ্বারা জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করিবে। ইঁহারা স্বদেশী আন্দোলন চা'ন, কিন্তু Boycott চা'ন না। ইহা শুধু বুঝিবার ভুলমাত্র, আর কিছুই নহে। আমি কখনই স্বীকার করিব না যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুই স্বদেশপ্রেমভাবাপন্ন। বৈষ্ণবকবিদের ভাষায় বলিতে গেলে Boycott পূর্ব্বরাগ, স্বদেশীয়তা মিলন। মাতার আহ্বান শুনিয়াছি বলিয়াই বিদেশী বিলাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কুলটা রমণীর ন্যায় বিলাতী বিলাস তাহার শত সহস্র ছলা-কলা বিস্তার করিয়া তাহার অধরের হাস্যে, তাহার নয়নের ভঙ্গিমায়, তাহার সুন্দর হস্তের কোমল পরশে আমাদিগকে একেবারে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যেই আমাদের সুখ-নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সেই বাহুবন্ধন হইতে আমাদিগকে একেবারে

মুক্ত না করিলে কেমন করিয়া আমাদের সেই চিরধৈর্য্যশীলা চিরকল্যাণময়ী মাতা—যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে কল্যাণপ্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাহার পবিত্র কল্যাণময় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিব? আর এই যে বিলাতীদ্রব্য বর্জ্জন করিতেছি, ইহাতে কি প্রতিদিন আমরা সংযমশিক্ষা করিতেছি না? সংযম ব্যতীত কখনও কি প্রেম স্থায়ী হয়? প্রতিদিনই কি বিলাতী জিনিস বর্জ্জন করিবার সময়ে স্বদেশের কথা স্মরণ হয় না? প্রতি প্রভাতেই কি আমাদের কোন জিনিস ক্রয় করিবার আবশ্যক হইলে স্বদেশের কথা ভাবি না। এই জিনিস ক্রয় করিব, কারণ ইহা স্বদেশজাত, ইহা আমরা কিনিব না, কারণ ইহা আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় নাই; প্রতিদিন আমরা এইরূপ ভাবিয়া থাকি এবং প্রতিদিনই আমাদের এই বর্জ্জনের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম সজীব হইয়া উঠিতেছে।

আবার অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিতে গেলে Boycott নিতান্ত আবশ্যকীয়। ইংরাজী অর্থশাস্ত্রে যাহাকে production বলে, তাহার জন্য demand আবশ্যক। আমরা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া সেই demandএর সৃষ্টি করিতেছি। একবার যদি Boycottএর দ্বারা আমরা স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি, আমাদের দেশের লুপ্ত ও নষ্ট বাণিজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।

আমাদের দেশে আর একদল আছেন—যাঁহারা Boycott চা'ন, কিন্তু স্বদেশীয়তা চা'ন না। তাঁহারা বলেন Boycott একটা রাজনৈতিক চাল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশীয়তা অর্থশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, আমরা কি জগতের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিব? ইত্যাদি। হে অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত! আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ আগে না তোমার অর্থশাস্ত্র আগে, মানুষ বড় না তোমার অর্থশাস্ত্র বড়? আগে, আমাদের মানুষ হইতে দাও। আমরা মানুষ হইলে জগতের সহিত আদান-প্রদান করিব। আগে আমাদিগের ক্ষুধার অন্ন, লজ্জানিবারণের বস্ত্র নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে দাও। এই যে প্রতিদিন Manchester-জাত ইংরাজের পদাঙ্কিত নামাবলী গাত্রে ধারণ করিয়া মানব-কলঙ্কস্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এই মহালজ্জা হইতে জাতীয় জীবনকে উদ্ধার কর। তারপর যখন ধীরে ধীরে এই আত্মনির্ভরের পথ অবলম্বন করিয়া জাতীয় চেষ্টায় জাতীয় শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বমানবের ক্রোড়ে আমাদের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, তখন জগতের সহিত আদান-প্রদান জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিবে—তাহাতে লজ্জার কারণ থাকিবে না।

আর বৃথা তর্ক করিবার সময় নাই। এই যে স্বদেশী আন্দোলন, ইহাকে

যেমন করিয়াই হউক জাগাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে! ইহারি উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাস-রসিক আছেন, যাঁহারা বলেন "তোমরা কি করিতে চাও"—তোমরা কি Company-র রাজত্ব উল্টাইয়া দিবে?" এ কথার উত্তর অতি সহজ। আমরা আর কিছু চাই না—আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজা-প্রজা সম্বন্ধ। ইংরাজের আইন আমাদিগের মানিয়া চলিতেই হইবে; কিন্তু ইংরাজকে আমাদের সমগ্র জাতীয়জীবন কখনই অধিকার করিতে দিব না। ইংরাজের আইনের গণ্ডির বাহিরে, ইংরাজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ, তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা সেইখানে আমাদের মাতার বিজয়-নিশান উত্তোলন করিব। আমরা সেইখানে বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচাইব। আমরা সেইখানেই আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে—কি রূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে—কি রূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।

বাঙ্গালীর বঙ্কিমচন্দ্র

আপনারা অনেকে হয় ত জানেন অথবা শুনিয়াছেন যে, আমি বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার পক্ষপাতী বলিয়া সাহিত্যে আমার একটা দুর্ণাম আছে। এজন্য অনেক সাহিত্যরথী আমার মধ্যে বিশ্বাত্মবোধের একান্ত অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং উষ্মার সহিত সে কথা তাঁহারা ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি সেজন্য লজ্জিত নই। এমন কি আজ বাঙ্গলার যুগ-সাহিত্যের একজন স্রষ্টা, নেতা ও ত্রাতার স্মৃতি-শেখরের দিকে উর্দ্ধে করজোড়ে তাকাইয়া বাঙ্গালীকে আবার আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে, ভাই বাঙ্গালী,—তুমি তোমার বাঙ্গলাকে ভুলিও না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি বাঙ্গলাকে ভুল, বাঙ্গলার অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া না দেখ—বাঙ্গলার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝ, বাঙ্গলার ন্যায়, দর্শন, বাঙ্গলার স্মৃতি, বাঙ্গলার তন্ত্র ও দীক্ষাপ্রণালী, বাঙ্গলার সমাজ-বিন্যাস, বাঙ্গলার সাহিত্য—এক কথায় বাঙ্গলার সভ্যতাকে প্রাণপাত করিয়া বুঝিবার

চেষ্টা না কর, তবে তুমি বাঙ্গালী হইলেও বঙ্কিম-স্মৃতিকে অপমান করিবার জন্য এ সভায় উপস্থিত থাকিও না। মনে রাখিও—"বন্দেমাতরম্" বাঙ্গলার গান, ভারতবর্ষের নহে।

বাঙ্গলার আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন রিরিংসার বিয়ে,—এবং তাহাও আমি বলি ফেরঙ্গ-রিরিংসা,—বাঙ্গলার তরুণ-তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ,—ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম-গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comte-এর Positivism থাকিতে পারে, Europeএর দুর্দ্ধর্ষ Nation-idea থাকিতে পারে, Middle age-এর সন্ন্যাস থাকিতে পারে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপ-কাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটি থাকিতে পারে,—পারে কি, হয় ত আছে। কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে,—এমন বাঙ্গালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শে কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ (যদিও এই সভার সভাপতিত্বের সম্মান তাঁহার জীবিতকালে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি কোনমতেই তাঁহার নাগাল আমরা পাইতেছি না) একস্থানে লিখিয়াছেন—

"আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গলা দেশের বা বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকাল কেবল ম্যাপেই বাঙ্গলা দেশ আছে। যদি কখনও বাঙ্গলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাঙ্গলা এমন একটা দেশের সাহিত্য, যে দেশ কোনও কালে বর্ত্তমান ছিল না।"

আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, বঙ্কিম সাহিত্য এইরূপ বক্ষ্যমান আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য নয়। ইহা এমন একটা সাহিত্য যে বঙ্গদেশ লুপ্ত হইলেও এই সাহিত্য পড়িয়া জ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে হ্যাঁ, বাঙ্গলা নামে একটা দেশ ছিল। বঙ্কিমসাহিত্যের ইহাই গৌরব—ইহাই মস্ত বিশেষত্ব।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক,—বঙ্কিম ও গিরিশ-যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই

প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বর-পুত্র এই দুই মহাকবিই Europeএর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙ্গালীর যুগসাহিত্য সৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ের স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গলা—এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধা মত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই; যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী ঔপন্যাসিক ও নাটক-রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহাদুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বাঙ্গলা Europe নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল Europeএর সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যের এ রকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গলা তাহার সুরে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণ বিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গালী ও জগৎ ভরপুর হইবে। যদি তা না হয়, যদি বাঙ্গলার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে, তবে—বাঙ্গলা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি? ভাই বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যই অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন?

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক,—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গলায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসীর দেশে Voltaire ও Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব" সম্পর্কে বড় অপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে মানুষ নয়, সে বাঙ্গালী হইবে কি করিয়া? ১২০৩ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র দিবস গণনা করিয়া গিয়াছেন। দিবস মাস হইয়াছে,—মাস বৎসর হইয়াছে,—বৎসর শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার তিনি গণিয়াছেন। কিন্তু যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মিলে নাই। "মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?" এখন আপনারা বুঝুন বঙ্কিমচন্দ্র কি চাহিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের কি পাইতে হইবে। তিনি আমাদিগকে কেবল 'ঘ্যান্ ঘ্যান্' করিতে নিষেধ করিয়াছেন—আমাদের "মধু সংগ্রহ" করিতে বলিয়াছেন—এবং আবশ্যকমত "হুল" ফুটাইতেও বলিয়াছেন। দেশ ও জগতের জন্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আমাদিগকে করিতেই হইবে এবং প্রয়োজনবোধে হুলও ফুটাইতে হইবে।

তুমি

তুমি কে, আমি জানি না, কখনও জানিতে পারিলাম না। অথচ তুমি আমার জীবনের শিরায় শিরায় মিশাইয়া রহিয়াছ। তুমি কে, আমি জানি না,—শুধু জানি,—তুমি আমার কামনার বস্তু, জনমের ধ্যান, দিবসের চিন্তা, নিশার স্বপ্ন, জীবনের আস্থা।

শৈশব হইতে তোমায় ধরিতে চাই, ধরিতে পারি না কেন? ছায়ার মত পলাইয়া যাও কেন? নিশার সুখস্বপ্নের মত, মুহূর্ত্তের জন্যে জীবন আলোকিত করিয়া, আবার আঁধারে ডুবাও কেন?

কেন এত কাঁদি? তোমায় এত ভালবাসি,—তবু কেন নয়নে অশ্রুজল? কেন এ ক্রন্দন? কেন চাঁদিনী রাতে, চাঁদের পানে চাহিতে চাহিতে তোমায় মনে পড়ে, আর নয়ন দুটি অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়? কেন তোমার হাতে হাত রাখিয়া, তোমার আঁখির পানে চাহিতে কাঁদিয়া ফেলি? কেন এ ব্যাকুলতা? কেন এ ক্রন্দন?

তোমায় ধরিতে পারি না—তাই এ ক্রন্দন। তোমার আঁখির পানে চাহিতে চাহিতে তোমার অপার সৌন্দর্য্যের মাঝে তোমায় হারাইয়া ফেলি,—তাই এ ক্রন্দন!

এ ক্রন্দনের বুঝি অবসান নাই। এতটুকু দুঃখ বুঝি চিরদিনই থাকিবে। এতটুকু বেদনা বুঝি চিরদিনই বাজিবে। চিরদিনই তোমায় দেখিতে দেখিতে, তোমার আঁখির পানে চাহিতে চাহিতে, তোমার অতুল সৌন্দর্য্যের মাঝে তোমায় হারাইয়া ফেলিব। চিরদিনই তোমায় যতটুকু জানি, তাহার তলে, একটু অজানা অচেনা রহিয়া যাইবে। এ সাধ মিটিবার নহে,—এ কামনা পূর্ণ হইবার নহে।

কোথায় তুমি? তোমায় চাহিতেছি, পাইতেছি না কেন? তোমায় ধরিয়াও ধরিতে পারি না কেন? এত চাই—তবু ধরা দাও না কেন? এত কাঁদি—তবু লুকাইয়া থাক কেন? এত প্রাণভরা ব্যাকুলতা, এত ব্যথা-ভরা ভালবাসা, তবু কি ধরা দিবে না? চিরদিনই আপনাকে লুকাইয়া রাখিবে?

চিরদিনই দুটি হাতে হাত দিয়া, তোমার আঁখির পানে চাহিয়াও তোমায় পাইব না? একখানি প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা, সমস্ত ভালবাসা দিয়াও কি

তোমায় একটুও বিচলিত করিতে পারিব না? চিরদিনই কি বাঁশী বাজিবে, ফুল ফুটিবে, বিশ্বসংসার সৌন্দর্য্যে ভাসিবে, আর একটুখানি অভাবে আমার প্রাণ অন্ধকার থাকিবে? তবে কেমন করিয়া তোমায় ধরিব? এ প্রাণে যত ছিল, সব ত ঢালিয়া দিয়াছি—তবে কেন ধরা দাও না?

আর কেমন করিয়াই বা তোমায় ধরিব? তুমি কত বড়—আমি কত ছোট। এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে কেমন করিয়া তোমার ওই অপার সৌন্দর্য্যপূর্ণ হৃদয়খানি ধরিয়া রাখিব? তাই এ ক্রন্দন। তাই প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে—কোথা তুমি?

———

তৃতীয় খণ্ড

দেশের কথা

স্বাগতম্*

হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গলার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ-বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মা'র কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীর্ব্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী দুলিতে থাকে, মা-ও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।

আজ সংক্রান্তির ক্রান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ ওই চলিয়া যায়, 'নূতন' তাহার রাগোজ্জ্বল বিভায় মূর্তিমন্ত হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে; সেই কবেকার পুরাতন নূতন হইয়া আসিয়াছে, আর সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন, স্বগৃহে স্বাগতম্! এই গৃহের রজে পিতৃপিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মান্ বায়ুতে তাঁহাদের নিঃশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা-গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাহাদের সেই স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত দান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতিব্যষ্টিত চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মৃতির স্মরণ পুণ্যকথা। সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য-জন্ম-ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপ এই শ্যামলা জননীকে আমরা বার বার নমস্কার করি!

আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোরো অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজিও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই, হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে—

* * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন,
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে—

তাহা আর নাই।

কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন নয়। আর আমি ইতিহাস ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেরই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মা'র আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই জাগে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মা'র স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে; মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদেরও ডাকিয়াছেন, মিলিবার জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন; যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞের হোমধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলন বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জাতি আপনাতে আত্মস্থ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হে আমার পুরাতন! হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যব, ধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনারা যজ্ঞে বৃত হউন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ দরিদ্র হইলেও,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থি চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

---

* ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

দারিদ্র্যের জন্য অন্নদানে অক্ষম হইলেও, অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, চরণ প্রক্ষালনের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ প্রিয়বচন—স্বধর্ম্ম-পরায়ণের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কদাচ সম্ভব নয়।

অকৈতবে চিত্ত-সুখে যায় যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

এ অকিঞ্চন যেন চিত্ত-সুখে সেই অকৈতব ভক্তি নারায়ণের জন্য সাজাইয়া রাখিতে পারে। তাই আজ পূর্ব্ববঙ্গ—

শিরে ধরি বন্দে নিত্য কঁরো তব আশ।

আমাদের প্রয়োজন অতি স্বল্প। সে দিন আর আমাদের নাই। কিন্তু আপনারা যে ভূমিতে আজ চরণ-চিহ্ন আঁকিতে আসিয়াছেন, সে ভূমি বহু পুরাতন; হে নূতন! সে পুরাতনের স্বপ্নঘেরা মোহ-তমাচ্ছন্ন দিনের পরপারে সে যবনিকা একবার সরাইয়া দেখিবে না কি—কাল যে অবগুণ্ঠনে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এ সেই 'ঢাকা' নগরী। শুনা যায়, এই নগরীর নাম ঢাকা হওয়ার দু' একটা প্রবাদ-কথা আছে। 'ঢাক' বলিয়া এক রকম গাছ এদেশে প্রচুর ছিল, তাই সেই গাছের নাম হইতে এ নগরীর নামকরণ হইয়াছে। যদিও সে 'ঢাক' গাছ এখন আর মিলে না। কেহ বলে, সম্রাটশেখর বল্লাল, বুড়ীগঙ্গার উত্তরে যে অরণ্যানী ছিল, সেই অরণ্যে দশভূজার এক ধাতুমূর্ত্তি পান। অরণ্যের অন্ধকারে সে সিংহবাহিনী ঢাকা ছিল। বল্লাল পিতৃসিংহাসন পাইবার পর, সম্রাট বল্লাল ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ধাতুমূর্ত্তিকে—দুর্গামূর্ত্তিকে নগরের অধিশ্বরীরূপে স্থাপিত করেন, তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী। তাই এই নগরের নাম ঢাকা। আবার কেহ বলেন, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে বুড়িগঙ্গায় আসিয়া, এই নদীবহুলা ভূমিকে মনোরম দেখিয়া, এইখানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্পে স্থিরনিশ্চয় হন। আজ যেখানে ঢাকা অ[illegible]ত, সেই স্থান হইতে ঢাক বাজাইলে যতদূর অবধি শুনা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহার নাম ঢাকা রাখেন। কীর্ত্তিনাশার বক্ষের উপর দিয়া আজ আপনারা সেই ঢাকা নগরীতে আসিয়াছেন।

শতাব্দীর সেই যবনিকা যদি সরাইয়া দেখেন তবে দেখিবেন যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিশাল জনপদই বঙ্গদেশ—এখন সচরাচর যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাকেই বঙ্গ বলিত। পদ্মা মেঘনা এই চিরশ্যামা একদিন কি মহিমায়

কোটী সূর্যকিরণভাতিতে দীপ্তিময় ছিল। ঢাকা, বিক্রমপুর বলিতে সেই পুরাতন গৌর-বঙ্গের কেন্দ্র বলিয়া মনে পড়ে। গৌড়-বঙ্গ ও মগধের কত না কাহিনী, কত সভ্যতার সংঘর্ষণের ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে চলিয়াছে। মগধের কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণ-কুঞ্জর-সজ্জিত অসংখ্য বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদ-শিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতা-ধ্বজা সূর্য্যকিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। সপ্তম শতাব্দীতে সে গৌড়-বঙ্গ কালের ঝঞ্ঝায় আঁধারে ডুবিয়া গেল। তারপর একদিন উত্তরাপথের আলোড়নে যুগ-বিপর্য্যয় হইল। অবিরাম রাজ্য-বিপ্লবে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। এই যুগব্যাপী ঘোর অরাজকতার ভিতরে বাঙ্গলার প্রাণ লুকাইয়াছিল, সে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করে নাই। সুপ্ত প্রজাশক্তি সহসা স্বপ্নোত্থিতের মত আঁখি কচলাইয়া ভোরের আলোকে সব দেখিয়া লইল। সিংহপ্রতিম প্রজাশক্তি সমবেত হইয়া সেই "মাৎস্যন্যায়" সেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অরাজকতার চরম দুর্দ্দশাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই যুগেই গৌড়-বঙ্গের শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্মের বিকাশ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুরণ হইয়াছিল; জগতের ইতিহাসে সে কাহিনী সোনার নিকষে রেখা টানিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। তারপর, কুক্ষণে বঙ্গ গৌড়-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বঙ্গ ও গৌড় এই বিচ্ছেদে হীনবল হইয়া পড়িল। স্বাতন্ত্র অবিলম্বে ভেদবুদ্ধি আসিয়া উভয়কেই নষ্ট করিল। সে দিন বঙ্গ যে মহামণি প্রাণের মণিকোঠায় রাখিয়াছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বাঙ্গলার মহানাগ অনন্তের মাথার মণি সেইদিন হারাইয়া গেল। তাহা আর মিলিল না। হায়! গৌড়, কেন এমন মণি হারাইয়া ফেলিলে! তাই সেই বিচ্ছেদের দিনে—সেই বিরহের দিনে—বাঙ্গালীর রাজার মাথার শ্বেতছত্র কে কাড়িয়া লইল? সে উত্তর ইতিহাস আর দিবে কি?

এই রূপে সেই যে দিন গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল সে দিনেও এই পদ্মা-মেখলা শ্রীবিক্রমপুরের প্রাসাদশীর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকু বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গেছে, সে ভূভাগকেও টুক্‌রা করিয়া দিয়াছে। সেই স্বপনের দেশ, কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই।

আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যাদীপ

জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্ম্মদা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আরবার গর্জি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ সেই ভূমি! এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; যাঁহাদের আশীষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ! সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্য-লক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়াছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব, কবির সে কণ্ঠ আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানীমুখরিত বনভূমি শ্যাম তমাল ক্রমসুশোভিত দেশের রূপের কথা; শুনাইতাম—এই অতল রাশির অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দদাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি" বল্লালের অস্থিভস্মে পরিণত যে দেশের 'পদের ধূলি'—সে দেশেব বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম; আর শুনাইতাম—অরণ্যের তমাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার! আর শুনাইতাম সেই দানসাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী বিজয়ীর পলায়ন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতাম। গাইতাম,—হরিশ্চন্দ্রের কথা, অদুনা-পদুনার সেই প্রাণমনবিমোহনকারী মধুর কাহিনী; সেই চাঁদ রায় কেদার রায়ের বীর্য্যগাথা! এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে আজ আপনারা আসিয়াছেন, হে বাঙ্গলার সন্তান আজ সে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সে পুণ্য-কাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমন করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রায় যাত্রা-গান গাহিতে পারি।

সেই স্বপ্নের দেশে, আজ দেখুন, আমরা কি হইয়াছি! দিন গিয়াছে,—এই দেশ একদিন জ্ঞান ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু। ভারতের দেশের পরিব্রাজকেরা জ্ঞানলাভের জন্য এই দেশে আসিতেন। সেই জগদ্বিখ্যাত সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। আজিও লোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী দেখাইয়া দেন। এই গৌড়-বঙ্গ বীরদেরই একদিন জগদ্বিখ্যাত নালন্দা মহাবীরের প্রধান আচার্য্য ও সংঘস্থবির ছিলেন। আপনারা আজ সেই দেশে আসিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাংলার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। সে যুগের পরিচয়, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই বিশিষ্টভাবে যুক্ত; তবুও সেই শতবৎসরের মাঝে ব্রহ্মসংস্কার ও স্বদেশীর মহা-আন্দোলনের দিনে এই আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতভাবে কতদিক দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্রশক্তিতে যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। কবে আমাদের সব আয়োজন সার্থক হইবে, কবে আমাদের সব চেষ্টা যথার্থ মাতৃ-পূজায় পরিণত হইবে। কবে সেই মহাযজ্ঞের ধূম নদীপ্রান্তে, অরণ্যশীর্ষে, বনানীর অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিবে। বড় দুঃসময়ে আপনাদের ডাকিয়াছি—আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, দেখিয়া যান,—এই সেই পূর্ব্ববঙ্গ!

এই বঙ্গে শুধু আজ আমরা একলা নই, আমাদের আর এক ভাইরা এখানে আছেন। তাঁহাদের গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে। আজ এই আমাদের মুসলমান ভাইরা। অতিথিপরায়ণ বঙ্গ কখন অতিথিকে ফিরায় নাই। বুদ্ধকে সে স্থান দিয়েছে, মুসলমান ধর্ম্মকেও স্থান দিয়াছে। সে দিন যে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা হাতে করিয়া, গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাহারা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদেরই মত সমদুঃখী। একই মাতৃস্তন্যপানে আমরা বাঁচিয়া আছি, বাঙ্গলা তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। ভাই ভাইয়ে কলহ কোন্ দেশে না হয়, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের ভাই। সেই ইস্‌লাম পতাকা-বাহীর বংশে মহাপ্রাণ সোলেমান কিরানী জন্মিয়াছিলেন; সেই যবন হরিদাস একদিন হরিধ্বনিতে বঙ্গ মাতাইয়াছে, সেই মুসলমান আলোয়াল একদিন পদ্মাবতী রচনা করিয়াছেন; সেই মুসলমান কত কবির কত গান, কত ফকির, কত সাধু এই বঙ্গদেশের জন্য ভগবানের কাছে দোয়া করিয়াছে; সেই মুসলমান কবি চাঁদ কাজির গানে আছে—

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগীয়া নারী হাম সে সাঁতার নাহি জানি ।।

মুসলমান কবি এ গান বাঁধিবার সময় বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ গান বাঁধিতে পারিয়াছেন। এই ঢাকা নগরীতে সেই ইস্লামের বিজয়-তোরণ আজিও দাঁড়াইয়াছে। একই জমির পাশে পাশে লাঙ্গলের ফলকে হিন্দু-মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। তাহাদের মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি। সে দিনেও টাকায় আট মণ চাউল মিলিত, এ দারিদ্র্য সে দিনেও আসে নাই।

হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে ঝনন্ রন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মায় একদিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে, আকাশে বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটি বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন,—এই এতকালের সহিষ্ণু মাটি শতধা দীর্ণ হইয়া, সেই জ্বলিতজ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটিকে জ্বলজ্জাল-ললাট দীপিয়া তুলিয়াছে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসরের বাঙ্গলার মৃত সতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব নর্ত্তনে সব বিষ, ঈর্ষা, অক্ষমতা, পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহংকার জ্বালাইয়া সেই সৃষ্টিপারাবারের একাকার আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গলার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপোনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের রথিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা, স্বধা দ্বিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গের শ্মশানে বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন্। তাই বাঙ্গালরা আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙিয়া দিউন।

আমি দেখিতেছি, ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গলার প্রাণ-ধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলাচঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্যন্যায়ের'

অরাজকতার যুগে বাঙ্গলা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গলা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ যুগেও বাঙ্গলা সেই ধর্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্ম, যে প্রাণ মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরপ্রান্তে সেই অদ্বৈত-বংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই পদ্মাবতী-তীরে তাঁর সেই অরুণ-রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়াছিলেন, তাই—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
আর— ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হইলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥
আর— বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥

আর সেই ঢাকা নগরীতে বাঙ্গলার শেষ বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণকমল, সেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও তাঁহার রাধাভাবের রসে সিঞ্চিত 'রাই উন্মাদিনীর' প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরাও আজ কৃষ্ণকমলের রাধিকার মত—

তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই!
তুমি চন্দ্রে! একা এলে প্রাণনাথ কই?

চন্দ্রা রাইকে বলিয়াছিলেন,—

অঘটন ঘটাতে পারি—কৃপা হ'লে তোর—

চন্দ্রা অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, আপনারাও 'কৃপা হ'লে' অঘটন ঘটাইতে পারিবেন না কি?

তারপর, এই ঢাকায় প্রথম 'নীলদর্পণ' হইয়াছিল, সে কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অজ্ঞাত নাই।

এই প্রদেশের কাছে ভাওয়াল, সাভার, ধামরাই প্রভৃতি যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভূভাগে স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের কত না কাহিনী, কত না দুঃখ-সুখ এই মাটির ধূলিতে মিশাইয়া আছে। হায়! তাহার কাহিনী কে আজ গাহিবে। যদি সেই সুপ্ত ইতিহাসের বাণী কোন দিন কেহ সজাগ

করিয়া তুলেন, তবে দেখিবেন,—কি শক্তিমান্ এক মহাপ্রাণ জাতি কি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছে।"

সুখ-দুঃখের অনেক কথা আপনাদের শুনাইতে চাই ; সব শুনাইতে পারি কই, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—বুক ফাটিয়া যায়! বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গলার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও এত অন্ধকার, দীর্ঘনিশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই! এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া একহাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। সুদিন গেছে, কুদিন আসিয়াছে! আপনারা দুর্দ্দিনের অতিথি, দুঃখী বিদুরের খুদ আছে, আর কিছুই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই আপনাদের নিবেদন করে—শ্রদ্ধার হবিঃ গ্রহণ করুন, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হইক, কৃতকৃত্য হউক।

দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।

হে সাত্ত্বিক! আসুন, তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মা'র ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নী-কৃতবাসে বলিব,—জননি জাগৃহি!

সত্যাগ্রহ

আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই; কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই!

আপনাকে না পাইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কেন না, ভগবান মানুষের মধ্যেই প্রকাশিত হন।

সমস্ত সংসার ভগবানের লীলাক্ষেত্র। যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হন; প্রত্যেক জাতির মধ্যেও তাঁহার তেমনি বিচিত্র প্রকাশ। এই যে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাও তাঁহারই লীলা। এই নব জাগ্রত জাতির মধ্যেও তাঁহারই বিশিষ্ট প্রকাশ।

আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা, তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। যদি কেহ স্বদেশকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস, তবেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী, আর ইহাই ভারতবর্ষেরও বাণী।

এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, সকল হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশ-প্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা করিবে না, হিংসা করিবে না; কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য্য।

আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, এই যে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন. আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-নিবেদন। সকল শাস্তি, সকল আপদ-বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, প্রাণের অনুরাগে আত্ম-নিবেদন।

আজি আমরা মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার চাই। ঐকান্তিক আত্মনিবেদন না করিতে পারিলে সে অধিকার ত জন্মে না। তোমরা কি পারিবে? আমি কি পারিব? ভগবানের কৃপা ছাড়া কেহই পারিবে না।

আজ তাই এই দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে আমাদের নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, ও অবনত মস্তকে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। আজ তাই আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ। আমরা সকলেই পরস্পরকে আহ্বান করিতেছি। আজ সারা দিনের উপবাসে, শুদ্ধ মনে, সংযত চিত্তে বিধাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রাণের প্রাণ সেই আত্মাকে ডাকিবার জন্য আসিয়াছি। এস আমরা সেই প্রেমের বলে বলী হই। কারণ—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

এস আমরা আজ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লক্ষ কণ্ঠে বলি—

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত,—"

"নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আবার বলি, উঠ, ডাক, জাগ,—আপনাকে জাগাও। সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। তবেই "নরনারায়ণের" প্রকাশ হইবে। মনে করিও না, শুধু তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে নারায়ণের বিকাশ। সে অহঙ্কার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মাটি কর্ষণ করিয়া, আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে,—যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে,—যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্ম্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে,—যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে, সরল প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে,—যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া, জাগাইয়া রাখিয়াছে,—যাহারা বাস্তবিকই এদেশের একাধারে রক্ত মাংস ও প্রাণ,—

"উঠ, ডাক, জাগ"—তাঁহাদের মধ্যে "নর-নারায়ণ" জাগ্রত হউক। এস নারায়ণ, এস নর-নারায়ণ—আমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর।

বাঙ্গলার কথা

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকারে বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গালীর কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যে সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না। লজ্জা হয় না। হয় ত আমাদের শাসনকর্ত্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয় ত আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু "সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্" এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিব না। সে ত কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই

বলিয়া তার জন্য কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লান বদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয় ত অনেকেরই মনে হইবে যে এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম্মসাধনার বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এই সব জনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সাধনায় ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্ব্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের পক্ষে রাজা প্রজায় কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই

বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সম্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালীর কতকগুলা দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে বাঙ্গালী মানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোণ কারণে! সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-যোগ্য জমি আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল

হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিৎ, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিৎ, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিৎ এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত আমাদের সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politcs শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ

দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke-এর বুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstoneএর কথামৃত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। "Seely'র Expansion of England" নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ শুধু এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্ত করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গলার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি, এবং ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গলা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? Government এর কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে

তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে, কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা-ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞান-গৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গলার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল।

ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহ বশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া, বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তূর্য্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তারপর বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার মূর্ত্তি গড়িলেন,—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্ত্তি দেখিলাম না ; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তারপর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন উহা আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের

বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্।"

বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই ; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক-শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাটী ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না বা জন্মাইতে পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচন-দাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি ? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—"

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল! বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি; আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন— এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ্দ তৈয়ারী করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহা বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের বিচার্য্য যে, কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণে সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কি কি আবশ্যক এবং তাহা কি করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরাজীতে

যাহাকে "Nation Idea" বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল্য নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদান-প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে; এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্খাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Review তে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবার সমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে

জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক, কি অনার্যই হউক, কি আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না—বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বভাবের ধর্ম্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবারমধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষে ঐ একই কথা খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদবিসংবাদ ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি, আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমানজনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্ম-

সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ-সাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরমাত্মরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরমাত্মরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয় ত মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্ম্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎ-লীলার পূত পুণ্য কাহিনী, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিকটাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখ-কষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্দ্ধ-অনশনের মধ্যেই মিলনপথে পা বাড়াইয়াছে। অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই দুঃখ-কষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমনপ্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাস করিও, একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সেই স্বার্থ-পরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনি অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেই রকম সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপর পারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোন দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতি-সমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বের দাবী, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি—আমার কাছেই

অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি —একটা ধার করা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁদের ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোন একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমতভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই ; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতায় ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই ; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপের সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয় ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না—তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না? বিজ্ঞান জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সে আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদের প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরাজের আগমন বিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খৃঃ অব্দের কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছেন—এই কথার গূঢ় মর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কিনা, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্ম্ম কথাটি কি, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Keepling লিখিয়াছিলেন—"The East is East and the West is West, never the twain shall meet." অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে, জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :—

"Ths East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path.

অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা বলিতেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথা সত্য, আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলণ্ড ও বাঙ্গলা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই

মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যা'ক। আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশটা একটা নকল ইংলণ্ড হইবে, আমাদের নরনারী নকল সাহেব মেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মত হইবে, আমাদের চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন অসম্ভব ?

এই সহরে ত অনেকেই ইংরাজী রকমে জীবন যাপন করেন। আহারবিহার, আচারে ব্যবহারে চালচলনে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ত একরকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশঃ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা আমাদের বিলাতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না ? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তারপর থাকে না ; কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্ম্মে সেই হওয়া জিনিসটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Keepling এর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে. ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁসলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবে ? এ কথা অর্ব্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল, তাহা ইংরাজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরাজের যাহা ভাল, যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথকভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে

ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালমন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ান। খাঁটী ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া? এমন করিয়া ত ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন ত ঠিক ইটের এমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে দিকটা আবার নূতন ধরণে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না, —হইতেই পারে না। দুইটা জিনিস যেমন আঠা দিয়া জোড়া লাগান যায়, ঠিক তেমনি করিয়া ত বিলাতের ভালটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগান যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে ত তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর একদিক দিয়া বোঝা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কি হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালী সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এভাবে যাঁহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাব-ধর্ম্ম আছে, সেই স্বভাব-ধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে, এবং যাহা সেই স্বভাব-ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর একটা

দিক দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন-বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্টরূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুটি জাতির শাসনবিভাগের উপর দিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসন-বিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসন-বিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাই কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :—

"It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary to attempt to define in concrete terms the precise relation-ship that will exist between England and India when the goal is reached."

অর্থাৎ :—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যে ঠিক কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমার ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরাজের জাতীয় স্বভাব-ধর্ম্মের বিনাশ-সাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যে যে একটা একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই

জন্যই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে—তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্মসঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

কৃষকের কথা

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীদের কথা মনে আসে, তার পরই আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্র্যের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয় ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ত একেবারে এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গলা দেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই। তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম।

সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যা ধরিলে এবং আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জন পিছে দুই বিঘারও

কিছু কম থাকে। এই দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া একজনের সমুদয় খরচ নির্বাহ করা অসম্ভব। তার পরে অনাবৃষ্টি আছে, দুর্বৎসর আছে, আমাদের চাষারা রোগক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন—এই দুই বিঘা জমিও বার মাস পরিশ্রম করিয়া ভাল করিয়া কাজে লাগাইতে পারে না।

সরকারী কাগজ হইতে ইহাও দেখা যায় যে, জন প্রতি বৎসরে সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্য আবশ্যক হয়। আমাদের সমস্ত বাঙ্গলা দেশে এই হিসাবে বৎসরে বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক। আমি এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির যে বাঙ্গলা, তাহার কথা না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা, তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের উৎপন্ন হয় মোটে চব্বিশ কোটি আশী লক্ষ মণ। তাহা হইতে প্রায় এক কোটি মণ প্রত্যেক বৎসরে রপ্তানি হইয়া যায়। খাদ্য-শস্যের আমদানি বড় একটা বিদেশ হইতে হয় না, সুতরাং যেখানে আমাদের বত্রিস কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক, সেখানে থাকে মাত্র তেইশ কোটি আশী লক্ষ মণ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে যদি সাত মণ করিয়া খাদ্যশস্য যথার্থ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নাই। আবার আর একদিক দিয়া দেখিলে আমাদের দারিদ্র্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। সরকারী কাগজে পাওয়া যায় যে, আমাদের সকল রকম চাষের উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি, পাট, চিনি, তামাক এই সকল উৎপন্নের দাম একশ, ত্রিশ কোটি টাকা এবং সরকারী কাগজপত্র অনুসারে প্রত্যেক জনের বৎসরে ত্রিশ টাকা করিয়া আয়। আমার হিসাবে প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ষোল টাকা হইতে কুড়ি টাকার মধ্যে। কুড়ি টাকাই হউক, ত্রিশ টাকাই হউক, এই টাকায় কোন চাষাই তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় অভাবগুলিও পূরণ করিতে পারে না,—গবর্ণমেণ্টের জেলেও প্রত্যেক ব্যক্তির পিছে বৎসরে আটচল্লিশ টাকা করিয়া খরচ হয়।—ইহা কি আমাদের ঘোর দারিদ্র্যের স্পষ্ট প্রমাণ নহে?

আমাদের রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলায় অনেক পরিমাণে "গুপ্তধন" (Hidden wealth) আছে অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে নাকি অনেকে অলঙ্কার ব্যবহার করেন এবং অনেকে টাকা পুতিয়া রাখেন। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে কাহারও কখনও টাকা পুতিয়া রাখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। পুরাকালে অনেকে টাকা পুতিয়া রাখিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে সত্য, কিন্তু যদি এইরূপ কেহ টাকা পুতিয়া

রাখিয়া থাকেন, তবে সে মাটিতে পোতা টাকা মাটির মধ্যেই লুকাইয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার বড় একটা সন্ধান পায় নাই। অলঙ্কারের বিষয় একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, খুব অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়েরা রূপার অলঙ্কারই পরিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকায় আমাদের দেশে সেই সোনার দামের ওজনে সব দ্রব্যেরই দাম ঠিক হয়। ইহার ফলে আমাদের দেশের রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই যে যৎকিঞ্চিৎ রূপার অলঙ্কার আমাদের দেশে আছে, তাহার মূল্য একটা আকস্মিক ও আমাদের দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক কারণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—ইহাও আমাদের দারিদ্র্যের আর একটা কারণ। আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আবশ্যক হইলে সরকারী কাগজেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে এমন গ্রাম নাই—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে শতকরা একশ' জনই ঋণদায়ে পীড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকাজের উৎপন্ন হইতে চাষা ত জীবন ধারণ করিতেই পারে না এবং যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে। মানুষ ভাল করিয়া জীবন ধারণ না করিতে পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। আমি বিলাতি আরামের আদর্শের (Standard of comfort) কথা বলিতেছি না, কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য, মনকে শান্ত ও প্রসন্ন রাখিবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি ও দুর্বৎসরের যে বিবাদ, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, সেই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট, আমাদের চাষাদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে এই ঘোর দরিদ্রতানিবন্ধন দুই দিক দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে, একদিকে অর্থাভাবে আমাদের যে মনুষ্যত্বের আদর্শ, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন শক্তিহীন, মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি, আবার অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের মধ্যে সেই একই কারণে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অনেক প্রকার দুষ্কার্য্য বাড়িতেছে ; সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যায়, আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্নে যাইতেছে—পল্লীসমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিপুষ্ট

হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্যনিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, একদিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর এক দিকে বড় বড় সহরে বিলাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ, কাজেই এই বড় বড় সহরগুলা এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে ; সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

এই অস্বাস্থ্যের সঙ্গেও আমাদের দারিদ্র্যের যোগ আছে, শরীর দুর্ব্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র্য, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধ আমাদের কার্য্যের তালিকা ত এই—কিন্তু কাজ করিবে কে ? রাজসরকার, না আমরা ? সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য

যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের অবসান কিছুতেই হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বিচার করিতে হইলে আমাদের কি ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং যাহা ছিল, তাহাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আরও উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সুখের মোহ আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আজ আমরা নিজেরা

সুখ-দুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনই ত আমরা ছিলাম না, সবই ত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, কটির লজ্জা-নিবারণ—আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিতাম। আলিপনা দেওয়া আঙ্গিনা, মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, পরস্পরের প্রীতি—সবই আমাদের ছিল। আজ ঘরে লক্ষ্মী নাই, তাই আমরা লক্ষ্মীছাড়া,—কেন আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইলাম? দোষ আমাদেরই,—সব দোষই কি আমাদের? ইতিহাস নিজকৃত দোষকে কখনও ত্যাগ করে না। তবে প্রবলের সংঘাতে দুর্ব্বলের দোষ শত গুণ বাড়িয়া যায়। আমাদের সে সময়কার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাসে তপ্ত ও সিক্ত, সে কথার বিচার আর করিয়া কাজ নাই, বিচার করিলেই গরল উঠিবে। আজি মিলনের দিনে সে কথা ভোলাই ভাল। একদিন ছিল—বাঙ্গলা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। সে বসন ও বৈভব জগতের নরনারীর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাদান ছিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল। কেন নষ্ট হইয়া গেল, কে নষ্ট করিল? ইতিহাসের সাক্ষ্য—আমি আগেই বলিয়াছি, সে কথা ভোলাই ভাল। সেই দূর শতাব্দীর অন্ধকারে যখন চোখ ফিরাইয়া দেখি—সকলই বিভীষিকাময়, ভয় হয়, মনে হয়, সে কি স্বপ্ন! আমরা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলাম, দাবি করিবার কিছুই ছিল না, শুধু প্রাণের দাবী ছিল। হায়, দুর্ভাগা বাঙ্গালী আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সকলই বলি দিতাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, জীবন্ত অগ্নিতে সকলই দাহ করিয়া দিলাম, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। আমরা যে অক্ষম, তাই—দোষ কারও নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা "স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিলাম।" অনাচারে, অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায় আমাদের গৃহধর্ম্মকে, আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মকে, বিসর্জ্জন দিলাম।

আমার বাঙ্গলার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্যাম শস্যক্ষেত্র গোচারণ-ভূমি ছিল, গাছে ফল ছিল, খড়ের ছাউনির ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ গাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা-ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গলার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষা বৎসরে ছয় মাস তাহার পেটের জন্ত খাটিত,

তাহার ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকি ছয়মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙ্গলার সভাব-ধর্ম্ম-সম্মত চিরকালের অভ্যাসবশতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিত। সেই পণ্যদ্রব্যই বিশ্বের হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। সে চাষা এখন নাই, গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহধর্ম্মও এখন নাই, আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, তৃণ-শ্যাম ক্ষেত্র শুকনা কাঠ হইয়া ফাটিতেছে, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে, জলকষ্টে—বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যে সুখ তাহার ছিল, তাহা আর নাই। নাগপাশ—অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়—অবশ হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন এমন হইল, কি পাপে মা লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করিলেন? ইতিহাসের সাক্ষ্য যাহাই হউক, ভিতরের কথা ভাবিয়া দেখিলে দোষ আমাদেরই। যে আপনাকে দুর্ব্বল হইতে দেয়, তাহার বলহীনতা যে তাহারই দোষ। নিজের ঘরের ধন "চৌকি না দিয়া" যে পরের হাতে তুলিয়া দেয়, দোষ তাহার,—না, সেই সুযোগ পাইয়া যে সব ধনরত্ন লইয়া যায়—সেই সুযোগ-প্রয়াসীর? আমরা যে সেই সময় নিজের ঘরকে পর করিয়াছিলাম ও নিজের প্রাণের আদর্শ ভুলিয়াছিলাম, শুধু পরের দোষ দিলে ত আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

ভুল কোথায়? ভুল আদর্শের সংঘাত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে বিরোধ, সেই বিরোধেই আমাদের এই দুর্ব্বল শক্তিহীন অবসন্ন দেহ। নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল না, সেই দৌর্ব্বল্যই আমাদের দোষ, সে দোষ ত এখনও যায় নাই, আমরা জাগিয়া—নিজের আস্বাদ পাইয়াও নিজের আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছি না, সেই আদর্শের সংঘাত এখনও ত চলিতেছে, এখনও ত আমাদের নিজের আদর্শকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি! যে ভুলে নিজের আদর্শকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ভুলের মোহ যে এখনও কাটাইতে পারিতেছি না। বিলাতের আদর্শ বিলাতেই শোভা পায়, তাহা বিলাতেই থাকুক, আমাদের সে আদর্শকে ত্যাগ করিতে হইবে। জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়, ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শজনিত যে বিলাসের ভোগ, তাহাকে সবলে

দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সরল করিতে হইবে, জীবনের ধারা ও গতির মুখ একেবারে ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রতীচ্যের যে Industrialism—এই Industrialism, যাহাকে শিল্প-চেষ্টা কি সকল রকমের বাণিজ্য-চেষ্টা বলিলেও ঠিক বুঝা যায় না—সেই Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিল না ও আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতেই পারে না, সেই Industrialism ধীরে ধীরে চোরের মত আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই Industrialism আমাদের দেশে চলিবে না, চলিতে পারে না, বাঙ্গলার আদর্শ তাহা নয়। বাঙ্গলার মাটিতে যাহা হয়, বাঙ্গলার ধাতে যা সহে, তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

বাঙ্গলার নাই কি! ছিল না কি? কি জোরে, কি কলকল স্রোতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিশিতেছে। আজিও পদ্মা জলোচ্ছ্বাসে কি উদ্দাম ভাবের ভাঙ্গন অটুট রাখিয়াছি, কি তোড়ে ব্রহ্মপুত্র কলকলনাদে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া যায়, আর যখন দামোদর ঘোর ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠে, আজিও তাহার গতি কেহ ত রোধ করিতে পারে না, সাগরের অশ্রান্ত গর্জ্জন আজিও ত থামে নাই। বৃদ্ধ হিমালয় তাহার দুই বাহু লইয়া আজিও তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন, তমালতালীবনরাজি-নীলা আজিও আছে—যাহার উপরে বাঙ্গলার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সব ত তেমনি আছে, তবে নাই কি? বাঙ্গলার যে মন্দিরে মন্দিরে মস্‌জিদে মস্‌জিদে সাধন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইত, আজিও ত সেই মন্দির আছে, মস্‌জিদ আছে, তবে নাই কি? সে বল, সে স্বাস্থ্য, সে ধৈর্য্য, সে আত্মস্থ জাগ্রত অবস্থা সবই তমের অবসাদে ডুবিয়াছে। দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতি আছে, সেই জাতির যে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি, তাহা ভাসিয়া গেল কেন? সে গ্রাম নাই কেন? সে পল্লী নাই কেন? সে পল্লীসমাজ নাই কেন? বাঙ্গলার যে শত শত গ্রাম লইয়া শত শত সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? খর্ব্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষকেশ, কঙ্কালসার প্রাণীর দল ক্ষয়গ্রস্ত মরণাহত পশুর মতন পানা-পুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুঁকিতেছে কেন? আজ যে বাঙ্গালীর মেয়ে আধপেটা খাইয়া লোকচক্ষের অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে, তাহার কথা ভাবি না কেন? মায়ের ছেলে ম্যালেরিয়ায়, প্লীহা-যকৃতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ রাখি না কেন? আজ যে আমরা Industrialism, Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া

পড়িয়াছি, Joint Stock Company—বনিয়াদি জুয়াচুরির জন্য অহোরাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nation তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার, আজ দুই শত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, গঙ্গার তীরে তীরে কয়টা ঘাট নূতন বাঁধান হইয়াছে, পথে পথে অশথবটের বিবাহ দিয়া তাহার তলাখানি শানবাঁধাইয়া পথশ্রান্ত নর-নারীর বিশ্রাম-সেবার জন্য কয়টা নূতন বট অশ্বত্থের সেবা-সংস্কার হইয়াছে, কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পার? কয়টা পল্লী, কয়খানা গ্রাম আজ বাঙ্গলায় আছে? ঘর ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, রসকস্ যাহা ছিল, সকলই ফুরাইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে পল্লীতে বারোমাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ, সকল গ্রাম, কেমন একপরিবার হইয়া উঠিত, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই? এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না; খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি Cousin হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন, আরও দুর্ব্বল শতছিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, এখন মিল ফ্যাক্টরির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের জিবে জল আসে, আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য কিছু টাকা আছে, তাঁহারা Cheap labourএর কথা ভাবিয়া লোভে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,—এই যে দাসসুলভ-অনুকরণ-মোহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের জীবনের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে না সরাইতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।

Industrialism বাঙ্গলা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতি-ফ্যাক্টরি-রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে। বিলাতি কারখানায় নানান কারখানা করিবে, নিজেরা সেই কলকারখানায় কলের চাকার মত ঘুরিব, প্রাণহীন স্তব্ধ জড়বৎ হইয়া সে চাকার দাঁতেরসঙ্গে

মিলাইয়া আমাদের লাগাইয়া দিব—সেই দাঁতে দাঁতে লাগিয়া থাকিব, বিদ্যুতের কল টিপিয়া ধনী মালেক আমাদের চালাইবে, তাহাদের টাকা আছে, আমাদের পোকা-পড়া—রস রক্ত অস্থি মজ্জা আছে, যতদূর পারিবে, মালেক আমাদের রসভার হরণ করিবে। এই Industrialism যতটুকু আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ফল দিয়া ইহাকে বিচার করা যায়। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের কি ভীষণ অবস্থা। সহরের বাঙ্গালীবাবুরা বিলাসের চক্‌-চকানিতে চকিত হইয়া বেশ সুখের মোহেই বাস করিতেছে। এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, এত যে দারিদ্র্যের পীড়ন, তাহাও বিলাতি সভ্যতা বা বিলাসের জন্য অকাতরে সহ্য করিতেছে। কালে যে কি হইবে, তাহার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। আর বাবুদের ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহার চিত্র আরও ভীষণ। গঙ্গার দুই ধারে বাঁধ আর কলের চিম্‌নির ধোঁয়া, মা গঙ্গা আর পূত-সলিলা নাই, সহরের ও মিলের সকল ময়লা তিনিই গ্রহণ করেন, কলের চিম্‌নি দেশ শুধু কালি ও ধোঁয়ায় ভরিয়া দিতেছে। স্বাস্থ্যের দেখা নাই, একটা মিলে অনেক লোকের সমাবেশ, এই চিম্‌নিই তাহাদের জীবনীশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। কেহ কলের চাকার দাঁত হইয়া আছে। কেহ একটুকু ফরসা কাপড় পরিয়া সেই প্রাণ দিয়া বুকের রক্ত ঢালা শ্রমলব্ধ অর্থের ভার ওজন করিয়া, মাথায় করিয়া মালিকের সিন্দুকে তুলিয়া দিতেছে। আমাদের শ্রম-জীবিদের যে নৈতিক জীবন, তাহা মিল ফ্যাক্টরিতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সব রকমের মাদকতা বাড়িয়াছে! হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মিলের কাছে কাছে যত শুঁড়িখানা আছে, তাহাদের আয় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, এই Industrialism-কে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপেও এই Industrialismএর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা আজকাল অনেক কথা বলিতেছেন, এই Industrialism এর ফলে ইউরোপে কি দুর্দ্দশা—মানুষগুলা রক্তমাংসের মানুষগুলাকে পাথরের আর লোহার চাকা তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা খাটে শুধু পেটের দায়ে, কিন্তু মানুষ শুধু ত তার পেট লইয়াই মানুষ নয়। তাহার সহজাত ভোগের, প্রবৃত্তির ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধাও পেটের ক্ষুধা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। সে যাহা অর্জ্জন করে, সে তাহা শুধু পেটের জন্য ব্যয় করিতে পারে না। সকল রকমেই সে চাপে পিষ্ট হইতেছে। নেশায় ডুবিতেছে। পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছে, বহুতর অসঙ্গত অনাবশ্যক অভাব জুটাইতেছে, ফলে সামাজিক অত্যাচারে যত প্রকার পাপের

সৃষ্টি হয়, সেই সব বীভৎস সর্ব্বদাহী দেহ-মন-পোড়ান রোগে ভুগিতেছে ও পাপের অন্ধতমে ডুবিতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ইউরোপের এই ভীষণ ছবি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি দেখিয়াছি, বিলাতের যে কোন মিল ফ্যাক্টরি হউক না কেন, তাহার সম্মুখে সন্ধ্যার সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সারা জীবনে ভোলা যায় না। Industrialismএ যে ধনের বৃদ্ধি হয় সে ধনের ধনবৃদ্ধি, সাধারণ লোকের অবস্থা যেমন ছিল তেমনি থাকে। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই ধনের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই প্রবল ধনীর অত্যাচারে ইউরোপ আজ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম তাহাদের ধারণা করিতে পারে না। যথেষ্ট অর্থ-বৃদ্ধি, কিন্তু টাকা মালেকের, মালেকান্ স্বত্বও মালেকের, এই সব মালেকের দল ধনকুবের হইয়া উঠে কিন্তু টাকা ছড়াইয়া পড়িতে পায় না। সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তিসম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্যান্য স্থানে অবসাদ, অন্ধকার! শক্তির ধর্ম্মই বিকিরণ সম্প্রসারণ, তবেই শক্তির শক্তিত্ব ও অস্তিত্ব বজায় থাকে, শক্তি বজায় না থাকিলে সব বলই বিকল হইয়া পড়ে। ইউরোপের এই কলকারখানার ফল, শ্রম ব্যর্থ হইয়া আকাশ পানে নিরর্থক চাহিয়া আছে, এবং যে সব শ্রমজীবিদের রক্ত-মাংস দিয়া এত অর্থ অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, সে অর্থও সার্থক হয় নাই। ইহার ফল Strike Combine Socialism! খৃশ্চান ইউরোপ গত তিনশত বৎসরের Industrialismকে বরণ করিয়া খৃষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মানুষকে মানুষ ও দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং শুধু অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিজের জীবনকে পিষিয়া মারিতেছে। আমরাও কি এই Industrialismকে বরণ করিয়া আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিব?

জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অন্তর্ম্মুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য। ব্যক্তি ও সমাজ একসঙ্গে মহাসত্য, উভয়েই পবিত্র। শুধু যে তাহারা উভয়ে মহাসত্য তাহা নহে, আমাদের মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্ম ও মহাসত্য তাহাই। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব সংবিৎ, সমাজ জাতির আত্মস্থ সংবিৎ। সত্য কাহাকেও ত্যাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। ব্যক্তিত্ব যদি সমাজকে বাদ দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তোলে, তাহাতে ফল হয় অত্যাচার, আর সমাজ যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে

বাদ দিয়া আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চায়, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ। উভয় যখন সত্য, তখন উভয়কে এই সঙ্গে অখণ্ডভাবেই ধরিতে হইবে। ইউরোপে Industrialismএর ফলে তাহার সমাজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। তবু এই Industrialism ইউরোপে কতকটা সয়, কেন না, ইউরোপের স্বভাব-ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ আপনার চেষ্টায় আপনার স্বভাব-ধর্ম্মের বলে সুস্থ ও সবল হইলে এই ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। এই যে ইউরোপে আজি সমরানল প্রজ্জ্বলিত, ইহা কি অনল অক্ষরে এ ব্যাধি কি, দেখাইয়া দিতেছে না? ইউরোপ তাহার সমস্যার পূরণ আপনি করিবে। আমি আগেই বলিয়াছি, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিবে, ইউরোপ তাহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা অকারণে ইউরোপের ব্যাধি আমাদের দেশে আনিয়া তাহাকে পোষণ করি কেন? সমস্তটাই যে আমরা আনিয়াছি, আমি এমন কথা বলি না, ইহার কতকটা যে ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, সে কথা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ইহার অনেকটা যে আমরা মোহাবিষ্ট হইয়া আপনারা আনিয়াছি, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা আহারে-ব্যবহারে, আচারে-বিচারে, ভাষায়-ভাবে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, সমস্ত জীবনক্ষেত্রে, প্রতি পদক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতি খেলা আমদানি করিয়াছি, জাতিসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, ভাবসঙ্কর, নিজেদের প্রাণ, রক্তকেও সঙ্কর করিয়া প্রাণে প্রাণে ফেরঙ্গ হইতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের প্রকৃত জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতি Industrialismএর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সাবধান, এখনও সময় আছে, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সে বাণী তখন শুনি নাই, এখন শোনা ও বোঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি বলিয়াছেন :—

"আবার আমাদের দেশ ইংরাজী মুলুক হইয়া এই বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়েল

প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইংরেজজাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল ভাবিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে, দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল; দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাস্য এই, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে?*** কি ইংরেজী, কি বাঙ্গলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, স্পিচ, ডিবেট, লেক্‌চার, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্। টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে! ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূত, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক, টাকার ঝন্‌ঝনিতে ভারতবর্ষ পূরিয়া যাউক। মন? মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ! হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর, এই পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এই পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল, বাঙ্গলা সংবাদপত্র কাঁসীদার, শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগ-বলি। এই পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক, তবে আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি, আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া বঞ্চনাবিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি। বল হর হর বম্ বম্! বাজা ভাই ঢাক-ঢোল, ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসীদার ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন।”

এই Industrialism-এর যজ্ঞে শুধু হৃদয় নহে, এই নবজাগরিত বাঙ্গালী

জাতির যে আত্মা, তাহাই ছাগবলি, আমাদের মরিবার ইহাই প্রশস্ত পথ, আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাকে বর্জ্জন করিতেই হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতি Industrialism নহে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম সে রীতি, সে পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছে। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে মানিয়া চলিলে সে পদ্ধতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে চিরকালই চাষা তাহার কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ারী করিয়া লইত। তাহার লজ্জা নিবারণের জন্য ম্যান্‌চেষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়াও চাষাদের ঘরে ঘরে অনেক কুটীর-শিল্পের চলন ছিল, সুতরাং এই কুটীর-শিল্প-পণ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা এত ব্যাধি-পীড়িত যে, কৃষিকার্য্য ছাড়া আর কোন কাজই করিতে পারে না। কুটীরশিল্পজাত যে পণ্য, তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গলায় ঢাকা, টাঙ্গাইল, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর ও আরও অনেক স্থানে কাপড় প্রস্তুত হইত। এখনও যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু প্রায় মরিয়া আসিয়াছে। তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে কি এখন এমন তুলা আজিও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফসল হয় না, যাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জা নিবারণের জন্য তৈয়ারী হইতে পারে? এখনও ত আমরা উপবীতের সূতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করি, সে সূতা যেমন মোটা হয়, তেমনি সরুও ত হয়। যে ভাবে পূর্ব্বে আমরা কাপড় ও সূতা তৈয়ারী করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনই ভাবে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করি না? আমাদের গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্বে যেমন সংসারের কাজ ও ক্ষেতের কাজ সারিয়া আপনাদের লজ্জানিবারণের পরিধেয় বসন নিজেরাই তৈয়ারী করিয়া লইতাম, তেমনই করিয়া আবার করিতে হইবে। ম্যান্‌চেষ্টারের মিহি বিলাতি ধুতি আর নানাপ্রকারের মাছ-পাড়, বাগান-পাড় যাহা ঢাকার তাঁতির হাতে বুনা হইত, তাহারই নকলে ছাপা কাপড় পরিতেছি ও পরাইতেছি। কাঁসা-পিত্তলের বাসন যাহা মুরশিদাবাদ, খাগড়া, ঢাকা, এমন কি, কলিকাতার কাঁসারি-

পাড়ায়ও তৈয়ারী হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে বিলাতি এনামেলের বাসন আর নানাপ্রকারের ফুল লতাপাতা কাটা রঙ্গিন কাচের বাসন আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে কাগজ তৈয়ারী হইত, হাতীর দাঁতের অনেক রকম জিনিস তৈয়ারী হইত, সোনা-রূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈয়ারী করিতাম, দিশী রঙের ছোপান কাপড়ের যে শিল্প-ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক স্থানে ছিল, তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঝিনুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কাজ যাহা এক সময় আমাদের দেশের গর্ব্ব ছিল, আজ তাহা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, আমাদের চাষারা নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিত, কৃষিকার্য্য ত করিতই, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পের অনেক শিল্পপণ্য অবসর সময়ে প্রস্তুত করিত। যাহারা কৃষিকার্য্য করিত না, তাহারা অন্যান্য শিল্প-পণ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেশে ও জগতের হাটে হাটে বিক্রয় করিত। অবশ্য তখন আজকালকার মত কলকারখানার যে প্রতিযোগিতা, তাহা ছিল না। কারখানার উপরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা যে পারিব না, এ কথা নিশ্চিত। তবে আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে হইলে ও তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা বিলাতী Industrialism বর্জন করিব। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের পণ্য-সমূহের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া আমাদের উপায় স্থির করিতে হইবে।

প্রথম কথা, আমাদের বিলাস-বর্জ্জন। আমরা চাল বিগ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছি, যাহা বিগ্‌ড়াইয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে হইবে। সকল প্রকার আক্রমণ হইতে নিজেকে সম্ভ্রমের সহিত রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম্ম, আমাদের জীবনের সেই একমাত্র মূল সূত্র। এই বিলাস, এই অযাচিত অবসাদ, জড়তা যাহা আমাদের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটীরে পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে। মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জ্জনে যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে

এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষার ঘরে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে। এই সংযম আমাদের জীবনকে খর্ব্ব করিবার জন্য নয়, কাহারও ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিবার জন্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের সংবিৎকে জাগরণের পথে আনিয়া, সমাজ ও সংবিতের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিবার জন্য। এই সংযমে ব্যক্তিও বাঁচিবে এবং আমাদের বাঁচিয়া উঠা পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই সংযম ও বিলাস-বর্জ্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব। বাঙ্গালীর জীবন সর্ব্বদাই সহজ, সরল, তাহা কখনও বিচিত্র বিলাসের মধ্যে জটিল হইয়া উঠিতে পারে নাই, যখনই জটিল হইয়াছে, তখনই তাহার শক্তি হ্রাস হইয়াছে। আজ যদি বিলাতি সভ্যতার ফলে আমাদের সরল জীবনকে জটিল হইয়া উঠিতে দিই, তবে নিশ্চয় জানিও যে, আমাদের উন্নতির পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসিয়া জুটিবে। যে প্রতিযোগিতায় আমরা অসমর্থ, সেই প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে এবং তাহাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে।

তার পরেই আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোথায় কোথায় কি কি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত, সেই সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেই সব পণ্যশিল্পের আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল চেষ্টার যে ভিত্তি অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ও সহরের স্বাস্থ্য, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, যেমন করিয়াই হউক, আমাদের সেই পানীয় জলেরই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় Industrialism-কে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ-শরীরে বারো মাস পরিশ্রম

করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই জন্য জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।

এই ত আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন ও লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিবার উপায় কি, অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমরা করিব, না গবর্ণমেণ্ট করিবে? ইহা করা উচিত, উহা করা উচিত বলিলেই ত কাজটা আপনা আপনি হইয়া উঠে না, এই কাজের ভার কে লইবে, সেই কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা

যেমন সব বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস ও স্বভাব-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলেও সেই দৃষ্টি আবশ্যক। শিক্ষার মূল কথাটি কি? মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসংবিৎ, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য। এই অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন প্রাণের পরতে পরতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, ধর্ম্ম তাহাকে আশ্রয় করে, প্রেম তাহাকে আলিঙ্গন করে এবং মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হইয়া উঠে। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে বিকাশ করাই শিক্ষার বিশিষ্ট কার্য্য। এই শিক্ষাই বাঙ্গলার মাটির দান, তাহার প্রাণের বাণী। এই শিক্ষার কার্য্য পুরাকালে আমাদিগের দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত, গুরুর গৃহে সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে, পল্লীতে পল্লীতে যাত্রা-গানে কবি-গানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবত-পাঠে, রামায়ণ-গানে, চণ্ডীর-গানে, ধর্ম্মঠাকুরের কথায়, হরিসভার সংকীর্ত্তনে, মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনে—এইরূপ নানা প্রকারে আমাদের দেশে সরল উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইত। দেশের বড় বড় টোলে, বিক্রমপুরে, নবদ্বীপে, কাশীতে, সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে আমাদের দেশের সেই সরল শিক্ষাই আরও গভীরভাবে প্রচারিত হইত। যে দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে—

"মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

এই বলিয়া গান ধরে, যে দেশের মাঝিরা দাঁড় টানিতে টানিতে—

"মন মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

বলিয়া তান তোলে; যে দেশের মেয়েরা—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার তলে ঠেকাই মাথা
শুন তুলসী প্রাণের কথা।

তুলসী তোমায় করি নতি
রেখ ধরম আমার প্রতি
তোমার তলে দিলাম আলো
পরকালে রেখো ভাল।"

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তুলসীতলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে, যে দেশে পণ্যব্যবসায়ী হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া পার হইতে হইতে—"দিন ত গেল সন্ধ্যে হ'ল
হরি পার কর আমারে"
বলিয়া গান গায়; যে দেশের বিবাহের অনুষ্ঠানে, গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—

"ওঁ ঈশে একপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব"

ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত পদনিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও, যার সপ্তম পদক্ষেপে—

"ওঁ সখ্যে সপ্তপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব।"

আমার সহিত সখ্যবন্ধন কর ও আমার অনুব্রতা হও—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রি দদাতু নৌ॥"

বলিয়া গৃহকে, গার্হস্থ্য আশ্রমকে, গৃহধর্ম্মকে সকল জীবনের সঙ্গে, সকল কর্ম্মের সঙ্গে ভগবানকে গাঁথিয়া লও; যে দেশের তর্পণের শেষ কথা—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"

যে দেশে সকল কর্ম্মে ও সকল কর্ম্ম শেষে প্রাণ-মন খুলিয়া "বিষ্ণুপ্রীতি-কামনায়ৈ" বলিয়া অঞ্জলি দান করিতে হয়; যে দেশের মাটিতে বিশ্বরাজ্যের, প্রাণরাজ্যের সকল রূপ, সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া, সকল জ্ঞান-সমুদ্র শোষণ করিয়াও ভগবৎপ্রেম ও করুণায় নিজেকে ডুবাইয়া, মহাপুরুষ ভোগের বীরত্বে, ত্যাগের বীরত্বে তারস্বরে বলিয়া উঠেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ কি এবং কি রকম সহজ সরলভাবে সেই শিক্ষার বিস্তার হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা সেই একই কারণে সহজ সরল উপায় ছাড়িয়া

দিয়া, শিক্ষা-দীক্ষাকে জটিল ও দুরূহ করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমাদের দেশে যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলে, তাহা বিস্তার করিবার জন্য ইউনিভারসিটির একটা বিরাট স্তম্ভ খাড়া করিয়াছি। রামমোহন যে ইংরাজি ভাষার শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষাবিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়েছিলেন, তাহা হয় ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী-নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলা ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্ত কথাগুলা তোতার মত আওড়াইয়া যাই এবং সেই কথার ঝুড়ি বোঝাই করিয়া মাথায় করিয়া বেড়াই। কিন্তু কথা এক জিনিস, আর প্রকৃত জ্ঞান আর এক জিনিস—এই কথাটি আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়া-মায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তাহারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথিসেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমাদের যে স্বভাবজাত শিক্ষায় মানুষকে মাটির মানুষ করে, সে শিক্ষা তাহাদের আছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নব-জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সব দিকে চোখ রাখিয়া যে উচ্চশিক্ষা, তাহাই প্রকৃতপক্ষে উচ্চ। আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই, তাহা একটা ধারকরা জিনিস, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাবধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুধু তাহাই নহে, এই যে একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে, ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন, এত রকম আড়ম্বরের মধ্যে সে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়। দেশে টাকা নাই—ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে,

সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা। এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কষিতাম, কলেজে পর্য্যন্ত সেই কাগজেই আমাদের কাজ চলিত। এখন স্কুলের নিম্ন-শ্রেণী হইতে রুল-করা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে নাকি লেখাপড়া হয় না! যে বিলাসকে বর্জ্জন করাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়, এই উচ্চশিক্ষা-প্রণালী ও ব্যবস্থা সেই বিলাসকে বাড়াইয়া দিতেছে। বড় বড় কলেজের বোর্ডিংএর জন্য খুব বড় বড় বাড়ীর আবশ্যক। এই সব দ্বিতল বাড়ীতে থাকা যাহাদের অভ্যাস হইতেছে, তাহারা কি আর তাহাদের নিজ নিজ পল্লীগ্রামের কুটীরে গিয়া থাকিতে পারিবে? এই যে শিক্ষা-বিস্তারের উপায়, ইহা ত আমাদের দেশের উপায় নয়, তবে কেন আমরা ইহার বিপক্ষে আন্দোলন করি না! লাভ ত এইটুকু মাত্র যে, বিলাতের ফ্যাক্টরিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের এই ইউনিভারসিটি-ফ্যাক্টরিতে বি এ, এম এ, পি এচ্ ডি, পি আর এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারী হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না। শিক্ষা-দীক্ষা যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসংবিৎকে জনমের তরে বিসর্জ্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী, সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয় আর বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই বলিতেছিলাম ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এত ধনব্যয় কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে বাঙ্গলা পড়া হইত না, এখন হয়, এই লইয়া সময় সময় আমরা অহঙ্কার করি। বাঙ্গলা ভাষাকে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সমস্ত বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত। শুনিয়াছি, এই চেষ্টার মূলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে এ বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্য দেশের ও দশের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু আমাদের ভাষাকে কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে? আমি শুনিয়াছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলা কবিতা পড়ান হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কবিতার কোন বই পাঠ্য-পুস্তক হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি, এই নিয়মের উদ্দেশ্য শুধু বাঙ্গলা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। একথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গলা ভাষার যে অশেষ

সম্পদ, তাহাতে কি বাঙ্গলা ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গলা ভাষা কি শুধু একটা রীতির বিষয়? বাঙ্গলা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গলা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিও, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।

আমি আজ বাঙ্গলার মহাসভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্ত্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া না দিতে পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভাবধর্ম্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা, সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া দিতে না পারিলে ও এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজসাধ্য করিয়া না তুলিতে পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

তার পর, যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বলি, তাহার কথা। কেহ কেহ বলেন, জোর করিয়া আমাদের দেশের সকলকেই ক, খ আর এ, বি, সি, ডি, পড়াইতে হইবে, না করিলে তাহারা মানুষ হইবে না। এই কথা কি কেহ তলাইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন? না অন্যান্য দেশে আছে বলিয়াই আমাদের দেশে চালাইতে হইবে? আমাদের দেশের চাষারা যে মানুষ, আমাদের চেয়ে তাহাদের মনুষ্যত্ব কোন রকমেই যে কম নয়। আমাদের ইউনিভার্সিটি যেমন একটা বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অশেষ ব্যয়সাধ্য বিরাট কলের কারখানা হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নশিক্ষার জন্যও ঠিক ঐরূপ একটি কারখানা তৈয়ারী করিতে হইবে? ইহার উপরে কি আবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হইবে? আমি স্বীকার করি যে, আমাদিগের চাষাদের লেখা-পড়া শিখান উচিত; কিন্তু দোহাই তোমাদের, তাহাদের আবার কারখানার ভিতরে জুড়িয়া দিও না। আমাদের চাষারা সহজ জ্ঞানে ও অনেক দিনকার সাধনা বলে সভ্য। তাহাদের ক, খ, কি এ, বি, সি, শিখান এমন একটা কঠিন ব্যাপার নহে। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। তাহার জন্য অনেকগুলা স্কুলের দরকার নাই। অনেকগুলা মাষ্টারের দরকার হইবে না, অনেকগুলা বাঙ্গলা ইংরাজী কেতাবের দরকার হইবে না, রুলকরা কাগজের

বাঁধান খাতারও আবশ্যক হইবে না। ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলারও আবশ্যক নাই। আমাদের গ্রামে গ্রামে যে সকল পুরাতন প্রথা ছিল, সেই সব পুরাতন জিনিসগুলা আবার চালাইয়া দেও। তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে দুই একটা মোড়লের বাড়ীতে দুই একটা নৈশবিদ্যালয় স্থাপন কর। তাহা হইলেই আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক, সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে। বাঙ্গলার মাটিতে, বাঙ্গলার ভাষায় যে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে শিক্ষা বাঙ্গালী তাহার স্বভাবগুণে সহজেই আয়ত্ত করে সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফল কথা, উচ্চশিক্ষাই হউক, কি নিম্নশিক্ষাই হউক, সকল রকমের শিক্ষাকেই বাঙ্গালী জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর শিক্ষার আদর্শ কি—সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষাকে শুধু কথার ব্যাপার না করিয়া তাহাকে যথার্থ করিয়া তুলিতে হইবে। ধার-করা বিজ্ঞানের অহঙ্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চায় তাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের জাতি স্বভাবধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই শিক্ষাকে সার্ব্বভৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে।

এই ত উপায়। কিন্তু ইহা সাধিত হইবে কিরূপে? এ কার্য্য আমাদেরই করিতে হইবে কি গবর্ণমেণ্টের করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি।

কাজের তালিকা ত শেষ হইল, এখন কি উপায়ে এই সব কাজ হাতে করিয়া করিতে হইবে, তাহারই বিচার করিব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলিয়া রাখি, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেন এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাজই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চ-শিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্ম্মের অভিমান, আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস, প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্য্যকে সার্থক করিতে চাই। যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে? আমরা দেশের বাবুরা প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত তাই আমাদের এত শিক্ষার

অভিমান। আমরা গেঁয়ে অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক হইয়া কাজ করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্ব্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমাণিত বোধ করে। আবার আর এক দল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা বহুদিনের বসতবাটী ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাহারা প্রাণে প্রাণে জানে যে, তাহারা নিতান্তই গরীব; কিন্তু তাহারা ত আর লাঙ্গল লইয়া চাষ করে না, তাহারা যে মাসান্তে মাহিয়ানার টাকা লইয়া পকেট ঝনঝন করাইতে করাইতে বাড়ী ফেরে। সহরে যিনি বাবু, পল্লীগ্রামে তাঁর একটু সম্পত্তি আছে; যাহার আয় বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা সেইখানে তিনি ভুঁইয়া। যিনি সহরে বাবু ও পল্লীগ্রামে ভুঁইয়া, তিনি যদি চাষাকে ডাকিয়া একসঙ্গে কাজ করেন, তাঁহার মান থাকে কি করিয়া? তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে 'শিক্ষিত' আর 'অশিক্ষিত', এই যে 'ধনী', অথবা টাকা থাকিয়াও টাকার 'অভিমানী' আর বাস্তবিকই যাহারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে, তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না—তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এত বড়াই। এখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আলোচনা কমই করে, কেরাণীগিরি করে, ওকালতি করে, ব্যারিষ্টারি করে, জজও হয়, সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করে, জুতার দোকান দেয় ও ভাটিখানার মালিক হয়, 'অশ্বিণ ছ্যাদে' বলিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ায়। মন্ত্র পড়াইবার সময় কার্ত্তিকে মাসি বলিতে শ্রীমান কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতৃষসা বোঝে, বিসর্গ অনুস্বারে পূর্ণ ভূরি ভূরি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানে না,—এ হেন যে ব্রাহ্মণ, ইহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? এখন বৈদ্য-কায়স্থও তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যের যে গণ্ডী, তাহার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ব্রাহ্মণেরা যে সব কার্য্য করে, অশুদ্ধ মন্ত্র পড়ান ছাড়া, তাহারাও সেই সব কার্য্যই করে। তবে বৈদ্য ও কায়স্থের এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? আমি ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে কার্য্যগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই নাই। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম, তাহা বাঙ্গলায় কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। তাই এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। আমি এ ক্ষেত্রে

কোন সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চাই না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, কি বর্ণাশ্রম আবার নূতন করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক অবস্থার অনুযায়ী করিয়া গঠিত করা উচিত কিনা, তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তুল। কিন্তু তাহার আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে সেই প্রাণ-হীন জিনিসটাকে টানাটানি করিয়া, মিথ্যা অহঙ্কারের ও অভিমানের সৃষ্টি কর কেন? এখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান এই কার্য্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গলার চারি কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, যাহারা দেশের সার বস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গলার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরলপ্রাণে মর্ম্মে-মর্ম্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়। মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার-মোহে, আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায্য-ভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গলা দেশের একাধারে রক্ত, মাংস, প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা—যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান, সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি। এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! সাবধান! ওঠ!

জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর! ঐ যে বাঙ্গালী কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও। বল, এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কাজ—এ যে তোমার কাজ। এ যে মায়ের কাজ। একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে, সকলেই আসিবে, দেখিবে, সকল কার্য্যই সার্থক হইবে! আমি আবার বলি, উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—

—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে, কিন্তু কি প্রণালীতে কাজ করিব? আমাদের সরল জীবন অনেকটা জটিল হইয়াছে। তাই নিয়ম চাই—প্রণালী চাই। আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমস্ত বাঙ্গলা দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হইবে, সে ভাগ নূতন করিয়া করিতে হইবে না। গবর্নমেণ্ট আমাদের দেশটাকে জেলায় জেলায় ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। এই প্রত্যেক জেলায় একই রকম নিয়ম, একই রকম প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে। আমি একটি জেলা আমার মনে রাখিয়া এই কার্য্যপ্রণালীর কথা বিচার করিতেছি। আপনারা মনে রাখিবেন, এই একই কার্য্যপ্রণালী সমস্ত জেলাতেই চালাইতে হইবে। প্রত্যেক জেলাতেই অনেকগুলি গ্রাম আছে। জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে, কতকগুলি গ্রাম লইয়া, এক একটি পল্লী বা গ্রাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বছরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের

উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা এই সকল গ্রামে আমাদের দেশের যে সকল যাত্রা, গান ইত্যাদির কথা বলিয়াছি, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন। যে নৈশ-বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি, তাহা তাঁহারাই স্থাপন করিবেন। চাষাকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষারা যাহাতে বারোমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য কি কি শিল্প-পণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লীসমাজ প্রতিপল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষামাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লীসমাজে সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লীসমাজ চাষাদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিবিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে অন্য নালিশ বা আর্জ্জী গৃহীত হইবে না।

এইরূপে প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজ পাঁচ জন পঞ্চায়েত ব্যতীত, জেলা-সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটি পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলা সমাজ—

১। সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

২। সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইবে।

৩। কৃষিকার্য্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

৪। সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলা-সমিতির অধীনে থাকিবে।

৫। জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

৬। গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকিদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকিদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলা-সমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

৭। জেলার সাধারণ পুলিসের ভার জেলা-সমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, তাহা জেলা-সমাজের হাতে থাকিবে না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে হাইকোর্টের অধীনে থাকিবে।

(৯) এই জেলা-সমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুই শত হইতে পাঁচ শত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটি একটি করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলা-সমাজের এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলা-সমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলা-সমাজ-সমূহকে বঙ্গীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহাতে আরও অনেক জিনিস সন্নিবেশিত করিতে হইবে। আমি শুধু মোটা মোটা কথা-গুলির উল্লেখ করিয়াছি।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে, আমাদের সিদ্ধিলাভ করা একেবারে অসম্ভব। আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, ইহাই একমাত্র উপকরণ। আমি ইহাকে Home Rule বলিতে চাহি না, স্বরাজ বলিতে চাহি না, স্বায়ত্তশাসন বলিতে চাহি না। আমাদের দেশে আপনার কাজ আপনি করিয়া লইবার যে পুরাতন প্রথা ছিল, আমি সেই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই এই কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আপামর সাধারণের আপনার আবশ্যকীয় কাজ আপনি করিয়া লইবার কৃতিত্ব বা ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে যাহাদের অশিক্ষিত বলিয়া এতাবৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জীবনের মধ্যে একটা বড় সভ্যতা ও সাধনা আছে। আমাদের চাষারা যতই মূর্খ নিরক্ষর হউক না কেন, তাহারা আপনাদের ভাল-মন্দ বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর যদি কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যবস্থা ত এই কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেই আছে।

আমি যে বলিলাম যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া এই কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি। সেই কথাটি আরও একটু বুঝাইয়া বলি। আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

আমি যে পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজের কথা বলিয়াছি, তাহা আগেও ছিল। আমি যে নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি তাহা আগে হয় ত অব্যক্ত ছিল, আমি তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই। আগে আমাদের জীবন আরও অনেক বেশী সবল ছিল, যে পঞ্চায়েতের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা পুরাকালে গ্রাম্য-সমাজের মধ্যে যেন আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লীসমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচজনেই হইতেন, যাঁহাদের উপর পল্লীসমাজের দৃষ্টি সহজভাবেই আপনা আপনিই পড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যে প্রীতি জাগরিত ছিল, তাহা কোন কথা না বলিয়া, কোন আড়ম্বর না করিয়া যেন নিঃশব্দে অলক্ষিতে সেই পাঁচজনকে দেখাইয়া দিতেন। সেই পাঁচজন পঞ্চায়েতের অধিকার, স্বভাবগুণে সহজভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লীসমাজবাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। আমি যে সব কার্য্যের কথা বলিয়াছি, বিনা নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত সেই পঞ্চায়েত সেই সব কার্য্যই করিত। জমিদারের কাছে আবেদন করিয়া পুকুর কাটাইয়া সংস্কার করিয়া লইত। সহজভাবে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, পল্লীসমাজভুক্ত গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য মিষ্ট কথা বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া করাইয়া লইত। পল্লীসমাজের কোন চেষ্টা, কোন কার্য্য তাহাদের অমতে, কি তাহাদের সাহায্য না লইয়া হইতে পারিত না।

এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন, ইহাও গ্রামবাসীদের বাক্যহীন মতের উপরই নির্ভর করিত। আমরা এখনও কথায় কথায় বলি, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল,' এই কথার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পল্লীসমাজ যাহাকে না মানিবে, সে মোড়ল হইতে পারিবে না। এই যে তখনকার 'মানা' ও এখনকার আমার প্রস্তাবিত 'নির্ব্বাচন,' এই দুইয়ের মধ্যে কোন স্বাভাবিক পার্থক্য বা বিরোধ আছে কি? আমি তাই বলিতেছিলাম, এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন আমাদের দেশে চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল, আমি আজ তাহাকে ব্যক্ত

করিয়া তুলিতে চাই। ইহা একেবারেই বিদেশী নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত নিজস্ব সামগ্রী।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই কেন?—যে পল্লীসমাজ ছিল, তাহাকে ছাড়িয়া জেলা-সমাজ করিতে চাই কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমাদের জীবন যে পরিমাণে সহজ সরল ছিল, সে পরিমাণে আর সহজ সরল নাই। অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সঙ্গে জেলার একটা স্বাভাবিক যোগ হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নানাপ্রকার কার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামের লোক অনেকে জেলার সবডিবিসনে, সহরে ও রাজধানীতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই পুরাকালে যেখানে পল্লীসমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন জেলার রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লীসমাজগুলি এই কেন্দ্র-সমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের হস্তে এত ক্ষমতা দিবেন কেন?—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আমি ত বেশী ক্ষমতার দাবী করি নাই; আমাদের নিজের ঘরের কাজ যদি না করিতে পারি, তবে আমরা কোন্ কাজে লাগিব? যদি তাঁহারা বলেন, আমরা এ কার্য্যের উপযুক্ত নই—তবে আমার উত্তর এই যে, তোমাদের অধীনে দেড়শ' বছর থাকিয়া, আমাদের এ ক্ষমতা যদি না জাগিয়া থাকে, তবে কি কোন কালে এই ক্ষমতা জাগিবার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি ত কোন নূতন ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, যে ক্ষমতা আমাদের চিরকাল ছিল, তাহাকে একটু বাড়াইয়া, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনুযায়ী করিয়া, সেই ক্ষমতাই আমি বাঙ্গলার মহাসভায় দাবী করিতেছি। ইহা ন্যায্য, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত। কোন্ মুখে এখন তোমরা বলিবে যে, আমরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত? আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার পরিবর্ত্তন বা পরিসর এই ক্ষেত্রে চাহিতেছি না। সে দাবী যখন করতে হইবে, তখন করিব। আমি সমস্ত বঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছি না। বঙ্গের ব্যবস্থাপকসভা ও কার্য্যনির্বাহক-সভা তোমরা এখন যে রকমে চালাইতেছ, সেই রকমেই চালাও। আমি আজ সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না, আমি শুধু এই চাহিতেছি, আমাদের নিতান্ত ঘরকন্নার কাজ, সে কাজ করিবার অধিকার না দিলে আর চলে না। তোমাদের মুখেই শুনি যে আমাদের ক্রমবিকাশের

উপায় তোমরা করিয়া দিবে। সে কথা যদি সত্য হয়, আজ তাহার প্রমাণ দাও। আমরা Zuluও নই Hottentotও নই, আমরা সভ্য জাতি। যে কাজ আমরা চিরকাল আপনা আপনি করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা একটু বাড়াইয়া ক'রিতে পারিব না কেন?

আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের যিনি রাজা, এই ক্ষমতাটুকু আমাদের হস্তে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে বা হইতে পারে। তিনি আমাদের দেশে আসিয়া যে আশার বাণী বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা আশ্বাসিত হইয়া আছি। আমাদের এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে, আমাদের যে সব দিকে সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, হিসাব করিয়া আমরা আজ এই দাবী করিতেছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, বিলাতের পার্লামেণ্টের মহাসভায় ইহাতে কোন আপত্তি হইবে বা হইতে পারে। রাজার আপত্তি নাই, পার্লমেণ্টের আপত্তি হইবে না, কিন্তু এ দেশে যাঁহারা আমাদের রাজার গোমস্তা, যাঁহারা এ দেশের রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। যেটুকু ক্ষমতা আমরা চাহিতেছি, সেইটুকু ক্ষমতা এখন যে তাঁহাদের হাতে। মানুষের স্বভাবই এই যে নিজের ক্ষমতা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কি আপত্তি তাঁহারা তুলিবেন, আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সব বিষয়েই ওজর-আপত্তি তোলা সহজ এবং তর্কে সেই ওজর-আপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আরও সহজ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে এমন কোন ইংরাজ কি আছেন যিনি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবেন যে, আমরা বাস্তবিকই এইটুকু ক্ষমতারও অধিকারী নহি?

তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন—আমি দুই একখানা ইংরাজী কাগজে এই মর্ম্মের কথা পড়িয়াছি, যে দেশে এনার্কিষ্ট অত্যাচারের এত প্রাদুর্ভাব, সে দেশে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিলে তাহার অপব্যবহার হইবে। এই কথা শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রথমে সত্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এই কথার বাস্তবিক কোন অর্থ নাই। প্রথমেই আমাকে বলিতে হয় যে, যাহাদের এনার্কিষ্ট বল তাহারা বস্তুতঃপক্ষে এনার্কিষ্ট নহে। তাহারা রাজদ্রোহী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা আইনের কাছে অপরাধী, সুতরাং দেশের রাজশক্তিকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহাদের শাসন ও দণ্ড অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কি কারণে এই যুবকবৃন্দ রাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে,

তাহা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে এই শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইবে না। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় যে, আমাদের দেশে এমন কোন এনার্কিষ্ট নাই, যে সত্য সত্যই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিতে চাহে। তবে তাহারা কেন রাজদ্রোহী হইল? এই প্রশ্নের উত্তর কি ইহাই নহে যে, স্বদেশী আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্য কাজে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়াছে? অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহারা যথার্থ কার্য্য করিবার যে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম, অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদিগের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্য কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? এই যে একটা প্রবল কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা, ইহা স্থায়িভাবে দেশের কোন্ কাজে লাগিতেছে? আমার মনে হয়, এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যেরই ফল। আমি আগেই বলিয়াছি যে, ইহাদের শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে রাজত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধের যে মূলীভূত কারণ, তাহাও দূর করিতে হইবে। তাহাদের মনের এই বিশ্বাস যে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের স্থায়ীভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিবেন না, সেই বিশ্বাস একেবারে দূর করিতে না পারিলে এই যে রাজদ্রোহের সূচনা, তাহাকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। তাহাদের গালাগালি দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু গালাগালি দিলে ও দণ্ড দিলেই ত ব্যাধির আরোগ্য হয় না।

যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আরও কঠিন শাসন না হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইবে না, তবে যাহারা এই ব্যাধিগ্রস্ত তাহাদেরই শাসন কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে দেশের কাজে লাগাইয়া এই ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা কর। দেশে রাজদ্রোহের সূচনা হইয়াছে বলিয়া দেশের লোককে দেশের কাজ করিতে না দিলে, সেই রাজদ্রোহেরই পথ প্রশস্ত হইবে। তাহাতে

তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। কিন্তু তোমাদের যতটা ক্ষতি না হউক, আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ—এই নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজি এই সমগ্র বাঙ্গলার মহাসভায় সভাপতিস্বরূপ আমি যুক্তকরে তোমাদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আমাদের দেশের গণ্যমান্য লোক—যাহাদের উপর দেশবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তি আছে, এমন কয়েকজনকে লইয়া একটা ছোট কমিটি করিয়া দেও। তাঁহারা দেশের এই রাজদ্রোহ-সূচনার যে যথার্থ কারণ, তাহা অনুসন্ধান করুন এবং এই রাজদ্রোহিতা দূর করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করুন। আমার বিশ্বাস হয় না যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী এমন কেহ আছেন, যিনি একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে আমার মত খণ্ডন করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিতে পারে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, রাজদ্রোহিতার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের অনেক লোকেরই সহানুভূতি আছে। এ কথাও তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। এই রাজদ্রোহী যুবকদের দুইটা দিক্ আছে। আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য ও দেশের কার্য্য নিজের হাতে করিবার জন্য তাহাদের যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই তাহাদের একটা দিক্। আমাদের বাঙ্গলার জনসাধারণের সেই দিক্ দিয়াও সেই কারণে তাহাদের সহিত সহানুভূতি আছে। আবার, দেশের কাজে লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া পথভ্রান্ত হইয়া যে কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত হইতেছে এবং শত প্রকারে রাজার কাছে এবং দেশের কাছে যে সব অপরাধে তাহারা অপরাধী হইতেছে, সেই দিক্ দিয়া তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। আমাদের রাজপুরুষদের এই ভুল বুঝিবার যে কারণ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মনে হইতে পারে, একটু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা আরও বেশী মনে হইতে পারে যে, এই সব রাজদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের একটা যোগ আছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে একটা সহানুভূতি আছে। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তলাইয়া দেখিলেই ভুল ধরা পড়িবে। এই ভুল বিশ্বাসের কারণ কি? ইহার বাস্তবিক কারণ কি ইহা নহে যে, আমাদের দেশের লোকই বিশ্বাস করেন যে, এই সব যুবকদিগের প্রাণ আছে, দেশের প্রতি একটা প্রাণস্পর্শী মমতা আছে এবং দেশের কাজ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে? এবং সেই কারণেই

তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের একেবারে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের মুখ ফিরাইয়া, মতি-গতি বদলাইয়া যথার্থ দেশের কাজে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। আমি যাহা বলিলাম, হয় ত আমাদের অনেকেই তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু অযথা তর্ক না করিয়া যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহারা রাজদ্রোহী, তাহাদের মতি-গতি ফিরাইয়া তাহাদের যে দেশবাৎসল্য, তাহা দেশের কাজে লাগাইয়া দিবার যে বাসনা, আকাঙ্খা, তাহা রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সহানুভূতিশীল নহে, তাহা রাজদ্রোহকে কোন মতেই সমর্থ করে না, বরং তাহা যথার্থ রাজশক্তির সহায় এবং রাজদ্রোহের স্বভাববিরুদ্ধ। এই কথা তলাইয়া না বোঝাই আমাদের রাজপুরুষদিগের ভুল এবং এই সত্য কথা খুলিয়া বলিয়া আমাদের রাজপুরুষদের সাহায্য না করাই আমাদের ভুল। যাহা সত্য, তাহা স্বীকার কবিবার সাহস যদি আমাদের না থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে ব্রত, তাহা উদ্‌যাপন করিব ?

আর একটা তর্ক উঠিতে পারে, তাহারও বিচার আবশ্যক। আমাদের রাজপুরুষেরা ইহাও বলিতে পারেন যে, হিন্দু-মুসলমানে ভাব নাই, হিন্দুদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে প্রীতি নাই, এই অবস্থায় সমস্ত হিন্দু ও হিন্দু-মুসলমানে একত্র হইয়া একযোগে কাজ করা অসম্ভব। *হিন্দুদের* মধ্যে বর্ণভেদজনিত যে বাদ-বিসংবাদ, তাহা একত্রে কার্য্য না করিতে পারিয়া আরও বাড়িয়া যাইতেছে। যে কাজ সকলের আবশ্যকীয় ও সকলের মঙ্গলপ্রদ, সেই কাজ একত্র করাই মিলনের প্রশস্ত উপায়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারে যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোন অসদ্ভাব নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ত একেবারেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকজন স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনায় একটা অসদ্ভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র ; সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রামের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। আমি দেখিয়াছি, মুসলমান ও হিন্দু চাষাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দাদা, চাচা, মামু বলিয়া তাহারা পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে বান্ধিয়া লইয়াছে। তাহারা একই রকম কাজ করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা একই রকম। নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্ম্মের একটা পার্থক্য শুধু বাহিরের দিকে—তাহাদের জাতিগত যে ঐক্য, তাহার অন্তরায় হয় নাই। সুতরাং এই যে বর্ণগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য, তাহা আমাদের একত্র হইয়া কাজ করিবার কোন বাধা

জন্মাইবে না। বরং একত্র হইয়া কাজ করিলেই বাহ্যিক পার্থক্য ক্রমে হ্রাস হইয়া আন্তরিক মিলন আরও সত্য, আরও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

আর একটি আপত্তির কথা আমি শুনিয়াছি। সেটা এই। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন, যে কার্য্যপ্রণালীর কথা আমি বলিয়াছি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক করিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কি সবডিভিসনের হাকিমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। সে কথা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। হয় ত এই সব রাজকর্ম্মচারীদের আমাদের দেশের কাজের সঙ্গে যোগ থাকিলে, এই কাজগুলা বর্ত্তমানে—শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—আরও ভাল করিয়া সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে দাবী করিতেছি, তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, আমরা চিরকাল নিজেদের কার্য্য নিজেরাই করিয়াছি এবং সেই একত্র কার্য্য করিবার যে স্বাভাবিক অভ্যাস, তাহা আবার জাগরিত করিতে চাই। এই সব ছোট-খাট কাজে তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আঠার মত লাগিয়া থাক, তবে আমাদের কোন কার্য্যেরই স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইবে না এবং নিজের কাজ নিজে করিবার যে মর্য্যাদা, তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব। কাজ একটু খারাপ হওয়া ভাল, কিন্তু নিজের কাজ পরে করিয়া দিলে সব কাজই বিফল হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নিজের উপায় নিজে করিবার, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার একটা গৌরব আছে এবং তাহাতে যেমন ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইরূপ জাতীয় জীবনেও নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের কার্য্য নিজে করিলে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইলে তাহার স্বার্থকতা কোথায়? আমাদের মরণ-বাঁচন, শুভাশুভ, আমাদের নবজাগ্রত জাতির যে জীবন এই কার্য্য-প্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের যে দাবী, তাহা ন্যায়ের উপর; আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্ম, সকলের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই বারে বারে বলিয়াছ যে, আমাদের জীবনকে পুষ্ট করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট করিবার যে এই একমাত্র উপায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজি এই সামান্য দাবী পূরণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা আমাদের এই দাবী পূরণ না কর, তবে তোমাদের মুখের কথার উপর আর আস্থা রাখি কি করিয়া? আর তোমাদের কথার উপর যদি আমরা বিশ্বাসস্থাপন করিতেই না পারি, তবে আমরা বাঁচিয়া কি করিব?

এই যে আপনার কাজ আপনি করিবার অধিকার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে

আরও দুই একটা বড় বড় কথার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যে শুধু আমাদের ঘরকন্নার কাজ করিতে চাই, তাহা নহে। সমস্ত দেশরক্ষার যে ভার, তাহারও অংশ লইতে চাই। বোম্বাই, কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আমাদের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিবার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সেই কথা আমাদের দেশের সকলেরই মর্ম্মের কথা। আমাদের চোখ ফুটিয়াছে, তোমরাই চোখ ফুটাইবার সাহায্য করিয়াছ। এখন জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকল দেশেই দেশবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া দেশ-রক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্রধারণ করিবার যে অধিকার নাই, ইহাতে কি আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে বেদনা অনুভব করি না? অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আমাদের না দিলে এই যে নবজাগ্রত দেশবাৎসল্য, ইহার কি অপমান করা হয় না? এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করার কি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সকল দেশেই অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আছে। আমাদের থাকিবে না কেন? অস্ত্রধারণ সম্বন্ধে আইন রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু সেই আইন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে চালাইয়া দিও। তাহা না হইলে আমরা নিজেদের অপমানিত মনে করিব। সেই অপমানের উপর কোন সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। মেকলে যে আমাদিগকে অপমান করিয়া গিয়াছে, সে কথায় যে একদিন আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। তোমরা যে একদিন ঐ কথা বলিতে দিয়াছিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ, সে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই। তোমাদেরও নাই। এম্বুলেন্স কোর সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। সে দিন যে বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানীর সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলে, ভাবিয়া দেখিও, সে দিন বাঙ্গালীকে কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর ফেলিয়াছিলে। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে যাহাদিগকে কোন দিন অস্ত্রধারণ করিতে দেও নাই, যাহাদিগকে কোন প্রকারে সমরশিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা কর নাই, যাহাদের সৈনিকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া সকল সামরিক চেষ্টা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছিলে এবং যাহাদের মধ্যে এই অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া যে একটা ভূতের বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিলে, একদিন হঠাৎ সেই বাঙ্গালীকেই সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিলে! যদি আমরা সেই আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিতে না পারিতাম, তবে কি চিরকাল তোমরা বলিতে না যে, বাঙ্গালী

অনুপযুক্ত? তাহাদের অস্ত্রধারণের কোন অধিকার নাই, তাহাদের জন্য সৈনিক বিভাগে কোন স্থানই হইতে পারে না? আমরা ত তাহাই বুঝিলাম। অশেষ কষ্ট করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়া, ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিলাম। এই যে কঠিন পরীক্ষার ভিতর আমাদিগকে ফেলিয়াছিলে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। বাঙ্গালী প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও অধিকারী। এখন অস্ত্রধারণের অধিকার আমরা দাবী করিতে পারি। এখন জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সম-অধিকারে আমরা সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতে পারি। এই সৈনিক-বিভাগে দেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে একটা পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তুলিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংরাজ যে কমিশন পাইবে, বাঙ্গালী সে কমিশন পাইবে না কেন? লেফ্‌টানেণ্ট, ক্যাপ্‌টেন, করনেল্ হইবার ক্ষমতা শুধু ইংরাজের থাকিবে কেন, আমরা চিরকালই জমাদার হাবিলদার থাকিব কেন? মনে রাখিও, যে লালপল্টনের সাহায্যে তোমরা একদিন বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলে, সে লালপল্টন বাঙ্গালী। যদি যোগ্যতার কথা বল, আমি ত যোগ্যতার পরীক্ষা চাই। কিন্তু সেই পরীক্ষা সমভাবে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে করিতে হইবে। আমরা বিচারের প্রার্থী, পরীক্ষার প্রার্থী। আমরা অনুগ্রহের ভিখারী নহি।

এই যে সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিবার আমাদের এত আগ্রহ কেন, তাহা যদি জানিতে চাও, তবে খুলিয়া বলি। এই যে জাতিতে জাতিতে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষের মধ্যে যে কে শত্রু, কে মিত্র, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আজি যাহারা মিত্র, কালই তাহারা শত্রু হইয়া উঠিতে পারে। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জাপান তাহার পণ্যদ্রব্য দিয়া আমাদের দেশ ভরিয়া দিতেছে। দলে দলে জাপানী আসিয়া আমাদের সহরে বাস করিতেছে। এই যুদ্ধের ফলে তাহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কারও সর্ব্বনাশ কারও পৌষমাস। এই ভীষণ সময়ে জাপান যে আমাদের মিত্র, তাহা ত একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। জাপান ত জার্মাণীর শিষ্য। কে বলিতে পারে যে, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে আবার জাতির সংঘর্ষে নূতন করিয়া সমরানল প্রজ্জলিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, সেই সময়ে জাপান আমাদের শত্রু হইবে না? আবার যদি সমরানল প্রজ্জলিত হয়, কে জানে, রুশিয়া কোন্ দিকে থাকিবে? আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী

জাপানকে চায় না, জার্ম্মাণীকেও চায় না, রুশিয়াকেও চায় না। বাঙ্গালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার ভারের অংশ মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। তাই বাঙ্গালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,— তাই বাঙ্গালী সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

বাঙ্গালীর এই আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। কলিকাতাতে আজিকালি বাঙ্গালী বালকদের ভবিষ্যতে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহাকে পোষণ করা আমাদের ও আমাদের রাজ-পুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই Boy Scout Movement আমাদের স্কুলে স্কুলে সহরে সহরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে আমাদের বালকদিগকে ভবিষ্যতে সমরোপযোগী করিয়া তুলিবে, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রম-সহিষ্ণু করিবে, দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকারব্রত শিক্ষা দিবে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপক্ষে মানুষ করিয়া তুলিবে।

আমরা যে শুধু অধিকার চাহিতেছি, তাহা ত নহে। সেই অধিকারের জন্য যে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, আমরা ত তাহাতে কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালীকে সমরশিক্ষা দিবার জন্য এবং সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী দরিদ্র হইলেও যোগাইতে প্রস্তুত। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কেমন করিয়া অধিকারের দাবী করিব?

এই যে প্রস্তাবিত সমর-ঋণ, ইহা কি আমাদের স্বার্থত্যাগের সত্য প্রমাণ নহে? যে যাহা পারে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। যে যত পারে আরও সংগ্রহ করিয়া আনিবে। তোমরা ভাবিয়া দেখিও যে, শুধু অর্থের হিসাবে ইহাতে বাঙ্গালীর যথেষ্ট ক্ষতি। যে টাকা উঠিতেছে, তাহার অধিকাংশই ইংলণ্ডে কিংবা অন্য অন্য দেশে ব্যয়িত হইবে। ইহার খুব অল্প অংশই এ দেশের জনসাধারণের হাতে ফিরিয়া আসিবে। এই টাকার যে সুদ, তাহা আমাদের রাজস্ব হইতেই দিতে হইবে। সুতরাং শুধু অর্থের দিক দিয়া দেখিলে ইহাতে বাঙ্গালীর বিশেষ ক্ষতি। কিন্তু বাঙ্গালী ত কোন দিন কোন জিনিস শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখে নাই এবং দেখাও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করে না। শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে সব দিক্ দেখা হয় না। এই যে ইউরোপে ঘোর সমর চলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর সুখদুঃখ জড়িত নাই? এই সমরে ইংলণ্ডের জয়লাভের উপর কি বাঙ্গালীর আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে না?

এই সময়-ঋণে বাঙ্গালীর যাহা দেয়, তাহা যদি বাঙ্গালী সংগ্রহ করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিব? যেমন করিয়াই হউক, এই সময়-ঋণ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতেই হইবে। ইহাতে যে স্বার্থত্যাগের আবশ্যক, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। একথা অনেকবার বাঙ্গালীর কাছেও শুনিয়াছি; ইংরাজের কাছেও শুনিয়াছি। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া যে একটি বিপরীত সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে এবং সেই বাহিরের আঘাতেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নবপ্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং চিরকাল স্বীকার করিব। এ দেশে ইংরাজের আগমন যে বিধির বিধান, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এবং চিরদিনই করিব। ইংরাজের আগমন হইতে যে আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে ও হইবে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ও চিরকাল স্বীকার করিব। এই কারণে আমার যে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, তাহা আমার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক আছে, তাহা যেন ইংরাজ ভুলিয়া যায় না! এদেশে আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিয়া কি ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলা দেশে আসিবার আগে ইংরেজের যে স্থান ছিল, এখনও কি ঠিক সেই স্থান? এই দেশের ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে কি ইংরাজের অবস্থার শত সহস্র গুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানব সমাজে ইংরাজ যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গলার, সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোণ কারণ নাই? সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না কেন? এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা, তাহার প্রমাণ আজি চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি

আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোন অর্থ নাই।

তাই আজ তোমাদের কাছে আমার প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। যে কার্য্য করিবার অধিকার চাহিতেছি, তোমরা প্রাণে প্রাণে জান, সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। মনকে চোখ-ঠার দিও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। বৃথা তর্ক করিয়া সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিও না। আজি আমাদের জীবন-চাঞ্চল্যকে শান্ত কর। আমাদের এই নবজাগ্রত জীবনকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ কর। ঐ যে ইউরোপের সমর-ক্ষেত্রে চিতার আগুন জ্বলিতেছে, ঐ শ্মশান-ভস্মের উপর মিলন-মন্দির স্থাপন কর! হাত বাড়াইয়া আমাদের হাত ধর। তোমাদের ও আমাদের মিলন সত্য যথার্থ হইয়া উঠুক। তোমরাও ধন্য হও, আমরাও ধন্য হই এবং এই মিলনের যে যথার্থ বাণী, তাহা আপনাকে সার্থক করুক।

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ—সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্মসঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারসঙ্গত, আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত, জগতের ধর্ম্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস, আমরা সকলে সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, আমরা হিন্দু-মুসলমান, খৃস্টীয়ান সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।"—একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে! এস ভাই খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছে।

এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা, বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।

[১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণ]

বিক্রমপুরের কথা

আজ আমি দু'একটি কাজের কথা বলিতে চাই। আপনারা হয় ত অনেকে ভাবিতে পারেন, আমি নিজেই কাজের লোক নই—সুতরাং কাজের কথা বলিবার আমার ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই। যখন আপনারা আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন তখন আমারও মনে ওই কথা জাগিয়াছিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কাজের লোক না হইলেও অনেক কাজের কথা জানি। ব্যবসাক্ষেত্রে আজ ২৩ বৎসরের মধ্যে অনেক কাজের লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, এবং আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কি করিলে দেশের উপকার হয়, কি করিলে আমাদের বিক্রমপুর আবার সেই পুরাতন গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারে, এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি, এবং একেবারে যে চিন্তা করি নাই তাহাও নয়। তাই আজ আমার সকল ত্রুটি, সকল রকমের অক্ষমতা সত্ত্বেও আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদের কাছে দু' চারিটি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি।

প্রথম কথা বিক্রমপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে।

বিক্রমপুরের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি নাই সত্য—কিন্তু সে দোষ বিক্রমপুরের নয়, আমার নিজেরই। তবে যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখনই মনে করি, আমি বিক্রমপুরবাসী, তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায়—আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব, যাহা সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়; এই যে স্মৃতি, যাহা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত

আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে; এই ভাব ও এই স্মৃতিকে সর্ব্বদা জাগ্রত দেবতার মত আমাদের হৃদয়মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই দেবতাকে জাগ্রত করিতে হইলে তাহার সংস্কার আবশ্যক—আবার তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইতিহাস ইহার একমাত্র মন্ত্র। সে ধারা মাটির গর্ভে বালুর মধ্যে লুকাইয়া আছে—তাহাকে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। অনেকে হয় ত বলিবেন, এ ত কাজের কথা নয়। এখন যে কাজের সময় আসিয়াছে; অতীত গৌরব লইয়া কি আমরা ধুইয়া খাইব? কিন্তু ইতিহাস ব্যতীত কোন কর্ম্মই সার্থক হয় না। পুরাকালে নাবিকেরা যেমন আকাশে ধ্রুবতারা দেখিতে না পাইলে তাহাদের অর্ণবপোত ঠিক দিকে চালনা করিতে পারিতেন না, আমরাও ঠিক সেইরূপ। আমাদের যথার্থ ইতিহাস যাহা, তাহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে ঠিক দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না—দিকভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়া যাইব।

সমস্ত বাঙ্গলা দেশে একটা চিরন্তন বাণী আছে। বাঙ্গলা দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে অখণ্ড ইতিহাস তাহা সেই বাণীকেই চিরকাল ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে ও চিরকাল করিবে। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, সেই ইতিহাসের ধারা আমাদের সকলকেই স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। যেমন সমস্ত বাঙ্গলা দেশের একটা চিরন্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরে সেইরূপ একটা বাণী আছে। আমরা কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে চাই। সে বাণী শুধু আমাদেরই জন্যে। কর্ম্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সে বাণী বুঝা চাই—শুনা চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই। এই ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাদের দেশে অনেক চেষ্টা হইতেছে। এইখানে যোগেন্দ্র বাবু ও যতীন্দ্র বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা একাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এখনও আমরা সেই ইতিহাসের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে পারি নাই।

এই ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে চাই? শুধু গুটিকতক জমিদারের কাহিনী ও দু' একটি রাজার কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই।

প্রথমেই আমরা শুনিতে চাই বিক্রমপুর কোথায় ছিল। চীন পরিব্রাজকের যে সমতট-ভূমি, কোথায় তার আরম্ভ, কোথায় তার সীমানা। আমি কোন পরগণার কথা বলিতেছি না। সমস্ত বাঙ্গলা দেশের জীবনের মধ্যে যে

বিক্রমপুর একটা সত্য, জলন্ত, জাগ্রত জীবন-খণ্ড, আমি সেই বিক্রমপুরের কথা বলিতেছি। বিক্রমপুরের সে একটা বিশিষ্ট ভাব আছে, একটা স্বতন্ত্র প্রাণ আছে, যাহারা সেই ভাবে ও প্রাণে অনুপ্রাণিত, তাহাদের সকলের কথাই শুনিতে চাই। বিক্রমপুর সমাজের কথা শুনিতে চাই। বিক্রমপুরের গৌরব যাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিত, বিক্রমপুরের পাণ্ডিত্য যাহাদিগকে পণ্ডিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া দিত, বিক্রমপুরের কলকলা যাহাদিগকে রসের টানে বাঁধিয়া দিত, বিক্রমপুরের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার যাহাদিগকে এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছিল,—তাহাদের কথা শুনিতে চাই। এই যে অখণ্ড জীবন-খণ্ড, তাহার বাণী শুনিতে চাই।

তারপর শুনিতে চাই—এই যে বৃহত্তর বিক্রমপুর, ইহার সমাজের ইতিহাস। কি করিয়া সমাজ বাড়িয়াছে; কি করিয়া ছোট হইয়াছে। এই সমাজে কত শত বিপ্লব বাঁধিয়াছে, কি করিয়া আবার সেই বিপ্লবের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। বর্ণভেদের উৎপত্তি এ দেশে কোথা হইতে, কেমন করিয়া হইল, সামাজিক জীবনে এই বর্ণভেদ-প্রথা কি উপকার ও কি অপকার সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে এখানে বর্ণভেদ ছিল কি ছিল না; যদি থাকিয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার কেমন করিয়া, কি কি কারণে ফিরিয়া আসিল। আমাদের দেশে যাহাদিগকে 'পতিত জাতি' বলিয়া গণ্য করি, তাহারা কি করিয়া পতিত হইল; কেন তাহাদের 'পতিত' বলি, কেন তাহাদের জল চল নয়—এই সব কথা স্পষ্ট করিয়া শুনিতে না পাইলে কেমন করিয়া সমাজের সংস্কার সাধিত হইবে? বিদেশ হইতে কতকগুলি কথা আমদানী করিলেই সমাজ-সংস্কার হয় না—সে কথা যত উঁচু দরেরই হউক না কেন, তাহা সমাজের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। যে পথে চিরকাল আমাদের সমাজসংস্কার হইত, সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। সমাজের ইতিহাস-ধারাকে পাইলে সেই পথের সন্ধান পাইব।

তারপর সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কথা শুনিতে চাই। কি করিয়া আমাদের সমাজের শিক্ষার বিস্তার হইত, আমরা শিক্ষা কাহাকে বলি.—সেই সব কথা খুলিয়া বলা চাই। আমি যখন অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম, সেই সময় আমাদের একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, Bengal cultivators are a highly civilised people. অর্থাৎ আমাদের চাষারা খুব সভ্য। এই সভ্যতার মূলে কি? কেমন করিয়া ক ও খ, আর নামতা শিখাইয়াও, আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইত, সে কথা ভাল করিয়া শুনিতে চাই। বিদেশীয় শিক্ষা-

প্রণালী হয় ত আমাদের শিক্ষা-বিস্তারের উৎকৃষ্ট উপায় নহে। সে কথা না জানিতে পারিলে, না বুঝিতে পারিলে, আমরা কেমন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার করিব? সে কথা শুনিতে পাইলে আমরা বুঝিতে পারিব, কেমন সুন্দর সরলভাবে আমাদের শিক্ষা-বিস্তার হইত। কবিগান, যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন শিক্ষা-বিস্তারের এইরূপ আরও কত উপায় ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা লাগিত না, বিপুল আয়োজনের আবশ্যক ছিল না, সহজে অনায়াসে, বাগানে যেমন ফুল ফোটে, তেমনি করিয়া আমাদের দেশ যেন আপনা-আপনি আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইত। সে সব কথা লুপ্ত-প্রায়—ঐতিহাসিকদের কাছে সেই সব কাহিনী ভাল করিয়া শুনিতে চাই।

তারপর শিল্প-বাণিজ্যের কথা—আজকাল যাহাকে অর্থনীতি বলে—ইংরাজীতে যাহাকে Political Economy ও Economic History বলে—ঐতিহাসিকদের কাছে তাহার সব কথা শুনিতে চাই। কৃষিকার্য্য, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইবে, একথা আমরা সকলে বুঝি; কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতিসাধন করিতে হইবে, তাহা কি আমরা ভাল করিয়া বুঝি? আমরা সকলেই জানি, ইউরোপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এত বড় হইয়াছে এবং আমাদের সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা বড় হইতে পারিব। আমাদের প্রথম উদ্যমে আমরা ইউরোপেরই নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের ইতিহাসের বাণীকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। ইউরোপের Iudustrialism'র যে কি ফল হইয়াছে, বিলাতে Socialism তাহার সাক্ষী। টাকার জোরে কেমন করিয়া যে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে পারে, ইউরোপে বর্ত্তমান কালে "Strike" "Combine" বা ধর্ম্মঘট এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা তাহার প্রমাণ। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই দরিদ্রের ধনবৃদ্ধি হয় না। দেশের আপামর সাধারণে যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন না করিতে পারিল, তবে "দেশের ধন" লইয়া দেশ কি করিবে? এই Industrialism ইউরোপের পন্থা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পন্থা নহে। আমাদের দেশের টাকার জন্যই টাকার আদর কম হয় নাই। অর্থ জীবন যাপনের উপায় মাত্র। আমাদের গ্রামে গ্রামে ধান ছিল, প্রচুর আহার্য্য ছিল, আমাদের জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে শান্তিতে পূর্ণ ছিল। কি উপায়ে তাহা সাধিত হইত ঐতিহাসিকদের কাছে সে সব কথা শুনিতে চাই। সেই উপায়ই আমাদের উপায়—সেই পথই আমাদের পথ। না বুঝিয়া শুনিয়া বিলাতি ঢংএর কলকারখানা চালাইতে আরম্ভ করিলে, আমরা শুধু ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইব। যতদূর জানা

গিয়াছে, আমাদের পথ অতি সহজ সরল পথ ছিল। হেরডোটাস তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অত্যাশ্চর্য্য দেশ—ভারতবাসীরা সমস্ত জগতের ধন লইয়া যায়, কিন্তু তাহার বদলে জগতে কিছুই ফিরাইয়া দেয় না। ইহার অর্থ কি? আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের সময় জমি কর্ষণ করিত, অন্য সময় আপনাদের আবশ্যকীয় আহার্য্য ও পরিধেয় প্রস্তুত করিত এবং বাকী সময় প্রত্যেক ঘরে ঘরে সূতা ও অনেকানেক শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হইত। আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহার জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম না, কিন্তু আমাদের শিল্প-দ্রব্য দিয়া আমরা বিশ্বজগতের হাটবাজার ভরিয়া দিতাম। এই রকম করিয়া আমরা জগতের ধনরাশি আপনার ঘরে তুলিতাম। আমাদের বিক্রমপুরে কত রকমের শিল্পবাণিজ্য চলিত, তাহার সব কথা এখনো জানা যায় নাই। শুনিয়াছি, গ্রামে তুলার চাষ হইত, সূতা ও কাপড় তৈয়ারী হইত। আইরলের কাগজ এখনও পাওয়া যায়। যে শঙ্খ-শিল্প এখন ঢাকার গৌরব, বিক্রমপুর তাহার জন্মস্থান। আমাদের কুম্ভকারেরা হাঁড়ী-পাতিল বানাইত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত রকমের শত শত মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিত। সোনা-রূপার কাজ বিক্রমপুরের গৌরব ছিল। স্থপতি-শিল্পে আমাদের দেশ প্রধান ছিল। রাজনগরে সৌধরত্নমালা আমাদের স্বদেশবাসীরাই গাঁথিয়া তুলিয়াছিল। প্রস্তরশিল্পে আমাদের দেশে খুঁজিলে অপূর্ব্ব ভাস্করকীর্ত্তি এখনো পাওয়া যায়—যে সব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া শিল্পকলাবিদেরা মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের ঝিনুকের অলঙ্কারে আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ছিল। আমরা মাটির পুতুল, ন্যাকরার পুতুল দেশে দেশে ছড়াইয়া দিতাম। আমরা কাঁসার থালা, ঘটী-বাটি দিয়া দেশ ভরিয়া দিতাম।

আর কত ছিল, কে জানে। সবই যেন স্বপ্নের মতন মিলাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকদের কাছে আমাদের এই দাবী যে—তাঁহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ কাহিনী আমাদের ভাল করিয়া শুনাইবেন—তাহার প্রকৃত ছবি আমাদের চোখের সামনে ধরিবেন। তবেই আমাদের পতিত শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে। এই ইতিহাস একদিনে লেখা হইবে না, দুইদিনে হইবে না,—কিন্তু হইতেই হইবে। আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার কোন কারণ নাই। "ধৈর্য্য ধরিলে মিলিবে মুরারী।"

এই যে ইতিহাসের কথা বলিলাম, সেই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব কথা বলা হইয়াছে। আমাদের সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম সেই ইতিহাসের

বাণীকে সার্থক করিবে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সকল কার্য্যে, সকল কর্ম্মে, সকল ধর্ম্মে, আমাদের প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে সেই একই বাণী ঘোষিত হইবে। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের দেশের কাজ করি, দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করি, পীড়িতের পীড়া নিবারণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করি, লোকের চলাচলের ব্যবস্থাবিধান, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শিক্ষা-দীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি, পতিত শিল্পবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি, সমাজের আবশ্যকীয় সংস্কার করি।

ইহা একজনের কাজ নহে, সকলের কাজ। ছোট বড় সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন নারায়ণের লীলা। ইহা অণু হইতে অণীয়ান্—মহৎ হইতে মহীয়ান্। ছোট বড় সবাই যে এ লীলার অন্তর্গত। ওই যে কৃষক, উহাকে আহ্বান কর, ওই যে পতিত, উহাকে বুকে টানিয়া লও, নইলে তোমার অমঙ্গল হইবে। ওই যে স্বার্থপর, উহাকে টানিয়া তুলিয়া ধর, তোমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। ওই যে ধনী, আপনার ধনভার বহন করিতেছে, উহাকে ডাক; ওই যে দরিদ্র, উহাকে কোল দেও; ওই যে শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডা সবাইকে ডাক! ডাক! যাহার যাহা আছে লইয়া আইস। আপনার ভার লাঘব কর। ঢাল ঢাল এই জীবনযজ্ঞে। নারায়ণ যিনি জীবের অয়ন এবং যিনি নিজেই নর-নারায়ণ, তাঁহাকে প্রণাম করি!

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

বাঙ্গলার কথা

বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।

সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক কি অনার্য্যই হউক, কি আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না— বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতীয় অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির

পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই universal brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met—not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্মসঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারসঙ্গত, আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত, জগতের ধর্ম্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এবার এস, আমরা সকলেই সমস্বরে বলি —"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই।" একবার এস, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া

বলে 'চাই,' জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্খার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে! এস ভাই খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছেন! এস, এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস, এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা, বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।

স্বরাজ-সাধনা

স্বরাজ মানে কি? আর অসহযোগ মানেই বা কি? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়,—স্বরাজের এমন অর্থ হয় না যে পার্লামেণ্ট থেকে একখানা এক্ট তৈয়ারী করে আমাদের উপহার দেবে। স্বরাজ সে জিনিস নয়। কেন নয়? স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। সবার উন্নতি এক রকমে হয় না, সব জাতির উন্নতি এক রকমে হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি, এক মহা প্রকৃতির অধীন হলেও প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতির অনুসরণ করে সে জাতির মধ্যে সন্ধান করতে হবে সেই প্রকৃতি যে প্রকৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, না—সে প্রকৃতি ঢাকা পড়েছে, কারণ প্রকৃতি কেহ হারাতে পারে না। আমাদের অনেক দিনের পরাধীনতার চাপে বিলাস মোহে আমাদের যা স্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে আছে, তার সাধনা, তার সন্ধানই স্বরাজ। সে জিনিসটা কেউ দিতে পারে না। ইংরেজ একটা শাসন প্রণালী দিতে পারে, ইংরেজ বলতে পারে গোলমালে কাজ কি? তোমরা স্বায়ত্তশাসন নাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জ্জন নয়, সাধনার ফল নয়। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে? তোমাকে অর্জ্জন করতে হবে, তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতি সে সত্য প্রকৃতির সন্ধান ক'রে তাকে বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ। আমি সেদিন একটা কাগজে লিখেছিলাম যে এই স্বরাজ-সাধনা আমাদের অধিকারে। তিলক মহারাজ বলেছেন স্বরাজ

আমাদের জন্ম-অধিকার। আমাদের অধিকার কেন? আমাদের অধিকার কারণ আমাদের যেটা প্রকৃতি তা অধিকার করা। যেমন আমার যদি কোন ঐশ্বর্য্য থাকে, আমি বলব এ ঐশ্বর্য্যে আমার অধিকার। স্বরাজ আমাদের অন্তরে, স্বরাজ আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সত্য প্রকৃতি, সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-অধিকার। বিধাতা সে অধিকার আমাদের দিয়েছেন। আমাদের যা প্রকৃতি তা বিধাতার দান, বিধাতার লীলা। দানের চেয়ে বড় বিধাতার লীলা। সমস্ত জগতের ইতিহাস বিধাতার যে অন্তরঙ্গ লীলা, তারই বহিঃ-প্রকাশ। সমস্ত ইতিহাস তাই, ভারতের ইতিহাস তাই। লীলাময়ের গুণ কি? লীলাময়ের স্বরূপ কি? তিনি চান বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে তিনি নিজেকে বহু ক'রে নিজে সে বহুত্ব উপভোগ করেন। মহাপ্রভু এই কথা বলে গিয়েছেন। নিজেকে বহু করে সেই বহুকে তিনি আস্বাদন করেন, সে আস্বাদন করার যে ফল সে ফল অন্তরঙ্গ লীলা নয়, সে ফল জগতের ইতিহাস। তিনি যুগে যুগে নিজেকে বহু করেন, সুতরাং এই যে মনুষ্য জাতি একে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ক'রে—এর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন স্বয়ং ভগবান্। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং ভগবান্, রক্ষা করেন তিনি। সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। এর কর্ত্তব্য কি একথা হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাতে হবে না। ইংরেজের রাজনীতি মানি না, তার ভিতর খুব কোন সত্য কথা থাকতে পারে না, আমার এই ধারণা। আমি অনেক পড়েছি, এখনও মনে হয়—তার অধিকাংশ কথা ভুল। এই স্বরাজে আমাদের অধিকার কেন বলছি। মানুষের ধর্ম্ম বলতে কি বুঝি। যুগ-শঙ্খ বেজে উঠেছে, আর যুগ-ধর্ম্ম এলে তা পালন করতে হয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই ভারতে নূতন জাতি গড়ে উঠেছে ভগবানের লীলায়। আমাদের অধিকার তার লীলায় যোগ দেওয়া। কারণ প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য ভগবানের লীলার সহচর হওয়া। আমাদের সহচর হতে হবে, অন্য উপায় নেই। আজ কি কাল কি দু'দিন পরে সহজ পথে কি কুটীল পথে ভগবানের লীলার সহচর হতে হবে। এই যে বলেছি সহজপথে কি কুটীল পথে এই লীলার মধ্যে তিনি ডাকেন, কেমন করে তিনিই জানেন, কোন্ পথে তিনিই জানেন। এই যুগধ্বনিই পথের সহচর।

স্বরাজ-সাধনা আমাদের কর্ত্তব্য, তার কারণ ভগবানের লীলায় তাঁর সহচর আমাদের হতেই হবে। বাস্তবিক, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে জানি না কেহ একথা জানেন, কেহ জানেন না। যিনি ভাল করে জানেন, তিনি অনেক উপরে

উঠে গেছেন, কিন্তু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে আমরা ভগবানের লীলায় সহচর, সেই জন্য স্বরাজ আমাদের কর্ত্তব্য। স্বরাজ তোমাকে চাইতে হবেই; তোমার প্রকৃতির সন্ধান তুমি করবে না, তোমার প্রকৃতির সাধনা করবে কি ইংরেজ? কি লজ্জার কথা! এমন শিক্ষা হয়েছে আমাদের দেশের যে সাধনা, বাঙ্গলা দেশের যা চরম সাধনা, মহাপ্রভু যে ধর্ম্মরক্ষা করে গিয়েছেন আজ সে কথা শিক্ষিত লোকের কাছে বলতে হয়, তারা বুঝতে পারেন না এমন আমাদের পতন হয়েছে। তুমি কেন স্বরাজ চাও, আমি কেন স্বরাজ চাই সে কথা কেমন করে বোঝাব। দাসত্বের কি জ্বালা কেমন করে বোঝাব? যে ক্ষুধিত সে কি বোঝাতে পারে, কেন সে অন্ন চায়, আহার চায়। সে কি যুক্তির দ্বারা বোঝাতে পারে, সে কি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারে কেন স্বরাজ চায়। আমার বুকে জ্বালা ধরে না বলে আমি স্বরাজ চাই। এই যে দাসত্বের জ্বালায় জ্বলে মরছি তাই স্বরাজ চাই, আমি এই দাসত্ব দূর করতে চাই। নিজের প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে যা মিথ্যা, যা মিথ্যাকে আশ্রয় করে আছে সে সব মিথ্যাগুলি একেবারে তাড়াতে না পারলে নিজের প্রকৃতির সাধনা হয় না। তার জন্য স্বরাজ চাই। আজ আমাদের কি আশ্রয় আছে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কক্ষ আমাদের ধর্ম্মের আচরণ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের বাদ-বিসম্বাদের ভার তা' মিটানর ভার আমাদের ধর্ম্মকথা আমাদের কর্ত্তব্য আজ যা কিছু সব পরের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছি। যে পর যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির কোন সাম্য নেই, সে পরকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে আঁকড়ে ধরে আছি, মনে করছি বড় আশ্রয় পেয়েছি। ওরে মূর্খ সে আশ্রয় কি? সে যে মিথ্যা আশ্রয়, সে যে প্রলোভন, সে যে মোহ, সে যে দুঃস্বপ্ন। সেই হ'ল সত্য আশ্রয় যা নিজের প্রকৃতি নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যা তোমার অন্তরে ফোটে। যেটা তোমার কর্ত্তব্য তাকে বাইরে প্রকাশ কর, তাকে তুমি ভোল কেন? একবারে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ কিসের উপর—যা তোমার মিথ্যা আশ্রয়। একথা বাঙ্গালীকে আজ শিখাতে হবে, শিক্ষিত সমাজকে আজ বোঝাতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল কক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা পর্য্যন্ত পরের হাতে দিয়ে বসেছি, তা পরের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায় করে নিতে হবে, সেই হল আমাদের স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। যে শিক্ষা-দীক্ষা এতকাল একটা মায়ার বশে বিদেশীর হাতে যা দিয়েছি, যেটা ধর্ম্মের উপায় তাকে অর্থের উপায় করেছি, নিজেকে ছলনা করেছি, নিজেকে প্রতারিত করেছি, ভগবানের অপমান করেছি, সে মোহ থেকে নিজেকে উদ্ধার কর, সাধনায় নিয়ে এস, টেনে নিয়ে এস।

বস্ত্র যজ্ঞ

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, কংগ্রেস বলেছে—বিদেশী কাপড় পোড়াও। আমার জ্ঞানী গুণী বন্ধু বলেছেন ধ্বংস ক'র না, ভস্ম ক'র না! বলছেন খুলনায় পাঠিয়ে দাও, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আমার যে ভাই-বোনেরা রয়েছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। কথাটা বলবামাত্র একটা ভাব আসে, পরের উপকার করার ভাব। আজ আপনাদের ভাল করে উপলব্ধি করা চাই কেন বিদেশী বস্ত্রকে ধ্বংস করতে বলছি। বিদেশী বস্ত্রের অর্থ কি? আমার কাছে কি মানে জান? এগুলা আমাদের দাসত্বের নিদর্শন। আমরা যে ব্যাধিগ্রস্ত সে ব্যাধির নিদর্শন, আমাদের অপমান! আমাদের ধর্ম্মহীনতা আমাদের দাসত্ব, এ সকলের নিদর্শন।

আমি বিলাতে যখন শিক্ষা করতে গিয়েছিলাম আজ প্রায় ৩০ বৎসরের বেশী হয়ে গিয়েছে, তখন Herodotus-এর একটি কথা পড়েছিলাম সেটা এই —"India seems to be a wonderful country. It drains the wealth of the world but gives nothing in return". অর্থাৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধন বহন করে নিয়ে আসে কিন্তু কিছু দেয় না। বলেছে ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য্য দেশ, আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, আজ প্রায় দশ বৎসর হল এর অর্থ একদিন এক মুহূর্ত্তে আমি বুঝতে পারলাম। আর একথা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রাদেশিক সমিতির আমি সভাপতি ছিলাম তার সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলাম, কেন ভারতবর্ষ নিতে পারে দিতে পারে না। আহার পরিধেয় বস্ত্র এই দরিদ্র জাতির একটা প্রধান কর্ম্ম। আমাদের এই রীতি ছিল খাওয়া হ'ক পরা হ'ক আমরা কারো কাছে হাত পাতিনি। নিজের ঘরের ধান নিজের ক্ষেতে জন্মাত, নিজের কাপড় নিজের ঘরে তৈয়ারী হত। যে সময়ে তোমরা কিছুই কর না, শুধু অলসভাবে কাটাও, সে সময়ে চরকা ঘুরাবে দিনে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা যে যেমন পার। সংসারে একটি পরিবারে চার পাঁচটি লোক থাকে, সবাই যখন অবসর থাকবে চরকা চালাবে। বৎসরের শেষে যে সূতা হবে সে সূতার দাম নেই, তারপর তোমার ঘরে যদি তাঁত থাকে, তাঁতে কাপড় হবে, না থাকে তাঁতির ঘরে ফেলে দাও, ঘরে তুলা না থাকে কিনে নাও। কিন্তু তুলার যদি চাষ আরম্ভ হয়, এ বছর যে রকম

আরম্ভ হয়েছে দু'বৎসরে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে তুলার গাছ থাকবে। এ সব অলীক কথা নয়, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে তুলার গাছ ছিল। আমি যখন একথা বুঝি সে সময় বাড়ীতে তুলার গাছ করেছিলাম, সে তুলা উৎকৃষ্ট তুলা, সে তুলায় ঢাকার মসলীন হয়েছে। ঢাকার মসলীন আমি দেখতে পাই না, প্রায় পাঁচ সাত বৎসর আগে ছিল। এমন অপরূপ জিনিস আজ পর্য্যন্ত জগতে কোথাও হয়নি। যাঁরা বলেন চরকায় তেমন সূতা হয় না তাঁরা সে ইতিহাস জানেন না, জানতে চেষ্টা করেন না। চরকার সূতায় ও দেশী গাছের তুলায় ঢাকার মসলীন তৈয়ারী হয়েছে যা রোমের সম্রাট অনেক কষ্টে অনেক টাকা খরচ করে নিয়ে যেতেন। আমাদের যা আবশ্যক জিনিস তা আমরা ঘরে তৈয়ারী করতাম, সুতরাং আমাদের অভাব ছিল না, ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, ঘরে গরুর দুধ, বাঙ্গালীর আর চাই কি? আমি আজও বলি ছাই ভস্ম ত্যাগ কর যাতে খাওয়া পরা হতে পারে তাই হলেই বাঙ্গালীর যথেষ্ট, আর চাই কি?

আমাদের যে শিল্প, বাঙ্গলার যে শিল্প জগতের আদরের জিনিস ছিল, সে শিল্প আমরা হারিয়েছি। এই সব সৌখীন শিল্প যা না হলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় এগুলি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে দিতাম আর বিদেশ থেকে ধন নিয়ে আসতাম। শিল্প জিনিসের দাম অমূল্য, আমি হয়ত পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছবি কিনব, কিন্তু ছবির বাস্তবিক দাম পাঁচ হাজার টাকা নয়। এইজন্য হেরোডোটাস সেই সময়ে বলেছিলেন—ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধন বহন করে নিয়ে আসে, কিন্তু কিছু দেয় না। আজ পৃথিবী ভারতবর্ষের ধন নিয়ে যাচ্ছে, কেন? আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি, আমরা স্বদেশ হারিয়েছি, আমাদের শিক্ষা বিভ্রষ্ট, জীবন বিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, সেই জন্য এই স্বরাজ আন্দোলন।

আজ আমাদের এই নবযুগের আরম্ভ সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নব অধ্যায়ের সূচনায় স্বদেশী গ্রহণ কর। আমার স্বদেশের সেবা করে এই জ্ঞান হয়েছে যে বাঙ্গালীর ক্ষমতার সীমা নেই, বাঙ্গালী সব করতে পারে, বর্জ্জন করতে পারে গ্রহণও করতে পারে। বাঙ্গালীর শুধু বলতে হবে, খুব বড় করে নিজের মনের মধ্যে বলতে হবে, বিদেশী বস্ত্র আমি কিছুতেই নেব না। একথা বাঙ্গালীর বলতে হবে, বাঙ্গালী পারে আমি জানি। একবার জয় মা বলে প্রতিজ্ঞা কর বিদেশী বস্ত্র কিছুতেই নেব না। সেই ত সেদিন ইউরোপের যুদ্ধের সময়ে তোমার কাপড় এত কম হয়ে গিয়েছিল, তুমি কাপড় কিনতে পারনি, আমি কি জানি না অনেক জেলায় অনেক স্ত্রীলোক কল্য-

[গাছের কচি পাতে লজ্জা নিবারণ করে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। এতদিন কিনতে পারনি, আজ না হয় সস্তা হয়ে গেছে। বাঙ্গালী সব পারে, বাঙ্গালীর সহিবার শক্তি অনন্ত, ওটা পরিহাসের কথা নয়। আজ সহিতে থাক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কর যে বিদেশী বস্ত্র আর আমি কিনব না। কষ্টের সময় যখন মায়ের লজ্জা নিবারণ করতে হবে তখন তোমার এত কি বাবুগিরি যে আধখানা কাপড়ে চলতে পারবে না। একখানাকে দু'ভাগ কর, দু'ভাগ করে আলাদা আলাদা করে পর। লজ্জা? দেহের লজ্জা? আজ জিজ্ঞাসা করি কোন্ লজ্জাটা বেশী, দেহের লজ্জা না প্রাণের লজ্জা? আমি নবযুগের আরম্ভে যদি মেনচেষ্টারের কাপড়ে খুব বাবুগিরি করে রাস্তায় বের হই, জগতের লোক কি ভাববে? রাগ ক'র না ভাই, ক্ষমা কর। তারা ভাববে ইংরেজ বেশ করে খাওয়াচ্ছে আর পরাচ্ছে, গলায় ঘণ্টা দিয়ে রেখেছে। একথা জগতের লোকে ভাববে। আজ যদি বাঙ্গালী ভাবতে শিক্ষা করে, কাল বাঙ্গলার পরিবর্ত্তন কেউ নিবারণ করতে পারবে না। ইজ্জত রক্ষা করতে হবে, নিজের ঘরের কাপড় পরতে হবে, তাতে বাবুগিরি হ'ক আর না হ'ক। আমাদের দেশের ভাই বোনের করুণা স্নেহ এই কাপড়ের সূতায় সূতায় মিশে আছে। তাই বলি ভাই নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে, স্বদেশ মন্ত্র জপ করতে হবে, মানুষ বলে পরিচয় দিতে হবে।

ভারতের ইতিহাস কি তোমার হাতে? বিধাতার লীলাকে তুমি সরিয়ে দেবে? তুমি আত্মহত্যা করবে, সাধ্য কি তোমার? তোমার মন তোমায় টেনে আনবে। আমি তাই আমার শেষ কথা বলছি, আজ তোমরা জগতের মাঝে ছুটে পড়। চাই তোমাদের প্রাণ, চাই সে প্রাণের স্পর্শ, চাই সে প্রাণের আগুনে জ্বলতে। চাই ভগবান্, চাই লীলা। এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব্য অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে সে অধ্যায়ে বাঙ্গালী-জাতির গৌরবের কথা মনুষ্যত্বের কথা লেখা চাই।

ভারতের লক্ষ্য

যে মহামিলনের সাগরসঙ্গমে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতধারা ছুটিয়াছে, আজিও আমাদের সে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই। বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে

ভারতীয় মহাজাতি জগতের কোন্ প্রয়োজন সাধনে গড়িয়া উঠিতেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া দেখিলে হয় ত আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি। সভ্যতার ইতিহাসের শৈশবকাল হইতে ভারতে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সবগুলি ভারতকে একীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

এক একটা জাতি আসে, এক একটা ভাবের বন্যা আসে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ ভাসাইয়া দিয়া সে পুণ্যস্রোত ভারতকে একতার মুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। অনার্য্যের সহিত আর্য্যের সংযোগে এক মহত্তর জাতির সৃষ্টি হইল—তারপর একে একে কত জাতি আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। নিজের যাহা কিছু দিবার ছিল, তৎসমুদয় দান করিয়া জাতির মহত্তর জীবনে নিজেকে নাশ করিয়া নিজের প্রয়োজন সার্থক করিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্ম—সকলই ভারতকে একটা বৃহত্তর জীবন-লাভে সাহায্য করিয়াছে। কাহাকেও নষ্ট করিয়া এই জীবন ফুটে নাই—প্রত্যেকের বৈচিত্র্যকে বজায় রাখিয়া যথাস্থানে তাহাকে স্থাপিত করিয়া সমগ্রের সমাবেশে এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে বাণী শুনাইয়া, যে মন্ত্রের উদাত্তস্বরে জগতকে মাতাইয়া ভারতের জাতীয় জীবন সার্থকতা লাভ করিবে, এতদিন ভারত কত ঝড় কত বিপ্লব সহিয়া যাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে আজ বোধ হয় সেই শুভদিনের প্রভাতী গান আরম্ভ হইয়াছে।

"শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়িগীতি" চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী আজ কামানের শব্দের অন্তরালে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কলের নিষ্পেষণে মানুষের প্রাণ আজ মরমের যাতনায় আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে—প্রলয়ের বেদনায় ধরিত্রী আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মরণের এই কোলাহলের ভিতর কে আজ মঙ্গল-শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া মানব-স্বাধীনতার নবযুগের উদ্বোধন করিবে? সে সাধনা জগতের আর কোন্ জাতির আছে? ভারতের এতদিনের প্রতীক্ষা আজ বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলন সেই উদ্বোধনের পূর্ব্বে নিজের পবিত্রীকরণ। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি আজ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে—নিজের মনের দেউলে নিজের দেবতার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইবে। তবেই ত আমরা নববলে বলীয়ান হইয়া—মুক্তির মহামন্ত্র ঘোষণা করিয়া জগতে নূতন জীবন সঞ্চার করিতে পারিব।

আজ আমাদিগকে দেহে মনে বাক্যে শুদ্ধ হইতে হইবে; ভেদাভেদ, হিংসা-

দ্বেষ ভুলিয়া মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের সত্যিকার নিবিড় আলিঙ্গনে এক হইতে হইবে। তাই আজ মায়ের নামে প্রেমের জোয়ার দেশ ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এ জলতরঙ্গ রোধিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে ছিল না। টোডরমল্ল, বীরবল, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, মানসিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এখন হায়দরাবাদে যেখানে হিন্দু প্রজা বেশী, রাজা মুসলমান; অথবা কাশ্মীরে যেখানে মুসলমান প্রজা বেশী, হিন্দু রাজা; সেখানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বৃটিশ শাসনে। কিন্তু আজ ভারতমাতার দুটি সন্তান হিন্দু-মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক—বিদেশীর স্বার্থ, উভয়কে বিভিন্ন রাখা।

তাই মুসলমানের ধর্ম্মের আঘাত আজ কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাণে বাজিয়াছে মুসলমানের পক্ষে এইটি যেমন ধর্ম্মের কথা—হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্ম এই, কোনও ধর্ম্মকে নিপীড়ন না করা এবং নিপীড়িতকে পীড়নের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সাহায্য করা। জগতের যে কোনও ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগস্থাপনে সহায়তা করে। কোনও ধর্ম্মকে নষ্ট করা অপর কোনও ধর্ম্মের সার্থকতা নহে। ভগবান কত ছন্দে কত লীলায় সংসারে দেখা দিতেছেন—কত ধর্ম্ম, কত ভাবের ভিতর দিয়া নিজের মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন —মানব তাহা কি বুঝিবে? সে কেবল তাঁহার মহতী লীলার বিষয়ীভূত হইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে।

একজনের যে ভাব, আর একজনের ঠিক তাহা নহে। বৈচিত্র্যে বিরোধ নাই। সমগ্রের সামঞ্জস্যেই সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। পরস্পরকে শ্রদ্ধার ভাবে না বুঝিলে নরমাঝে নারায়ণের এই অপূর্ব্ব লীলার কিছুই উপলব্ধি হইবে না। তাই আমাদের পরস্পরকে বুঝার এত দরকার; এই বুঝার অভাবেই এত বিরোধের সৃষ্টি।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট এই বিরোধ নাই—তাঁহার বিরোধ অধর্ম্মের সহিত। মৌলানা মহম্মদ আলীকে একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —"হিন্দু-মুসলমানে মিলন কি সত্য হইবে? দুই ধর্ম্ম এক তৃতীয় ধর্ম্মে মিলিত না হইলে এই মিলন কি টিকিবে?" এই কথার উত্তরে আলী সাহেব বলিয়াছিলেন—"আমাদের এই আন্দোলন অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে—এখানে একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে অধর্ম্মীয় দল—যুদ্ধ এই দুই দলে, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান বলিয়া নহে। সেইজন্য খেলাফৎ, সেইজন্য মুসলমান ধর্ম্মস্থানরক্ষকের বিপদত্রানের জন্য—হিন্দুও এ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। যাহারা বলে ইহা একটি রাজনৈতিক চাল—তাহারা মিথ্যাবাদী। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজনৈতিক চালের উপর স্থাপিত হয় না—সেটা প্রাণের জিনিস, প্রাণের অনুভূতি, প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস না হইলে আবার হয় না। অনেকে বলেন খিলাফৎ সমস্যা মিটিয়া গেলেই মুসলমানগণ এই আন্দোলন ত্যাগ করিবে। আমি এইরূপ আশঙ্কার কারণ দেখি না। মুসলমান একথা নিশ্চয়ই জানেন যে স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ মুসলমান সৈন্য লইয়া পবিত্র জাজিরত-উল-আরব ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ ভারতের ৮ কোটী মুসলমানের বুকে আঘাত করিযা তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছে।

ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। "যচে মান" পাওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয় তবে আর আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই? আমার আহার জুটে না, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট-পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয়, আমার ধর্ম্মের ইজ্জত থাকে কই? সে কারণ স্বরাজ আমাদের চাই-ই চাই! বীরের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে—মানুষের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সেখানে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিবে। হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া শান্তির সহিত, প্রেমের সহিত, সুখের সহিত, সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবে। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কথা নয়—কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের। তাহাতে বিরোধ নাই অসামঞ্জস্য নাই।

মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর বাঁচিতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগতকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে।

হিন্দু-মুসলমান সকলকে এক হইয়া মহাবোধনের পূজারী হইতে হইবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের ধর্ম্ম রক্ষার্থে—পরের ধর্ম রক্ষার্থে আত্মার বল সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই আত্মবল সংগ্রহের আয়োজন মাত্র। সেই আয়োজনে সকলের সকল ত্রুটী ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে—নূতন জীবনের স্নিগ্ধ উষাতে বিধাতার আশীর্বাদ মাথায় ধরিয়া গহন পথে যাত্রা করিয়া মরণকে জিনিতে হইবে।

স্বরাজ-চাওয়া

যে মুখে শুধু জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? ছুটো সভায় গেলাম, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' চীৎকার করে বললাম তাতেই কি হলো? তাতেই কি বুঝব স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আদালত শূন্যপ্রায়—উকীলেরা আদালত ছেড়েছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শূন্য হয়ে গেছে—যখন দেখব যুবকেরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের হিতসাধনে ব্রতী হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের এই পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা করবেন, তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। মহাত্মা গান্ধীর জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত কি একজনের জয় চায়? ভারত আজ চায় ভারতের জয়। মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে যখন গগন বিদীর্ণ করছি তখন মনে হয় সেই জয় এখনো আসে নাই—কিন্তু সেই জয়ের সম্ভাবনাতে প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যখন আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন—যখন স্কুল কলেজ আদালত শূন্য হয়ে যাবে—যখন প্রাণের অশান্ত চেষ্টা স্বরাজলাভের জন্য একাগ্র হবে—তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান, তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। মনের মধ্যে তাই বুঝে দেখুন। অসার কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। স্বরাজ, বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই সফল করতে হবে। যদি না করে' থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন তবে বলি আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ প্রাণের চাওয়া নয়। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। আমার জীবনে দেখেছি আমি যখনই প্রাণ দিয়ে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। প্রাণের সাধনা

না হলে কোন মূল্যবান জিনিস লাভ হয় না। যখন দেখব আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পাখীর মত পাখা ঝাপটাতে থাকবে তখনই বুঝব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান।

গত ২০ বৎসর যাবৎ সামান্যভাবে দেশের কথা ভেবেছি। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের প্রতি অবিচারের পর জীবনপণ করে স্বরাজের জন্য লেগেছি। আমার প্রাণে কে যেন অলক্ষ্যে লিখে দিয়েছে স্বরাজ ছাড়া জীবন রাখা বৃথা। আমি ডাকছি আসুন, দেশমাতৃকার বুকে আসুন, এই ভারত-শ্মশানে কি কেউ স্বরাজের সাধনা করবে না? কে চাও স্বরাজ? বল, মা! যতদিন তোমার পায়ে শৃঙ্খল থাকবে ততদিন স্কুল কলেজ চাই না। আমার মায়ের পায়ে বেড়ী, আমার এই শিক্ষা-দীক্ষায় লাভ কি? মায়ের বেদনা কার প্রাণে লাগে? কে মানুষ আছ, এস। ঐ মায়ের পতাকা উড্ডীয়মান, এস পতাকার নীচে দাঁড়াও। বাংলাদেশে কি মানুষ নাই? কৈ, যে অন্ধকার দেখি? যে আছ এস, দাঁড়াও। মায়ের শৃঙ্খল ছোটাবার জন্য, এস। বাঙ্গলাদেশের কৃষক, তারা স্বরাজের মর্ম্ম বুঝে, তারা স্বরাজ চায়। বাঙ্গলাদেশের অনেক জায়গায় গিয়ে তা বুঝেছি। আর আমরা সভ্যতার নেতা শিক্ষিত—আমরা কি স্বরাজ চাই? দেশের কৃষক আমার কাছে চিরদিন নমস্য। কত কষ্ট করে তারা ক্ষেত্র কর্ষণ করে, আর আমরা তাদের কত অত্যাচার অসম্মান করি। চাষা যে সেও মানুষ।

আর আমরা শিক্ষিত, আমরা কি মানুষ? কবে বুক ফুলিয়ে বলব, আমরাও মানুষ; যে শিক্ষা-দীক্ষায় আমাদের অমানুষ করেছে তা ধ্বংস করা চাই, তবেই আমরা আবার মানুষ হতে পারব। Destructionএর পূর্ব্বে constructionএর দরকার। আমি নাকি destroy করছি, আমি কি ধ্বংস করছি? যেটা আমাদের অমানুষ করেছে—যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বুঝতে দেয় না; সেটা ধ্বংস করছি। শিক্ষালয় কোথায়? কোন্ শিক্ষক প্রাণে বুঝে বলতে পারেন তাঁরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রকৃত শিক্ষা? এ শিক্ষালয় দাস্যালয়—এ গোলামখানা। এই শৃঙ্খলমুক্ত করা কি আমার অপরাধ! "মানুষ! মানুষ! ওরে খুঁজে দেখনা ক'টা মানুষ।"—মানুষ হওয়া বড়ই ভার। আমি প্রথমেই বলেছি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমরা মনে করি মানুষের মন যেন পায়রার খোপের মত—একটা ধর্ম্ম, একটা শিক্ষা, একটা রাজনীতি, এইরূপ নানা খোপে বিভক্ত। সেটা ভুল! যেদিন দেখব বাঙ্গালী বুঝতে পেরেছে এ সমুদয় বিভাগ বস্তুতঃ

বিভিন্ন নয়—তখনি বুঝব বাঙ্গালীর চৈতন্য হয়েছে। তখন সে দেখবে এইসব এক, মিলে নানাদিকে নিজ শক্তি প্রকাশ করবে। নানা বিষয়, নানা পোং—এটা বিলাতী ভুল। আমার কাছে এই যে রাজনীতি, এই যে স্বরাজের বারতা নিয়ে দেশে দেশে ঘুরছি—তা ধর্ম্মের বারতা, ভগবানের বাণী। যে কার্য্য ভগবানের লীলার সহচর না হয় তা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। দেশময় প্রাণের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের দুর্গ দিয়ে তা বাঁধবার চেষ্টা বিধাতার বিধানে ভেসে যাবে, কিছুই টিকবে না। Destructionএর পূর্ব্বে Construction করবে কারা? বঙ্গবাসী না বিলাত হতে সাহেব এসে? ভারতে গোলাম-খানার খরচ দেয় কারা? ভারতবাসী। এই গোলামখানা রাখতে—গোলাম তৈরী করতে গবর্ণমেণ্ট ২০ ভাগের ১ ভাগ দেয়, বাকী সব স্কুল কলেজের ছাত্রেরা মাহিনা দিয়ে যোগায়। তোমরা যদি খরচ দিতে পার তবে কি তোমরা কলেজ তৈরী করতে পার না? তবে আগে Construction তারপর Destruction এই কথার মানে কি? এর মানে এই আমরা বেশ সুখে আছি, যতদিন না আমাদের স্কুল কলেজ হচ্ছে আমরা ততদিন বেশ আরামে থাকি, যখন আকাশ হতে ঐসব স্কুল কলেজ খসে পড়বে তখন গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ভেঙ্গে যাক। এযে ভাবের ঘরে চুরি।

Construction, destruction আমি বুঝি না, আমি চাই গোলাম-খানা হতে ছেলেরা মুক্ত হোক। এই গোলামখানা ভেঙ্গে পড়ুক, ধ্বংস হয়ে যাক। ছেলেদের গোলামখানায় রেখে, গোলাম হতে দিও না, ইহা পাপ। যে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় সে অপরাধী। আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি যে আজ শ্মশান। মায়ের পায়ের শৃঙ্খল কি চিরদিনই থাকবে? যদি তাই হয় বাঙ্গালী ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হওয়া সেটাও ভাল। যে জাতি স্বাধীনতা জানে না, যে নিজের ভাবনা ভাবতে পারে না তার ধ্বংস হউক। মিথ্যা তর্ক, শাস্ত্রের যত আবর্জ্জনা দূর করে যখন তোমরা বল্‌তে পারবে আমরা স্বাধীন তখন এক-মুহূর্ত্তে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, আমরা স্বাধীন! যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি বিদেশীর নিকট তোমার প্রাণ ও মন বিলিয়ে দেও, তবে ভগবানের পায়ে কি দিবে? তোমার মন-প্রাণ যে তোমার নয়। জষ্টিস উড্‌রফ বলেছেন "This is the cultural conquest of the West." আজ ইংরেজ শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকে জয় করেছে। তাই আমরা দাস অপেক্ষা আরো হীন দাস। আর এই গোলামখানায় হীনদাস তৈরী হচ্ছে। যে মনে প্রাণে স্বাধীন নয়, যে

নিজের মনকে নিজের অধিকারে না আনতে পারে তার বিধাতাকে দিবার কিছু থাকে না। সে তা বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। স্বরাজের কথা ভাল করে ভাব, মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। বিধাতার বাণী শুনতে চেষ্টা কর। বিধাতার বাণী যে শুনতে চায়, সে শুনতে পায়। যদি কলেজে গিয়ে কানে তুলো দিয়ে থাকতে চাও তবে থাক। 'গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী' গোলাম ত গোলামই থাকবে। আর যদি তা না চাও, তবে ঐ শুন স্বরাজের বাণী। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দাও। যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, মায়ের জন্য সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও। যার ইচ্ছা উকীল হবে, সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, যার ইচ্ছা কেরাণী হবে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, সেই অর্থের লোভ, মিথ্যা সম্মানের লোভ ভগবানের পায়ে, স্বরাজের নামে বলি দাও। আর বল স্বরাজ চাই—আমরা স্বাধীন। প্রত্যেক মনুষ্যজাতি স্বাধীন। মনে প্রাণে, সকাল সন্ধ্যায় বল আমরা স্বাধীন। আমরা কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে চাই না, কিন্তু অন্য কোন জাতি যেন আমাদের প্রকৃতিগত উন্নতির পথ রোধ না করে। তাই বল, আমরা স্বাধীন। যারা বলেন আমরা স্বাধীন তারা স্বার্থ বলিদান দিন, মায়ের নামে জয়ধ্বনি হউক, বল 'মায়ের জয়'। যারা আমাদের দেশের নেত, তারা কি স্বার্থ বলিদান দিবেন না? তাদের কানে কি মায়ের ডাক পৌছেনা? খাবার পরবার কষ্ট কি এত বেশী, যা পাবে তার শতগুণ পাবে। এই অত্যাচার নিপীড়িত ভারতবর্ষে এই জীবননিষ্পেষণকারী আমলাতন্ত্রের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর। সৈন্য নিয়ে প্রহার কর তোমরা গায়ের জোরে। আমি হাত সরিয়ে নিয়ে আসব, তোমাদের কিছু করে তোমাদের সাহায্য করব না, তোমাদের কোন কাজ করব না—এতো আমার অধিকার। এতদিন যারা সবের নেতা হয়ে, সকলকে হাতে ধরে টেনে তুলেছিল তাদের কি বলবে দেশ; আজ বলবে সকলে যারা এতদিন agitation করছিল এখন যখন স্বার্থের বলিদান আবশ্যক হল আর তাদের পাওয়া গেল না। ভাবতেও লজ্জা হয়, চোখে জল আসে। প্রত্যেক শিরায় শিরায় বিধাতার বাণীর সার্থকতা আমাকে জানিয়ে যায়—তোমরা যদি না পার, সরে যাও। আমার দেশের ঐ চাষা মুটে মজুর তাদের বুকে ধরে আমি স্বরাজের পথে চলব। বক্তৃতা চাই না, কার্য্য চাই। এইটুকু ভাই কি দিতে পারবে না? দেশ ডাকছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ তোমার মা ডাকছেন। ভারতবর্ষ চিরকাল ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত। আর তোমরা এতটুকু ত্যাগ করতে পারবে না? এইটুকু স্বার্থ কি এত বেশী

হলো ? বিধাতার বাণী কি বিফল হবে, স্বরাজের চেয়ে কি তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বড় ? প্রাণখুলে দেখাতে পারলে দেখাতে পারতাম আজ কি যাতনা প্রাণে পাচ্ছি।

এস ভাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, এস চাষার সঙ্গে যাদের ঘৃণা করতাম তাদের সঙ্গে। বাঙ্গলা ত্যাগমন্ত্রে এক হউক। জগতকে দেখাই ভারতে ত্যাগেরই জয়। ত্যাগেরই জয়, ভোগের জয় কখনো নয়। দলে দলে ছেলে দেশে দেশে যাও। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমিতি খুলুক। চরকার কাজে লাগ। চরকার পুনরুত্থানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হবে। এই যে নরবিগ্রহ সব আমার সামনে দেখতে পাই, তোমরা বিধাতার সম্মান অটুট রাখ, প্রত্যেক কাজে। এসেছি আমি ভিক্ষা করতে—ভিক্ষা দাও। শুধু অর্থের ভিক্ষা নয়—প্রাণের ভিক্ষা। প্রাণ নিতে এসেছি, প্রাণ চাই। প্রাণের স্রোতে দেশ ভেসে যাক। কি দিবে ভাই আমায়, তোমার ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। এস স্বরাজের জয়ধ্বনি হউক। স্বরাজের জয় পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হউক।

স্বরাজের পথে

আমরা পাপে তাপে মলিন—আমাদের জাতির যে হৃদয় তা পঙ্কিলতায় পূর্ণ—তাই স্বরাজ—সূর্য্য তাতে প্রতিফলিত হয় না। স্বরাজ পেতে হ'লে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—অর্থাৎ কিসের জন্য মলিনতা, কেন আমাদের জাতীয় জীবন এমন পঙ্কিল, অপবিত্র, সেটা খুঁজে বের করতে হবে, আর তাকে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দূর করে দিতে হবে।

এই যে শাসন প্রণালী—যার জন্য পরের কাছে আমরা মাথা নত করে আছি—এটা চালায় কে ? এই যে আমলাতন্ত্রকে আমরা এত গালি দিয়ে থাকি—এই আমলাতন্ত্রটা কি ? এ কল চালায় কে ? চালায় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান। বিনা আপত্তিতে সেই কল চালানোর জন্য আজ আমাদের যত দুঃখ—যত মলিনতা সৃষ্টি—তাই কংগ্রেস বলেছে—হিন্দু-মুসলমান ফিরে দাঁড়াও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আত্মশুদ্ধির দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কর। এই শাসন-চক্র, এই মারণ যন্ত্র, পেষণের কল আর চালিও না। হাত সরিয়ে নাও—হিন্দু তুমি হাত সরিয়ে নাও—মুসলমান তুমি হাত সরিয়ে নাও, সেই তোমার

প্রায়শ্চিত্ত। সেই প্রায়শ্চিত্ত যেদিন করবে তোমার হৃদয়—জাতির হৃদয় পবিত্র হ'য়ে যাবে, আর সেই দিন স্বরাজ হবে। এই আমলাতন্ত্রটা চলে কি প্রকারে? স্কুলের ছেলে, স্কুলের মাষ্টার, আদালতের উকিল, মোক্তার, জজ, ডেপুটি, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের লোক, সৈন্য বিভাগের সেপাই—এই সব মিলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলে এই শাসনচক্র চালাচ্ছে। আত্মঘাতী আমরা—সেটা বুঝতেও পারি না। মহাত্মা গান্ধী আর্ত্তনাদ করছেন কেন? জাতিটা যে আত্মঘাতী হয়ে গেছে। আত্মঘাতী, ওরে আত্মঘাতী হিন্দু-মুসলমান! হৃদয়কে পবিত্র কর, হস্ত কলুষিত করোনা, ভগবানের নাম স্মরণ কর, আর যে চক্রে তোমাদের সমস্ত স্বাধীনতা সকল সুখ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে চক্র থেকে হাত সরিয়ে নাও, তা হলে স্বরাজ হবে।

যাঁরা মনে করেন স্বরাজ একটা শাসন প্রণালী, তাঁরা এই তত্ত্ব বোঝেন না। তাঁরা জানেন না যে স্বরাজ হ'লে তবে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা হয়। স্বরাজ আগে, শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা পরে। এতে প্রমাণিত হয় স্বরাজ এখনও আসে নি।

স্বরাজের অর্থ কি? স্বরাজ অর্থ হিন্দু-মুসলমান মিলে যে নবীন জাতি গড়ে উঠেছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত যে জীবন প্রণালী। সে ইচ্ছা প্রকাশের উপায় কি? বাসনা প্রগাঢ় করা, ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করা, আকাঙ্খাকে দৃঢ় করা। যে দিন ভারতের নরনারী এককণ্ঠে বলতে পারবে স্বরাজ চাই, মুখের কথা নয়, কার্য্যে—স্বার্থত্যাগ করে প্রমাণিত করবে স্বরাজ চাই—সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ তোমার আসবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি স্বরাজ উপলব্ধি করবে। তখন যত বড় পার্লিয়ামেণ্টই জগতে থাকুক না কেন—সকলকে তোমার স্বরাজ স্বীকার করতেই হবে। এ পরিষ্কার কথা। কিন্তু গোলামিতে যাদের প্রাণ আবদ্ধ তারা তা বুঝবে না। তারা মনে করে স্বরাজ একটা শাসন প্রণালী। ভগবানের করুণা প্রার্থনা কর—হৃদয় পবিত্র কর, তবে বুঝবে স্বরাজ কি।

এই স্বরাজ কি করে পাওয়া যায়? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক তর্ক করেন, অনেক হাসিঠাট্টাও শোনা যায়। যখন মহাত্মা গান্ধী প্রথম বলেছিলেন যে তিন মাসের মধ্যে এক কোটী টাকা চাই, এক কোটী কংগ্রেসের সভ্য চাই, আর ২০ লক্ষ চরকা চাই—তখন অনেক হাসির রোল উঠেছিল, অনেক ঠাট্টা মস্করা শোনা গিয়েছিল—বহু জ্ঞানী বুদ্ধিমান [illegible] কর্ত্তারা বলেছিলেন এরা বাতুল, ভারতবর্ষে দেশের কাজের জন্য এক কো[illegible]টা পথে [illegible] পাগল না হলে এমন দাবী

কেহ করেনা! এখন যে সব তর্ক শেষ হয়ে গেছে—কারণ টাকা উঠেছে, এক কোটী টাকাই উঠেছে। বাঙ্গলাদেশে অনেকে দেন নি, কিন্তু ভারতে কোটী টাকার বেশীও উঠে গেছে। এক কোটী সভ্য তাও হয়েছে। ২০ লক্ষ চরকা—২০ লক্ষ কেন—২০ লক্ষ হয়ে গেছে।

অনেকে বলেন এক কোটী টাকা এক কোটী লোক আর ২০ লক্ষ চরকা হ'লে স্বরাজ হবে—কৈ স্বরাজ ত হ'ল না? এই রকম মনের অবস্থা থেকে তর্ক অনেক আসবে। তর্কের উত্তরও ঢের দিতে পারি। কিন্তু যে জেগে ঘুমায়, তাকে কি করে জাগাই? কোটী টাকা, কোটী লোক ও ২০ লক্ষ চরকা হলেই কি স্বরাজ হবে? কেহ বলে নাই স্বরাজ হবে—স্বরাজের সিঁড়ি তৈয়ারী হবে। ধাপে ধাপে আমাদিগকে উঠতে হবে। প্রথম ধাপে উঠেই যদি কেহ বলেন, কৈ দোতলায় তো এলাম না? সেটা তোমার দোষ, না দোতলার দোষ? আমাদের সব সিঁড়ি উঠতে হবে, তবে ত স্বরাজ। স্বরাজ পাওয়া কি ছেলেখেলা?

বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারকম তর্ক তুলেছেন। কলের সঙ্গে কি আমরা যুঝে উঠতে পারবো? আমাদের মাথাটা বিলাতি লজিক ও পোলিটিক্যাল ইকনমিতে এত ভরে আছে যে, বাস্তবিক যা সরল সোজা জিনিস, তর্ক না করে সেটা বুঝতে পারি না, নানা রকম যুক্তি-তর্কের ঘোরপ্যাচ না হলে আমরা তুষ্ট হই না। ওদের বড় বড় কল, হাজার হাজার কারখানা, ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে জাহাজ জাহাজ কাপড় আসছে—তুমি কি চরকা চালিয়ে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে? আমরা ত বলছি না যে আমরা প্রতিযোগিতা করতে পারবো। প্রতিযোগিতা করতেও চাই না। ওদের কলকারখানার সঙ্গে আমরা পারবো না—আমরা তা চাইও না। ওদের সঙ্গে ওভাবে যুদ্ধ করতে গেলে পরাজয় নিশ্চয়। ওদের শত শত বৎসরের সাধনায় যা গড়ে উঠেছে আমরা একদিনে তা কেমন করে পারবো। ওটা ভারতবর্ষের পথ নয়—ভারতের সাধনা বিভিন্ন। ওদের পথে ওরা চলুক, ওদের মারতে চাই না। ওরাও বাঁচুক আমরাও বাঁচবো। আমরা বাঁচতে চাই যে রকমে হউক আমরা বাঁচবো, compete করতে চাই না compete করবার আবশ্যকতা নাই। আমরা চাই আমাদের পুরাতনকে নূতনভাবে ফিরিয়ে আনতে।

আমাদের কি ছিল, ঘরে ঘরে চরকা চলত, যে সময় অন্য কাজ থাকত না সে সময় মেয়েরা চরকা চালাত, মুসলমান অবসর সময়ে চরকা চালিয়ে যে সূতা

হতো তাতে পরিবারের সমস্ত কাপড় তৈরী হত। এই কথা আজ আমাদের স্বপ্নের মত বোধ হয়। গোলামির মোহে যে সুন্দর প্রথা আজ ভারত ভুলে গেছে—সে প্রথার কথা বলতে গেলে লোকে গাল দেয়, বলে বাতুল। বাতুল কে? তুমি। তুমি আত্মবিক্রয় করেছ বিদেশীর চরণে, তুমি বাতুল না আমি বাতুল? যে কথা সত্য, যার প্রমাণ আমাদের ইতিহাসের পত্রে পত্রে রয়েছে, সে কথা আজ ভুলে যাবো, তোমার বড় বড় কল দেখে জাহাজ দেখে, কামান দেখে? আমাদের মারে কে? যেমন গৃহস্থ তার বাড়ীতে তার অন্ন তৈয়ার করে নেয়, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, সেইরকম গৃহস্থের কাপড় ঘরে ঘরে তৈয়ারী হত। আজ কেন আমরা বলছি—ইউরোপ, ম্যাঞ্চেষ্টারে এত বড় কল কি করে পারবো? তাদের প্রথা পৃথক। তাদের যে হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত আর হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসী তাদের অন্ন নিজের গৃহে তৈয়ারী হয়। এতে কোন competition নাই, এতে টাকার কথা ওঠে না। অবসর সময়, সে সময়ের মূল্য নাই, চরকা ঘুরিয়ে যে সূতা হত, সে সূতার দাম নাই—তুলার গাছ ঘরে ঘরে ছিল। এখন যদি মানুষ হও এক বৎসরের মধ্যে এমন করে তুলতে পারো যে ঘরে ঘরে তুলা হবে সেই তুলার সূতা হবে। কিন্তু নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে কি হবে, শুধু যুক্তি তর্কে কি হবে? বিশ্বাস চাই, কাজের ক্ষমতা চাই, শক্তি চাই। এর ভিতর প্রতিযোগিতার কথা নাই—আমরা প্রতিযোগিতা চাই না, চাই বিদেশীর হাত হতে মুক্তি পেতে—চাই অপবিত্রতা, মনুষ্যত্বহীনতার হাত হতে নিজেকে উদ্ধার করতে।

বিশ্বাস জাগাও, আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় কর—তা' হলেই যাহা এত অসম্ভব মনে করছ, তাহাই অবিলম্বে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।

অবিশ্বাসীর স্বরাজ লাভ

হে অবিশ্বাসী, স্বরাজ যে তোমাকে পেতেই হবে, এ যে তোমার বিধাতার দান, এ যে তোমার ধর্ম্ম। তুমি কি মনে কর তুমি স্বরাজের হাত থেকে এড়াতে পারবে? সে যে নিজেকে প্রবঞ্চনা করা, কারণ বিধাতার দান এই স্বরাজ, এ তোমাকে পেতেই হবে। সত্য পথে যদি যেতে না চাও, আজ

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান যদি না শুন, কাল তুমি কোথায় থাকবে? তখন যে অত্যাচারের মুখে তোমাকে জাগতেই হবে। ভগবান্ প্রেমের পথে আজ তোমাকে ডাকছেন, ইঙ্গিত করে তার কাছে তোমাকে ডাকছেন, তাই আজ যদি সে আহ্বানে বধির হয়ে থাক, শুনেও যদি তা না শুন, তবে কাল কি হবে তা একবার ভেবে দেখ। এই জনসাধারণ কি চুপ করে থাকবে? তোমার এতটুকু স্বার্থ যদি ত্যাগ না কর, ভগবান্ যে তোমাকে অত্যাচারের পথে কষ্টের পথে স্বরাজে নিয়ে যাবেন। স্বরাজ যে তোমাকে নিতেই হবে। তোমার ধর্ম্ম তোমাকে পালন করতেই হবে। যুগে যুগে ভগবানের বাণী স্বরাজের মধ্য দিয়েই যে তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে, যা তোমার ধর্ম্ম, তোমাকে তা গ্রাহ্য করতেই হবে। তুমি কতক্ষণ এড়িয়ে চলবে, যুগধর্ম্মকে কি কেউ এড়াতে পারে? আর মিথ্যা তর্ক জালে কতক্ষণ আপনাকে আবদ্ধ করে রাখবে! ভগবানের বাণী একদিন না একদিন প্রাণে জাগতেই হবে। আজ মহাত্মা গান্ধী শান্তির পথে তোমাকে ডাকছেন। মহাত্মার কথা শুন, শান্তির পথে নামো, স্বরাজ উদ্ধার কর। যারা স্বরাজ চায় না, যারা আজ তর্ক করছেন, ভয়ে ভীত হচ্ছেন, তারা হয় ত সরে যাবেন। যারা স্বরাজ চায় না, তাদের জীবনে কি লাভ কি ফল? তোমাদের যারা নায়ক, তারা ভুলে যাচ্ছে তারা নায়ক ততদিন যতদিন তারা নায়কের কাজ করবে। আজ যারা বিধাতার বাণীকে ফিরিয়ে দিয়েছে, আজ তারা নায়ক নয়, আজ জনসাধারণ নায়ক হবে। এই বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সব যদি ধ্বংস হয়ে যায়, মরেও যদি যায়, আমি চাই বাঙ্গলা জাগুক, নূতন শক্তি লাভ করে জেগে উঠুক, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ যদি যায় যাবে, বাঙ্গলার কেউ যদি না থাকে ত নাই থাকবে, কিন্তু বাঙ্গলা থাকবে, ভারত থাকবে। যে সাধনা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পত্রে পত্রে নিহিত, যার ইঙ্গিত আজ আমরা শুনতে পাচ্ছি, সে সাধনা জেগে উঠবে—জেগে উঠবে। এ যে বিধাতার লীলা, তুমি যদি সে লীলার সহচর হতে না চাও তুমি ভেসে যাবে, তুমি ত থাকবে না তুমি মরে যাবে। তাই বলছি আজ শান্তি পথে এস, আজ যদি না আস কাল তোমাকে আসতেই হবে। মৃত্যু তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান, ঐ শোন ভগবানের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, চেয়ে দেখ চারিদিকে এ জাতির জাতীয়ত্বের ধারা বয়ে যাচ্ছে, এ জাতি জাগবেই জাগবে। চেয়ে দেখ চারিদিকে রুদ্র শক্তির প্রচণ্ড লীলা! এ জাতি উঠবেই উঠবে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এ জাতি জেগেছে, এ জাতি উঠেছে। এই যে জনসাধারণ উঠে দাঁড়িয়েছে, ওরে ভীত, স্বার্থপর এখন তুই কি করবি?

"আয়, আয়, আয়, আজ যদি দুই বাহু দিয়ে তোদের আলিঙ্গন করে আমার মনের যত যাতনা আমার প্রাণের যত ব্যাকুলতা তোদের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতাম—কিন্তু ভগবান্ সে ক্ষমতা এখনও দেন নি। বিধাতা দেবেন, ভগবান ডেকেছেন। তুচ্ছ কর যত ভয় ভাবনা, যত ক্ষুদ্র স্বার্থ জমাট বেঁধে উঠেছে সব জঞ্জাল দূর করে দাও! নিজেকে জাগাও, আত্মাকে জাগাও, ভারতবর্ষে এই যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, এ জাতির সকল সত্য সকল সম্ভাবনাকে মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ কর। সেই তোমার একমাত্র পথ।

এক বৎসরে স্বরাজ

স্বরাজ্ যে আসবে, স্বরাজকে যে আস্তেই হবে সে বিশ্বাস হৃদয়ে জাগাও; তার আগে ধ্যান ধারণা কর—তার আগে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ যে, যতদিন স্বার্থত্যাগ না ক'রতে পার ততদিন বিধাতার কৃপা অবতরণ ক'রবে না। যে স্বার্থপর তাকে বিধাতা কখনও কৃপাবর্ষণ করেন না—যে নিজেকে নিবেদন না করে, যে নিজেকে উৎসর্গ না করে, যে জাতির উদ্ধারের জন্য সকল কষ্ট সহ্য না করে—মৃত্যু পর্য্যন্ত হাসিমুখে বরণ না করে, সে জাতির স্বরাজ উদ্ধার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বরাজ যদি চাও, ছাড় বৃথা তর্ক, জাগাও সে বিশ্বাস—জাগাও ভগবানের উপর বিশ্বাস—ভাববে পৃথিবীর সমস্ত জাতির যেমন একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা ধর্ম্ম আছে, একটা স্বভাব আছে—এই ভারতবর্ষের নবীন জাতি, এরও একটা অধিকার আছে, একটা কর্ত্তব্য আছে, একটা প্রকৃতি আছে, একটা স্বভাব আছে—তাকে উপলব্ধি কর। যেদিন এটা উপলব্ধি করবে—যে শুভ মুহূর্ত্তে ভারতের নরনারী সে স্বরাজকে—নিজের অন্তরের যে স্বরাজ—সে স্বরাজকে উপলব্ধি ক'রবে, সে মুহূর্ত্তে শুধু "ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট" কেন, জগতের সকল জাতি সে স্বরাজকে স্বীকার করবে—স্বীকার ক'রতেই হ'বে। তাই বলছি স্বরাজ হলে তারপর শাসন প্রণালী (System of Government); তখন এই নবীন জাতি যা চাইবে পাবে—গণতন্ত্র 'চাও গণতন্ত্র হবে। যত রকম শাসন প্রণালী হ'তে পারে, তার মধ্যে আমার মনের মধ্যে যেটা ভাল শাসন প্রণালী ব'লে মনে হবে—তাই পা'ব। আমার মনে যে শাসন প্রণালীর কথা জাগছে, সেটা কোন গণতন্ত্রের মত নয়—আজ পর্য্যন্ত যা দেখছি তার মত

নয় ; কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের এই নবীন জাতির যে প্রকৃতি—আমাদের যা আদর্শ—আমাদের প্রতি গৃহস্থের জীবনে যার প্রমাণ পাওয়া যায়—যার সঙ্গে একটা প্রাণের সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়, তার সঙ্গে মিলবে। সুতরাং কি যে শাসন প্রণালী হবে—কোন্ খানে ক্ষমতা থাকবে, কার হাতে থাকবে, ক'টা পুলিশ থাকবে—সৈন্য থাকবে কি না অথবা পুলিশ থাকা উচিত কি না—এসব কথা এখন ভাববার কি দরকার? আগে মন স্থির কর—আগে ভারতবর্ষের নরনারী এক কণ্ঠে স্বরাজের মন্ত্র উচ্চারণ কর—তোমাদের ক্ষমতা উপলব্ধি কর ; তারপর ক'টা পুলিশ থাকবে ক'টা সৈন্য থাকবে, ক'টা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকবে তার আলোচনা হবে। এখন ওসব কথা যারা ভাবে তারা স্বরাজে বিশ্বাস করে না—তারা বিশ্বাস করে বিলাতের ইতিহাস, তারা মনে করে যেন এমন একটা সম্বন্ধ বিলাতের সঙ্গে ভারতের আছে যাতে বিলাতের ইতিহাসের প্রবাহ অনুসারেই ভারতের ইতিহাস প্রবাহিত হ'য়ে চলবে, তাদের উন্নতি যে প্রকারে হয়েছে আমাদের উন্নতিও ঠিক সেই প্রকারে হবে। তারা স্বরাজের কথা কি জানবে? চণ্ডিদাসের একটি গান আছে ; আমি তাদের প্রতি সে গানটি নিবেদন করবো—সে গানটি এই :

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা ॥"

যারা স্বরাজ-সেবক—যারা মর্ম্মে মর্ম্মে স্বরাজের গৌরব অনুভব করে, তারা তাইতে মশগুল থাকে। কি কাজ তাদের সন্দেহে—কি কাজ তাদের তর্ক করে? তারা যে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে তারা প্রেমের বন্যায় ভেসে যাবে। তুমি যদি তাদের বল, ভাইরে এই যে বন্যা এ কি প্রকার, ইহার ব্যাপার কি, রকম কি, কোন দিকে স্রোত—এ সব জেনে তবে আমি বন্যায় ভেসে যাব—আমি জোর ক'রে বলি তাদের ঝাঁপ দাও, লাফিয়ে পড। আজ তুমি অঙ্ক কষ, আজ তুমি লজিক নিয়ে থাক, লেখ—তর্ক কর, যুক্তি কর—সময়ের অপব্যবহার করো—বোধ হয় বিধাতার বিশ্বে তারও কিছু আবশ্যক আছে, তাই তুমি করো ; কিন্তু যেদিন স্বরাজের ডাক শুনবে, সেদিন আর উপদেশ দিতে আসবে না—তর্ক করতে আসবে না—ভেসে চলে যাবে। এক বৎসরে স্বরাজ কি করে হবে—অসম্ভব কথা! তাঁরা বলেন এক বৎসরে হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন কাজ ক'রে লাভ কি—সুতরাং শুয়ে থাকা ভাল! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—শুয়ে

থাকা ভাল, কারণ এতে কোন ফল নেই—বৃথা পরিশ্রম করে লাভ কি! আমি তাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—একথা কি তাদের মনের কথা না একটা তর্কের কথা—একটা কাজ না করবার ছুতা? বাস্তবিক যদি প্রাণের কথা হয় তবে অবশ্য তাঁরা এ বিষয়ে ভেবেছেন। যদি তাঁদের মনে হয়ে থাকে এক বৎসরে হবে না অথচ তাঁরা স্বরাজ চান—স্বরাজের তৃষ্ণা তাঁদের মনে প্রাণে জেগেছে এমন যদি হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি ভেবেছেন কয় বৎসরে হবে? আমি যতজনকে জিজ্ঞাসা করি, বলে, বলতে পারিনে—ভাবিনি ইত্যাদি। তা' দ্বারা কি বুঝতে হবে? স্বরাজের তৃষ্ণা এখনও জাগে নি—তারা তৃষ্ণাতুর নয়, তাই তারা স্বরাজের স্বরূপ কামনা করে না—স্বরাজ অর্থে বুঝে, representative government, বিলাতের parliamentary government সে রকম parliamentary government বিলেত থেকে ভেসে আসে না। আমি বলি মনকে চোখ ধার দিও না—যেটা ওজর সেটাকে তর্ক ব'লে দাঁড় করিও না, মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দিও না। তুমি যদি বাস্তবিক স্বরাজ-প্রার্থী হও তবে ভাই এক বৎসরই কি আর পাঁচ বৎসরই কি, এযে তোমার জন্মের সাধনা। কর্ম্মক্ষেত্রে নাবনা কেন? যদি স্বরাজ-প্রার্থী হও, কার্য্য করতে হবে। বিধাতা কি ফলের মত আকাশ থেকে ফেলে দেবেন? স্বরাজ ত তোমাদের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে। যদি মনে কর এক বৎসরে হবে না—আচ্ছা পাঁচ, দশ অথবা পনের বৎসরেই হোক। যদি স্বরাজ চাও, কর্ম্মক্ষেত্রে নাব। ক্ষতি কি? বিধাতা যদি এক বৎসরে না দেন, পাঁচ বৎসরে দেবেন। আমার কথা মিথ্যা হোক তাতে কি আসে যায়? তোমার যা ধর্ম্ম, পালন কর—আমার যা ধর্ম্ম আমি পালন করছি। আমি বিশ্বাস করি এক বৎসরে হ'বে। আমার বিশ্বাস না হয় ভুল—তোমার বিশ্বাসই ঠিক। কিন্তু তোমার যে বিশ্বাস নেই—তোমার যে একেবারে বিশ্বাস নেই, সেই জন্যই গলদ। এ যদি বুঝতাম তোমরা স্বরাজ-প্রার্থী—স্বরাজ বাস্তবিক চাও, কিন্তু মনে কর যে এক বৎসরে সমস্ত কাজটা হয়ে উঠিবে না—এ যদি ধারণা করতাম, তাহলে তোমাদের হাত ধরে টেনে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাতাম, রেহাই দিতাম না—বলতাম এক বৎসরে না হোক, পাঁচ বৎসরে না হোক তাতে ক্ষতি কি? স্বরাজ ত চাই—স্বরাজ ত পেতেই হবে। বেলা যে বয়ে যায়—সময় যে আর নেই ভাই। এ শুভ মুহূর্ত্তে এস ভাই আজ দুঃখ মহলের ভিতর দিয়ে কারাগারের মধ্যে যে স্বাধীনতারূপী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে সকলে মিলে তা'কে আহ্বান করে নিয়ে আসি!

জেল-ভর্ত্তি

মহাত্মা গান্ধী বলছেন দেশ জেল-ভর্ত্তি কর, তবেই স্বরাজ আসবে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন জেলে গেলে স্বরাজ কি করে পাবে? স্বরাজের সঙ্গে জেলের সম্বন্ধ কি? এই কথা একবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেই স্বরাজের সব কথা বোঝা যায়। প্রথমেই বুঝতে হবে জেলের অর্থ কি? মহাত্মা গান্ধী এমন কথা বলেন নাই যে কোনও কারাগারে গেলেই স্বরাজ পাওয়া যাবে। তিনি শুধু এই কথাই বারবার বলছেন যদি স্বরাজ পেতে চাও, 'ইংরাজের' জেল ভর্ত্তি করে দাও অর্থাৎ আমরা যে বৃহৎ কারাগারে আছি এই কারাগার থেকে মুক্ত হতে হলে 'ইংরাজের' জেল ভর্ত্তি করতেই হবে। কেন? আমি বুঝিয়ে বলছি।

যারা ভারতবর্ষের অদৃষ্টে বিশ্বাস করে, তারাই জানে যে ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। ভারতবাসীর একটা বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম্ম আছে। ভারতবাসীকে সত্য ভাবে জীবনযাপন করতে হলে, তাদের এই যে স্বভাবধর্ম্ম তাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজেদের জীবন যদি নিজেরা যাপন করতে না পারি, তবে সে প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করা অসম্ভব। আজ যদি একবার ভেবে দেখি তাহলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আমাদের জাতীয় জীবনের এমন কক্ষ নাই, যেটাকে স্বাধীন বলতে পারি এবং যার উপরে পরে হাতের বা পায়ের ছাপ নাই। ছেলেদের শিক্ষাকার্য্য থেকে আরম্ভ করে বুড়াদের ধর্ম্ম আচরণ পর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ নাই যাহা আমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্ররূপ আমাদের নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্ম অবলম্বন করে সমাধা করতে পারি। তাই ভাবি সমস্ত দেশটাই এক বৃহৎ কারাগার। কিন্তু এই যে কারাগারে আছি এ বোধ আমাদের কয়জনের আছে? কয়জন বাস্তবিক অনুভব করে যে আমরা একটা বৃহৎ কারাগারের মধ্যে কোনও রকমে পরের অনুগ্রহে জীবন-যাপন করে থাকি। এখন অনেকের এই বোধ জন্মাচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অধিকাংশের মনে এই কারাগারের ভাব, এই দাসত্বের জ্বালা আগুনের মত জ্বলে না উঠবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জীবনকে স্বাধীন করতে পারব না—যেমন কারাগার তেমনি থেকে যাবে।

আমাদের জাতীয় জীবনকে স্বাধীন করবার চেষ্টাকে স্বরাজ বলে। স্বরাজ পেতে হলে স্বরাজ চাওয়া চাই। ভক্তেরা বলে থাকেন ভগবানকে চাইলেই পাওয়া যায়, তবে সে চাওয়া চাওয়ার মত চাওয়া হওয়া চাই। নিজের প্রাণের

পরতে পরতে হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে বুঝতে হবে যে স্বরাজ ছাড়া গতি নেই, স্বরাজ আমাদের পেতেই হবে। স্বরাজের চেয়ে বড় জীবনে আর কিছু নাই, থাকতেই পারে না। এমনি করে স্বরাজের জন্য এতটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙ্গে বেরুতে—আমাদের জাতীয় জীবনযাপনকে স্বাধীন মুক্ত করে দিতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুন যার প্রাণে জ্বলবে, তাকে ত ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে।

কেন? যারা জাতীয় ভাবে মনে মনে মুক্ত হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা আইন কানুনের বাধা ত আর মানতে পারে না। বিবেকবুদ্ধিকে কলুষিত করে যে বিধি সে বিধির নিষেধ সে ত প্রাণে পৌছাইতেই দেয় না। স্বরাজ তার সবার উপরে একমাত্র সাধনার বস্তু, তপস্যার সামগ্রী। সকল দুঃখ তখন তার সহায় হয়ে উঠে, সকল জ্বালা যন্ত্রণা তখন প্রদীপ হয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সকল ভয় পরাজিত হয়ে তখন তার চরণতলে ধুলো হয়ে গড়ায়। সে তখন বীরের মতন স্বরাজ উপার্জ্জন করবার জন্য এ বৃহৎ কারাগার থেকে ইংরাজের জেলে প্রবেশ করে।

রামপ্রসাদে আছে—

"লোকে করে সুখের গর্ব্ব,
আমি করি দুখের বড়াই।"

যে স্বরাজ চায় ঐ গানই তার প্রাণের গান। সে স্বরাজ চায় বলেই ইংরাজের জেলের বড়াই করে।

জেল ভর্ত্তি হলে কেমন করে স্বরাজ হবে! যখন দেশের সবগুলি জেল এই স্বরাজ প্রার্থীর দলে ভরে যাবে, তখন বুঝতে হবে দেশের অধিকাংশ লোক স্বরাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন বলে স্বরাজ-আকাঙ্খায় ভয় ভাবনাকে তুচ্ছ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আগেই বলেছি আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে মুহূর্ত্তে স্বরাজ চাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই স্বরাজ হবে।

জেল ভর্ত্তিতে স্বরাজ কেমন করে হবে? যেমন যে সব স্থানে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যায় না, সেখানে কতকগুলি কলসী ফুটা করে তাতে বালি দিয়ে একটার উপর আর একটা সাজিয়ে রাখে, আর প্রথমটাকে সেই অপরিষ্কার জলে পূর্ণ করে। পরে যখন ঐ জল একটার পর একটা কলসী দিয়ে বালি চুঁইয়ে শেষ কলসীতে এসে জমা হয়, তখন দেখা যায় সেই অপরিষ্কার জল বেশ নির্ম্মল হয়ে এসেছে। জেলও ঠিক তেমনি স্বরাজ প্রার্থীদের কাছে বালি ভরা শেষ কলসী, দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে যখনজেল থেকে

তাঁরা বেরুবেন তখন তাঁরা জাতীয় ভাবে মুক্তজীব, তখন তাঁরা স্বরাজের অধিকারী হয়ে স্বরাজ নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। নিজেরাও নির্ম্মল হবেন, দেশটাকেও নির্ম্মল করবেন।

বৃহত্তর কারাগার

আমাদের দেশ আজ একটা বৃহৎ কারাগার। কারাগার কার কাছে? যারা সুখের লোভে সংসারে বিচরণ করে, দু' পয়সা পেয়ে আনন্দে অধীর, ইংরেজের স্বেচ্ছাকৃত গোলাম হয়ে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাদের কাছে বাঙ্গলা দেশ কারাগার নয়। তারা মহা-অন্ধ, তারা বুঝতে পারে না—তাদের কাছে এ কারাগার স্বর্গ। যে দাস বা কৃতদাস সে সহসা বুঝতে পারে না যে, সে মানুষ। যে কুকুর বিড়ালের মত সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে, মনে ক'রে ইংরেজের গোলামি করে পরম কৃতার্থ হয়েছে—যারা স্কুল কলেজ পূর্ণ ক'রে রেখেছে, ইংরেজের আদালত ভর্ত্তি ক'রে রেখেছে—তারা কি দাসত্বের যাতনা জানে? সে যাতনা অনুভবের শক্তিও আমাদের লোপ পেয়েছে। যদি জানতে তবে বুঝতে পারতে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ এক বৃহৎ কারাগার। যে বুঝেছে—তার কাছে জেলই বা কি, আর জেলের বাহিরই বা কি? তার কাছে গৃহই কি, আর জেলই বা কি?

কারাগারে গেলে কেন মুক্তি হবে জান? যে দিন সমস্ত ভারতবর্ষের নরনারী বুঝতে পারবে যে স্বাধীনতার কাছে আর কিছু নাই, পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, জীবন ত্যাগ ক'রে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা মানুষের ধর্ম্ম, যে দিন স্বরাজের জন্য স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারত জেগে উঠবে, সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে এসে পড়বে। তবে সে যোগ্যতা চাই, সে আকুলতা চাই, সে গভীর আকাঙ্খা চাই—মুখের কথায় নয়, কাগজে পত্রে লিখে নয়, সে আকুল যাতনা প্রাণে অনুভব করা চাই। সে তৃষ্ণার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ ত্যাগ, দুঃখ-সহন।

আজ যদি আমি জিজ্ঞাসা করি তোমরা স্বরাজ চাও—সবাই বলবে 'হাঁ'। কিন্তু কাজে তার প্রমাণ চাই। স্বার্থ বলিদান চাই—যে নিজকে নিবেদন করবে, স্বরাজের জন্য মরতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হবে, তাদের চাওয়ার উপরই স্বরাজ আসবে। যে দিন ইংরেজের জেল ভর্ত্তি ক'রে দিবে—সেই দিন এতগুলি

লোক প্রমাণ করবে তারা স্বরাজ চায়। তারা হাসিমুখে মাত্র ছোট একটা জেলে যাবে—এই দেশ যে একটা মস্ত বড় জেল। যে দিন বুঝবে এটা বৃহত্তর কারাগার সে দিন ত আর তারা বাহিরে থাকবে না, তারা ইংরেজের ঐ ছোট জেলে যাবে। যারা জেলে যাবে তারা কারা? তারা স্বরাজ চায়—স্বরাজ তাদের দিবসের ভাবনা নিশীথের স্বপ্ন। তাদের জীবনের একমাত্র বস্তু। তাই ইংরেজের জেল ভর্ত্তি ক'রে দাও—এরূপ স্বরাজ সেবকের সংখ্যা প্রচুর হওয়া চাই—তবেই তোমার স্বরাজ আসবে।

অসহযোগীদের প্রতি

আপনাদের প্রতি আমার প্রথম ও শেষ কথা এই যে, আপনারা কখনও নির্ব্বিরোধ অসহযোগ মন্ত্র ত্যাগ করিবেন না। আমি জানি এই মন্ত্রের সাধনা করা কঠিন। আমি জানি সময়ে অপর পক্ষ হইতে উত্তেজনা এত বেশী আসে যে, কায়মনোবাক্যে নির্ব্বিরোধ থাকা অতীব কষ্টকর। কিন্তু এই আন্দোলনের সফলতা এই মহা সত্যের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক কর্ম্মীকেই ক্ষমা ও অহিংসার দ্বারা উত্তেজনার প্রভাব দমন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে আমরা খুব অভ্যস্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কোন নগরে কোন হাঙ্গামা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি, হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য গুণ্ডাদের উত্তেজিত করা হইয়াছিল। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই তথাকথিত গুণ্ডারাও আমাদেরই দেশের লোক। আমাদিগের এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে আমরা—অসহযোগীরা দেশটিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছি। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা জনসাধারণকে শান্ত সংযত রাখিতে যে পরিমাণে অসমর্থ হইব—তা' তাহারা গুণ্ডাই হউক আর যেই হউক—আমাদের অসহযোগ ব্রতও সেই পরিমাণে নিষ্ফল। দায়িত্ব সবই আমাদের। কেবল মুখে এ কথা বলিলে চলিবে না যে, দুষ্ট লোকে জনসাধারণকে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে। আপনারা কি একথা বুঝিতে পারিতেছেন না যে আমাদের আন্দোলনের সফলতা আমাদের কাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে? এবং সেই কাজটি এই যে, মন্দলোকই হউক আর ভাললোকই হউক অপর কোন লোকই জনসাধারণকে কিংবা তাহার কোন

অংশকে বিরোধ ও রক্তপাতের পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। আমরা যদি সাধারণের উপর আমাদের প্রভাব পরিচালন করিতে না পারি তবে আমরা সফলতার দাবী কেমন করিয়া করিতে পারি? আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমি আপনাদেরও নিরুৎসাহ করিতে চাই না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা এই সংগ্রাম শান্ত ভাবে চালাইবার উপযোগী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করুন; সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বিরোধে অসহযোগ ব্রত পালন করুন।

কলিকাতার ছাত্রগণের প্রতি

লালা লাজপৎ রায়ের গ্রেপ্তারে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার নিকট ইহার অর্থ গুরুতর। আমাদের সাফল্যে ব্যুরোক্রেসী অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। উহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ব্যুরোক্রেসী পরোক্ষ ভাবেই প্রহার করিতেছিল। এইবারকার প্রহার প্রত্যক্ষ। লাজপৎ রায় কংগ্রেস আন্দোলনের একটি স্তম্ভস্বরূপ। তাহাকে আঘাত করাতে কংগ্রেসকে আহত করা হইয়াছে। আমি আহ্লাদ সহকারে এই প্রত্যক্ষ আঘাত গ্রহণ করিতেছি। ইহা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সহিত ব্যুরোক্রেসীর বল পরীক্ষা সূচিত করিতেছে, কংগ্রেসের বর্ষ শেষ হইতে চলিতেছে, এখন তার ফল প্রকাশের সময় উপস্থিত। বাঙ্গলায় যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের গ্রেপ্তারই ঠিক এইরূপ গম্ভীর অর্থসূচক। উহারা পীর বাদসামিঞা এবং ডাক্তার সুরেশকে এক সঙ্গে হাতকড়া দিয়া ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছে; উহা যেন হিন্দু ও মুসলমানের একতা ও মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে থাকিয়া চট্টগ্রামের গৌরব ও বিজয় ঘোষণা করিতেছেন। জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রের ভাগ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। রঙ্গপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইতঃপূর্ব্বে এক সহস্র ভলান্টিয়ারকে কারাগারে লইয়া গিয়াছেন, আর বিশ হাজার ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তারের গৌরব লাভার্থ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কুমিল্লায় ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে আমাদের প্রভুদিগের বাসনার অতিরিক্ত লোক আত্মবলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার কি হইল ? এই প্রশ্নই আমাকে আজ বড়ই বিড়ম্বিত করিতেছে। কেবল পাঁচ হাজার মাত্র কর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছে ; এই বিশাল কলিকাতা সহরে এতগুলি স্কুল কলেজ থাকিতে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার। আজ ইহাদের মধ্যে ছয় জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহারা খদ্দর বেচিয়া চরকার প্রবর্ত্তনা করিয়া কংগ্রেসের কাজ বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই মহানগরীতে কেবল মাত্র পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, তাহার পরই কংগ্রেসের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতার ছাত্রগণের কি কিছুই বলিবার নাই? এখন কি পড়িবার সময় ? কলাবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র! কি লজ্জার কথা। জননী ডাকিতেছেন আর উহাদের সেই আহ্বান শ্রবণের হৃদয় নাই।

আমি এই মহানগরীতে আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছি। আমি যেখানে চাই, সেইখানেই আমার চতুষ্পার্শে সহস্র যুবক দেখিতে পাই, কিন্তু সংসার বুদ্ধিতে তাহাদের বদনে বার্দ্ধক্যচিহ্ন প্রকটিত, তাহাদের হৃদয় উৎসাহ শূন্য ও সজীবতা বিরহিত। আমার বাসনা এই যে, ভগবান যদি আমাকে উহাদের হৃদয়ে সজীবতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে আমি কলিকাতার এই সকল যুবককে আবার যৌবনসুলভ উৎসাহে সঞ্জীবিত করিতাম। সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে যুবকগণই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। যুবকরাই নিষ্পাপ এবং সর্ব্বদাই আত্মোৎসর্গের জন্য তৎপর।

আমি ক্রমশঃ বৃদ্ধ এবং জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছি, এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল মাত্র। উহারা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করে নাই, কিন্তু আমি আমার মণিবন্ধে হাতকড়া ও দেহে লৌহ-শৃঙ্খলের গুরুভার অনুভব করিতেছি। এই ত বন্ধনের বেদনা বিশাল কারাগার—আমি ধরা পড়ি কিনা তাহাতে কি আসে যায়।

একটি বিষয় নিশ্চিত আছে। আমি জীবিত থাকি বা মরি, কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতেই হইবে। কলিকাতায় মাত্র পাঁচ হাজার, তাহার পর কংগ্রেসের কার্য্য বন্ধ হইবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি কলিকাতার ছাত্রগণের কি উত্তর দিবার কিছু নাই ?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে

সভাপতির অভিভাষণ

(ফরিদপুর, ১৩৩২)

যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "মুক্তি কোন্ পথে ?" ইহাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রশ্ন। বেদের অতি প্রাচীনতম মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্য চরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য-মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য—কত বড় বড় রাজপ্রাসাদ আমাদের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে—আবার কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ—গতি-মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—তাহাও এক প্রচণ্ড গতি-পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দ্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে। শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

যুগের অবসানে অথবা যুগের প্রারম্ভে—ভারতবর্ষ আবার আজ সেই সনাতন প্রাচীন প্রশ্নই—নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—"মুক্তি কোন্ পথে ?" এই প্রশ্নের সমাধানে আবার কোন্ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে,—এবং কোন্ সাম্রাজ্যই বা ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তাহা ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। আমরা জানি না। নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ভাঙ্গা-গড়া-লইয়াই যদি ইতিহাস হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যদি ইতিহাস থাকে—তবে কোন কিছু ভাঙ্গিবেই, এবং কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিবেই, ইহা নিশ্চিত। ইহা সৃষ্টির নিয়ম। ভারতবর্ষ সৃষ্টির বাহিরে নয়। অনিয়মে ভারতবর্ষ চলিবে না।

আলোক ও অন্ধকারে মেশামিশি—প্রাচীন ভারতের যে অতীত অস্পষ্ট যুগ—তাহার মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে সে-সুস্পষ্ট বাণী—যুগের পর যুগে যে বাণী রূপ গ্রহণ করিয়াছে—রূপ হইতে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সেই রূপ, সেই বিগ্রহ—সেই সুর—সেই আরব মুক্তির—বন্ধনের নহে। ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের পরিবর্ত্তনশীল মায়া-

প্রপঞ্চ—প্রকৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু আলো ও আঁধারের মত যেখানে আসিতেছে—যাইতেছে; যাহা নশ্বর, যাহা দুদিনের, তাহাকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ভারতবর্ষ কোন দিন পরামর্শ দেয় নাই। যাহা দেখায় সত্য—অথচ মিথ্যা, তাহাকে ভারতবর্ষ মিথ্যা বলিয়াই জানিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে আত্মার মুক্তির পথ যে দুর্গম—ক্ষুরধার-শাণিত—তাহা জানিয়াও মুক্তিকামী ভারত সেই কণ্টকময় সঙ্কট-পথে বীরদম্ভে চলিয়া গিয়াছে। ভয় পায় নাই—থামে নাই—পশ্চাতে তাকায় নাই।

আজ আবার বর্ত্তমান ভারত মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টিভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে—"মুক্তি কোন্ পথে?" ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি-মুক্তি নয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সমষ্টি-মুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ—হে বাঙ্গালী, আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, আপনাদের সম্মুখে ভারতের এই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—এ সঙ্কটে, এ দুর্দ্দিনে, "মুক্তি কোন্ পথে?" আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেন না, অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে আমাদের জানিতে হইবে যে, কি আমরা চাই—এবং তাহা পাইবার জন্য কি আমাদের করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি চাহিয়াছে, বর্ত্তমান ভারতে সমগ্র ভারতের নরনারী—সমষ্টিভাবে সেইরূপ জাতীয় মুক্তি চাহিতেছে। ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, মুক্তির প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে, কি হইতে মুক্তি? সকলেই বলে যে, দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই—পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সেই পাপ করে। আমি আরও বলি, যে ক্লীব, ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সে-ও পাপ করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে—

"অন্যায় যে করে—আর অন্যায় যে সহে
তব দণ্ড যেন তারে বজ্র সম দহে।"

চিন্তার ধারায়, বিকাশের পথে একের পর আর অথবা যুগপৎ,—জাতীয় মুক্তি-প্রসঙ্গে অনেক রকম আদর্শ আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। Self-Government—Home-Rule Independence এবং Swaraj—ইহা

এক একটি কথা মাত্র। ইহার কোন্ কথাটি কি বুঝায়, তাহা না বুঝিতে পারিলে এবং বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে না করিলে যেমন সর্ব্বত্র তেমনি—আমি মনে করি, বিশেষভাবে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে, নিরর্থক কথা নিতান্তই ব্যর্থ। আর যদি এই সমস্ত অল্পাধিক সমতুল্য,—অথচ বিশ্লেষণ-মুখে বৈচিত্র্য-বহুল আদর্শগুলির গূঢ় ঈঙ্গিত স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে ঐ আদর্শ জাতীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—তাহা খুব বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

উপায়-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দুই শ্রেণীর মত এবং ঐ ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তি আছেন—আমি জানি। এক শ্রেণী বলেন—বৈধ এবং নিতান্ত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় মুক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অধ্যবসায় করা হউক। আর এক শ্রেণী বলেন—যে বৈধ হউক আর অবৈধই হউক—বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে স্বরাজ-লাভ অসম্ভব। অন্যান্য দু-এক শ্রেণীর মতবাদও যে দেখা না দিয়াছে, তাহা নয়। তবে তাহা এতদুর স্পষ্ট নয় যে, উল্লেখ করিতে পারি এবং উল্লেখ করিলেও আশঙ্কাও আছে যে, উহা আমার বা আপনাদের বোধগম্য হইবে না।

জাতীয় মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে এবং তাহা আয়ত্ত করিবার উপায় সম্বন্ধে আমি আমার যা অভিমত, তাহা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিতেছি। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে আমার অভিমত আপনাদের বিচার্য্য হইতে পারে—আশা করি। আমার অভিপ্রায় এই যে, বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলন মুক্তকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুক যে, আমাদের জাতীয় মুক্তির আদর্শ কি? এবং ঐ আদর্শ আয়ত্ত করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা, Independence-এর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে, Independence অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক। কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্ম (Postive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, Independence ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independent

অর্থাৎ অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে কোন উপায়েই হউক —ইংরেজরাজ এ দেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ চলিয়া গেলে আমরা অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার। স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজ-লাভ এক বস্তু নহে। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। কি বস্তুর এই উদ্ভব? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন—এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আমি আমার গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে পারি। আমি ঐ অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে একটা জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বড় বিস্ময়কর ঘটনা। কেন না, এখানে কালক্রমে একের পর আর এক কবির ভাষায়—"শক-হূণ-দল-পাঠান-মোগল" প্রভৃতি আসিয়া একত্র হইয়াছে। এখানে বৈচিত্র্য যে শুধু বেশী, তাহা নয়। বড় অদ্ভুত রকমের। সুতরাং জীবন-ধর্ম্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশী, সেখানে ঐক্যও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ় হইতে হইবে। এই ঐক্যই ত জাতীয়তা। ভারতবর্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা-কল্পে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাতীয় একতা অনেক গুণে বেশী হওয়া দরকার, কেন না, অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্য নাই। যেখানে বৈচিত্র্য অল্প—বা সহজ বা সাধারণ রকমের, সেখানে অল্প একতাতেই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। বিধাতার ইচ্ছায় যাহা কঠিন, ভারতবর্ষকে এ যুগে তাহাই সম্ভব করিতে হইবে এবং ইহা ভারতবর্ষকে সম্ভব করিতেই হইবে,—কেন না, বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার উপর মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-জাতিগুলির পরস্পর মিলন একান্ত নির্ভর করিতেছে। আমার মনে হয়—ভারতবর্ষে যদি এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা না হয়—তবে League of Nations প্রভৃতি যাহার পূর্ব্বাভাস বা সূচনা মাত্র, সেই মানবজাতির বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী খণ্ড জাতিগুলির ভবিষ্যৎ মিলন—নিতান্তই আকাশকুসুম।

আমি আবার বলি, ভারতবর্ষে একজাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধা নহে। বৈচিত্র্য যত বেশী, ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে। আমরা ইহা করিব। বিধাতা দায়স্বরূপ এই গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ভারতবাসীর ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া

পালন করা কর্ত্তব্য। ভারতের এই বিভিন্ন ধর্ম্ম,—ভাষা,—ব্যবহার ; এই বৃহৎ ভৌগোলিক আয়তন—ইহার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান—সমন্বয়সংঘটন করা হইতে পারে, কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কিঞ্চিৎ কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্লেশকর ভ্রমণ—তথাপি আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, ইহা ব্যতীত স্বরাজলাভ সম্ভব হইবে না। এইখানেই এবং এই প্রসঙ্গে এ যুগে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তাঁহার বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অধিক বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় মনীষা,—তাঁহার অনুপম দেব-চরিত্র, তাঁহার অমানুষিক কার্য করিবার ক্ষমতার নিকট আমরা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়াও একটা গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করি। তবে মহাত্মা গান্ধীর নামে কেবলমাত্র গৌরব ও গর্ব্ব করিয়া কালকর্ত্তন সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। ভারতবর্ষে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি যে সৃষ্টি বা গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি আমাদিগকে পালন করিতে বলিয়াছেন—তাহা না করিতে পারিলে আশঙ্কা হয়—আমাদের এবারকার আয়োজন-উদ্যোগে বুঝি বা ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্য-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ আমি আর আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি না ! কেন না, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহাত্মা স্বয়ং এখানে উপস্থিত এবং তাঁহার মুখ হইতেই তাঁহার বাণী—আমরা শুনিতে পাইব। তাঁহার গঠনমূলক পদ্ধতির সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত ; এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সমস্ত দেশবাসীকে মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি। শুধু মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ যথেষ্ট নহে।

যাহা হউক, জাতীয় মুক্তির আদর্শ আলোচনার প্রসঙ্গে Independence এর আদর্শের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার (Order) বড় অভাব বলিয়া বোধ হয়। যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই বিবিধ উপকরণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে—এক সুমহান ঐক্যস্থাপনের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা স্পষ্ট আমাদের বুঝা উচিত যে, যাহা আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি, তাহার সহিত যেন আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক আবেষ্টন, তাহার মিল থাকে। আমার মনে হয়, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম বা সভ্যতার লোকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্যসংস্থাপনের জন্য প্রথমতঃ—আমাদের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ—এই জাতীয় একতা-স্থাপনের জন্য আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলি না—যে, তাহার জন্য আমাদের দুই হাজার বৎসর অতীতে

ফিরিয়া যাইতে হইবে। যখনই এই রকম কথা আমি বলিয়াছি, তখনই অনেকে আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহা নয়। আমাদিগকে সম্মুখে নবযুগের মহামিলনের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। তাহাকে রক্ষা করিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন—এই যে শৃঙ্খলার (order) কথা আমি বলিতেছি—ইহা ইউরোপে যে ভাবে দেখা দিয়াছে, যে আকারে ফুটিয়াছে, ভারতবর্ষে সেইরূপ হইলে চলিবে না। ইউরোপের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে যে শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহার মূলে একটা সামরিক (Military) ভাব বা অভিযান যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমাজ ও শাসনযন্ত্রও এইরূপ একটা সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং রক্ষা পাইতেছে। আপনারা কেহ যেন মনে না করেন—যে, এই প্রসঙ্গে আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিন্দা করিতেছি। ইউরোপের, তথা ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের যে বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ে, আমি তাহার কথাই বলিতেছি মাত্র। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁহারা রক্ষা করিবেন, চাই কি বৃদ্ধিও করিবেন এবং করিতেছেনও। সমস্ত মানব-সমাজের মধ্যে একটা ঐক্য থাকিলেও তাহাদের পথ আমাদের নয় এবং আমাদের পথ তাহাদের নয়। তাহারা তাহাদের পথে চলিবে—আমরা আমাদের পথে চলিব। উদ্দেশ্য এক। তবে পথ কিছু ভিন্ন। তৃতীয়তঃ—আমাদের পথে অগ্রসর হইতে কোন বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারিবে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে Independence-এর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে—যাহা Independence-এর আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। Home-Rule এবং Self-Governmentএর যে আদর্শ, তাহার মধ্যে আমি যেন ত্রুটি দেখিতে পাই। এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে, স্বরাজের আদর্শেও তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে Rule অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া উঠে—তা সে শাসন ঘরেরই (Home) হউক অথবা পরেরই (Foreign) হউক। Self-Governmentএর বিরুদ্ধেও আমার ঐরূপ আপত্তি। কিন্তু কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্তই যদি Self-Government হয়, তবে আমার আপত্তি বড় টিকে না—সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজের

আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে।

তার পরে প্রশ্ন এই—আমরা যে জাতীয় মুক্তি লাভ করিব, তাহা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না তাহার বাহিরে গিয়া? কংগ্রেস ইহার উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার, তাহা যদি বৃটিশসাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে—তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে। কেন না, জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে—ইহা নিশ্চিত। আমরা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিব—কি সাম্রাজ্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িব—ইহার উত্তর আমাদের অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহারাই বেশী করিয়া বলিতে পারেন। একটা জাতি হিসাবে আমাদের জীবনধারণ করিতেই হইবে। শুধু জাতীয়-জীবনধারণ নয়—জীবনকে প্রসার করিতে হইবে, পরিপূর্ণ করিতে হইবে; জাতীয় জীবনের এই বিকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়—তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়—সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়-জীবনকে পিষিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় কি?

কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি, তবে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ। বাহ্যসম্পদ লাভের সুযোগ ও সুবিধার জন্য, স্বেচ্ছায় খণ্ডরাজ্যগুলি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়। সুতরাং এই স্বাধীন চুক্তিমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছামত খণ্ডরাজ্যগুলি অসুবিধা বুঝিলে, সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যখন খুসি চলিয়া যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার একটা ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কি সাম্রাজ্যবাদী, কি খণ্ড ও স্বতন্ত্র রাজ্যবাদিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, উভয়ের পক্ষেই স্বাধীনতা-মূলক যুক্তিসর্ত্তে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর জাতিসকলের বর্ত্তমান অবস্থায়, কোন এক

দেশ বা জাতিই অন্তের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথকভাবে থাকিতে পারে না—বাঁচিতে পারে না এবং এই আদর্শের অনুপাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া—ও তাহার উন্নতিকল্পে কোনরূপ বাধা না পাইয়া, যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে।

আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য আর একটি বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে—আধ্যাত্মিক। আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানবজাতির একটা মহা-মিলনের যে স্বপ্ন,—তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে—তবে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে এক অখণ্ড সুমহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় কিছু কল্পনায় বা ধারণায় আসে না। যদি প্রত্যেক জাতির উদারহৃদয় ও অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি-গণ এই কার্য্যে ব্রতী হন—তবে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য আপাততঃ কোন কোন দিকে কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদীগণ অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে দাসের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি লইয়া যে দেখা, তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করিবেন। আমি মনে করি—ভারতের মঙ্গলের জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হইলে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি মানবজাতিকে যে ভাবে সাহায্য করিতে পারে—ভারতবাসীও তাহা করিবেই এবং সম্ভবতঃ তাহার অতিরিক্তও কিছু করিবে। কেন না, মানবজাতি ভবিষ্যৎ মহামিলনের একটা আদর্শ—ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইবে।

এক্ষণে জাতীয়-মুক্তির আদর্শ ছাড়িয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত করিব। আমার নিজের এইরূপ ধারণা যে, উপায়কে আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। উপায় আদর্শেরই একটা অংশ। কেন না, যখনই আমরা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদের

মনের সম্মুখে উদ্দেশ্যে বা আদর্শ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—যে, উপায় উদ্দেশ্য ছাড়া নহে। উদ্দেশ্য বা আদর্শের একটা অংশ।

এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়—তবে হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না—বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসা-মূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের ইতিহাস কোন বালকে পাঠ করিলেও আপনাদিগকে বলিয়া দিবে যে, ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিস জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ—তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ—তাহা অবশ্যই পৃথক করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমন ভাবে নাই, যেমন ইউরোপে আছে। এই হিংসামূলক অবাধ্যতা দূর করিবার জন্য ইউরোপে যে আইনের সাহায্য লওয়া হয়—সে আইনের ভিত্তিও পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আসিতেছি। প্রাচীনতার প্রতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে। কতকটা এই গতানুগতিকভাবের জন্যই হিংসার ভাব আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কম। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংসভাবে কাজ করিবার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিই—ফুল যে রকম আপনিই ফুটে—সেই রকম আপনা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য লইয়া তর্ক করিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন—ভূভূক্ষু আত্মা—সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছে! কলহ ও বাদবিসংবাদ—সালিশগণের সুপরামর্শে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এই-রূপ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে কোন উপায় এখন অবলম্বন করা যাইবে, তাহা যে শুধু নীতির বিরোধী হইবে, তাহা নয়,—তাহা ব্যর্থ হইবে। কোন ফল প্রসব করিবে না।

আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—যে, হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয়মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও—ইহা কিরূপে সম্ভব যে, নিরস্ত্র

একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত, গবর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ড হিংসামূলক—প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষেরা তীর, ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ঐ উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও এই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।

তারপর ভারতবর্ষে জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের কথা আমি বলিয়াছি—এবং যাহা ব্যতীত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা, হিংসামূলক কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্ভব হইবে। আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমন-নীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজ লাভ করিবার যে আকাঙ্খা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াও যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে সমস্ত যুবকগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আপামর সাধারণ দেশবাসী কি তাঁহাদের পক্ষ লইবে? যখন জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে, তখন যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ছায়ার ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকিবে না। সুতরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্য্যকরী হইবে না, কিন্তু আমার কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যের সততা এবং স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যের আমি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করিতেছি তাহা নহে। আমি শুধু বলিতে চাই যে, এই উপায় আমাদের প্রকৃতির সহিত মিলিবে না, আমাদের ধাতে সহিবে না, সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা শুধু "সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র।" বাঙ্গলায় বিদ্রোহমূলক উপায়ের প্রতি আশা স্থাপন করিয়া আছেন যে সকল যুবকগণ, তাঁহাদিগকে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, ঐরূপ আশা যেন তাঁহারা অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন। আর বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলনকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, এই উপায়ে স্বরাজলাভ কোন মতেই করা যাইবে না।

কিন্তু আমি যেমন হিংসামূলক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ

করিলাম, তেমনই আমি না বলিয়া পারি না যে, গবর্ণমেণ্টের হিংসামূলক শাসনপদ্ধতিই বাঙ্গলা দেশে প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার স্মরণ হয় যে, অধ্যাপক Dicey এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজ-জাতি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর যে একটা সম্ভ্রম, তাহা খুব বেশী রকম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যবস্থা-প্রণয়নকার্য্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, আদালতের যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল, এখন তাহা অনেকাংশে খর্ব্ব করা হইয়াছে। ইহাতে আইন-রক্ষার প্রতি পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই প্রমাণ হয়। বস্তুতঃ হিংসা দ্বারা হিংসারই সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাশক্তির ন্যায্য দাবী, ন্যায্য আন্দোলনে—অযথা বে-আইনী রকমে বাধা প্রদান করেন, তবে অধ্যাপক Dicey-র কথায় প্রজাশক্তির মধ্যে বে-আইনী অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করিবার একটা স্পৃহা আপনা হইতেই সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতিহাস, বিশেষভাবে বাঙ্গলার ইতিহাস অধ্যাপক Dicey-র কথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে এই রাজদ্রোহিতা, এই বিদ্রোহের আবহাওয়া এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই। যেমন অন্যদেশে, তেমনই এখানেও, এই আবহাওয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম স্তরে একটা সাধারণ রকম অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ শতবর্ষব্যাপী ইংরাজ-শাসনের ফল। কেন না, প্রায় দীর্ঘ একটি শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজরাজ, ইংরাজ দ্বারা ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য এ দেশ শাসন করিয়াছেন মাত্র। এই অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য ১৮৫৮ খৃঃ, সিপাহী-বিদ্রোহের পর আরও ঘনীভূত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃঃ কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ইংলণ্ডের রাজার অধীনে যাইয়া পড়ে। বিশেষভাবে এই সময় হইতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া যুগের বেশীর ভাগ—ভারতবর্ষকে এক বিদেশীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসন করা হইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। এই যুগের ইংরাজ শাসনের বিশেষত্ব যে কেবল ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, তাহা নহে—ইহার সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের শেষাশেষি,—প্রজার হিতের জন্য কতকগুলি সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি—আপনারাও জানেন। যেমন—Lord Ripon-এর Repeal of the Vernacular Press Act. The Inauguration of the Local

Self-Government, The Ilbert Bill, এবং Revision of the Indian Councils Act. 1891, ইহা Lord Lansdown-এর সময়ে হইয়াছিল। ইহাকে আমি কতকটা Benevolent Despotism বলিতে চাহি। কেন না, এই সমস্ত সংস্কারের ভিতরকার কথা ছিল—আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাইয়া আমলাতন্ত্রের শক্তিকে আরও অপ্রতিহত করিয়া তোলা। কেবল এক Local Self-Government-ই প্রজার হিতের জন্য বলিয়া ইতিহাসে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যদি তলাইয়া দেখা যায়—তবে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে—ইহা মুখে যত বলে—কাজে তাহা কিছুই করে না।

প্রকৃতপক্ষে Local Self-Government-এর ব্যাপারে আমলাতন্ত্র এমন কোন ক্ষমতাই প্রজার হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই, যাহা দ্বারা প্রজা নিজের ইচ্ছামত নিজেদের কোন হিতসাধন করিতে পারে! অন্যদিকে Lord Lytton-এর Vernacular Press Act এবং Lord Dufferin-এর শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতের উপর ঘৃণাসূচক উক্তি ও তাচ্ছিল্য এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে অতি নীচ মনের পরিচয়, এ সমস্তই পরবর্ত্তীকালের ঘনীভূত বিদ্রোহমূলক আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে একের পর আর সাহায্য করিয়া আসিতেছিল।

তারপর আমরা দ্বিতীয় স্তরে আসিতেছি। ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির মধ্যে বিদ্রোহের আবহাওয়াকে এই দ্বিতীয় স্তরে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া, ইহাকে উদ্বোধন করিবার ভার লইয়াছিলেন—লর্ড কার্জ্জন। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতা ও দাম্ভিকতাই এহ দ্বিতীয় স্তরের রাজদ্রোহিতার প্রবর্ত্তক। তিনিই লাটদিগের মধ্যে প্রথম শাসনকার্য্যের সুবিধাকে (Administrative efficiency) প্রজাদের হিতের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তিনি এই শাসনকার্য্যের সুবিধারূপ ধূয়া ধরিলেন—অন্যদিকে শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অতি যথেচ্ছ রকমে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রজাশক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাতীয় আন্দোলনকে—সারকুলারের পর সারকুলার জারী করিয়া তাহাকে যেন গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ইহা একদিকে প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত করিল—অন্য দিকে দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতার এক বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল। যাহা বীজাকারে ছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইল। ইহাই রাজদ্রোহিতার ভাবধারার দ্বিতীয় স্তরের দ্যোতনা।

লর্ড কার্জ্জনের পর আমরা তৃতীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হইতেছি। বীজে অঙ্কুরোদগম হইয়াছে। গর্ত্তে লুকাইয়াছিল যে সাপ—লর্ড কার্জ্জন বাঁশী বাজাইয়া তাহাকে গর্ত্ত হইতে সাধ করিয়া বাহিরে আনিয়াছেন। সাপিনী ফণা তুলিয়াছে। একটা দংশন না করিয়া সে যায় কোথায়? তৃতীয় স্তরের লক্ষণ যে, যাহা ভাবাকারে আবহাওয়ার মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছিল—তাহা একটা বিষাক্ত দংশনে অতি ক্ষুদ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে—আমলাতন্ত্র তাহার হিংস্রমূর্ত্তির যে কোমল মসৃণ মকমলের বহিরাবরণ, তাহাও দূরে ফেলিয়া দিল—এক নগ্ন বীভৎসতা সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙ্গলার যুবকদের মধ্যে এক শ্রেণী ইহাতে ভীত হইল না, কিন্তু তাহারা অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বোমা ও রিভলভার হস্তে ধাবমান হইল। কাহারও নিষেধ শুনিল না। ইহাই তৃতীয় স্তর।

ভারতে রাজবিদ্রোহের মূলে যে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ ও বিকাশ আমি দেখাইলাম, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ঘাত-সংঘাতের দানবীয় লীলাভিনয় আপনারা দেখিলেন, ইহাকে আরও সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হইবে, যদি আপনারা আরও দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন। ইহা সত্য যে, রাজশক্তির অবিমৃষ্য-কারিতা, হঠকারিতা, অযথা নির্ব্বিচারে সমস্ত দেশের উপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ বা অপ-প্রয়োগ, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অসীম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা হইতেই রাজদ্রোহের আবহাওয়া জন্মলাভ করিয়াছে। তথাপি—ভারতের বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও এই সম্পর্কে আমাদের মনে না আসিয়া পারে না। যেমন ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান কর্ত্তৃক রুসের পরাজয়, তাহার ফলে সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ডে একটা নবজাগরণের সূত্রপাত—মিশরের স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীরদিগের গরিলা যুদ্ধের সফলতা, আয়রলণ্ডের প্রজাতন্ত্র-বাদীদের বিদ্রোহমূলক প্রচেষ্টা এবং সোভিয়েট রাসিয়ার পৃথিবী-কম্পনকারী বলসেভিক অভিযান, সর্ব্বশেষে এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের সিংহাসনতলে ইংরাজ ও গ্রীক জাতির নতজানু হইয়া অবস্থান, ইহা সমস্তই একের পর আর আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে—উঠিতেছে। তাহার ফলে এক শ্রেণীর ভারতবাসী চিন্তা করিতেছেন, যে কোন উপায়েই হউক, আমরাও স্বাধীনতা লাভ করিব।

আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এই সম্পর্কে ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ এই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে,

তাহার একটা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা আমি আমার অভিভাষণের পরিশিষ্টভাগে দিলাম। ১৯০৯ খৃঃ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমি ঐ তালিকাতে দেই নাই। আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত ঘটনা ইহারই মধ্যে আপনারা ভুলিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯১২ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়। দিল্লী চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। Defence of India Actএ বহু লোককে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়—রাউলাট আইন পাশ করা হয়,—জালিওয়ানালাবাগের লোমহর্ষণ বর্ব্বর-সুলভ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়, কোমাগাটা মেরু, চরমাইনারের ঘটনা—এ সমস্তই আপনাদের স্মরণ আছে।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজ-দ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে। খালি তাই নয়,—যখনই গবর্ণমেণ্ট আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাশ করেন—আবার ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থন করিয়া আর একটা আইনও পাশ হয়।

জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরেই মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভের জন্য এ যুগে আবার নূতন করিয়া এক অহিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলেই আশা করি যে, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধীর এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। করিবে কি,—করিয়াছে। হিংসামূলক পদ্ধতি—কি গবর্ণমেণ্ট এবং কি হিংসা-মূলক বিদ্রোহীভাবাপন্ন ভারতবাসী, উভয়েই ইহা পরিত্যাগ করিবেন। কেন না, ইহা দ্বারা কেহই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

এই যে নূতন ordinance Act, ইহার দ্বারা ভারতবাসীর উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। ইহার মূলে কোন বিচারবুদ্ধি নাই। সমগ্র ভারত একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের ভাব যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে আমি ভরসা পাই না। কেন না, আমি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছি যে, খুব সংযত ভাষায় আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহার উচ্ছেদ কামনা করি। Lord Birkenhead ভারত গবর্ণমেণ্টের এই দমননীতিমূলক আইন সমর্থন করিয়া আমাকে এই গবর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিবার জন্য যে সাদর আহ্বান করিয়াছেন—তাহার উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি—কোন ভারতবাসীই তাহার উত্তরে

অনুরূপ বলিতে পারে না।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে—Lord Birkenhead বলিয়াছেন যে, এই Ordinance আইন দ্বারা কেবল অপরাধী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই অসুবিধা ভোগ করিবে না। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবার স্পর্দ্ধা করি যে, Lord Birkenhead এ ক্ষেত্রে অতি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহাদিগকে এই Ordinance আইনের বলে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়, আমরা স্বীকার করি না যে, তাহারা অপরাধী। তাহারা অপরাধী কি, না —তাহা বিচারের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারে না। পুলিস বা সি, আই, ডি-র গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিচার নহে—অপরাধ সাব্যস্ত নহে। ইহা অবিচার। ইহা অত্যাচার। ইহা সভ্যতাভিমানী-ন্যায়বিচারাভিমানী সমগ্র ইংরাজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য সাক্ষী প্রমাণ লইয়া প্রকাশ্য আদালতে বিচার হউক। ইহা অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সুবোধ বালকেও ইহা বুঝিতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা কেবল আদালতের হস্তেই ন্যস্ত। আদালত বিচার করিয়া যাহা স্থির করিবে—Executive বা শাসনবিভাগ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে মাত্র। কিন্তু যদি Executive বা শাসনবিভাগ নিজেই বিচার করিতে বসে —যিনি হুকুম পালন করিবেন, তিনিই যদি হঠাৎ হুকুম করিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রজার স্বাধীনতাকে এমন যথেচ্ছ নিষ্ঠুরভাবে অপহরণ করা হয় যে, সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ইতিহাস-লেখকগণ খুব বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই লিখিয়াছেন। Lord Birkenhead তাঁহার নিজের দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, এমন কথা কোন্ অর্ব্বাচীন বলিতে সাহস করিবে?

যখনই নূতন করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটা দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, তখনই তাহার সমর্থনের জন্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে। সেই সব ঘটনার প্রত্যেকটির কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি আমি করিব না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু Bengal Ordinance সম্বন্ধে Legislative Assemblyতে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহাতে এ বিষয়ে খুব বিস্তৃত রকমের সব কথাই তিনি বলিয়াছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে সেই বক্তৃতাটি পড়িতে বলি। কেন না, তাহাতে পণ্ডিতজী গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ ঘটনা

হইতে কোনমতেই কোন প্রকারে দমন-নীতি প্রয়োগের অজুহাত বা অছিলা পাওয়া যাইতে পারে না। দমন-নীতি প্রয়োগের সময় গবর্ণমেণ্ট যে কৈফিয়ৎ ও যে ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। ১৯০৮ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর—স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ৯ জন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। লর্ড মর্লি তখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। এই সম্পর্কে Lord Mintoকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি ৯ জন ব্যক্তিকে, এক বৎসর হইল কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, আপান বিশ্বাস করেন যে, তাহারা রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত অবৈধরূপে সংশ্লিষ্ট আছে এবং আপনি আরও বিশ্বাস করেন যে, তাহা-দিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে, উল্লিখিত ষড়যন্ত্রগুলির দমন হইবে।"

এখন আপনারা শুনুন, Sir Hugh Stephenson এই সম্পর্কে Bengal Councilএ মাত্র সে দিন কি সব কথা বলিয়াছেন।—

—"আমাদের দমন-নীতির অবলম্বিত উপায়ের অপ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমি তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম দুইটি অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পর্কে। সংবাদপত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না যে, এই দুই জন রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত কোন প্রকারে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে পুলিসের গোপন সংবাদ সম্পূর্ণই মিথ্যা এবং পুলিসের এই প্রকার গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া তখন যেরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রতারিত হইয়াছিলেন—এখনও সেইরূপ হইতে পারেন। আমি বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে জানিতাম না। কিন্তু আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই—ইহা আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহাতে কৃষ্ণবাবু, কি অশ্বিনীকুমার দত্ত কেহই রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রকে উৎসাহ দিবার—বিশেষতঃ উক্ত ষড়যন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে থাকিবার অভিযোগ কেহই করে নাই। অশ্বিনী-কুমার দত্ত সম্বন্ধে Bengal Government যে Regulation IIIর প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, অশ্বিনীবাবু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা স্থানে বক্তৃতায় এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছিলেন।"

সুতরাং ইহা প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, এ দেশে অবৈধ আইন প্রচলন

করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে এবং সেই সঙ্গে ঐ অবৈধ আইনের অপ-প্রয়োগেরও যথেষ্ট অবসর আছে। আমাদের যেরূপ অবস্থা—আর গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ব্যবস্থা—তাহাতে এরূপ না হইয়া যায় না। জগতের ইতিহাস এই কথারই প্রমাণ দেয় যে, আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই—আইন ও শৃঙ্খলার ("Law and Order") অজুহাতে তাহাদের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করে। আইন ও শৃঙ্খলা—কথাটি শুনিতে খুব ভাল। কিন্তু আমাদের মত দেশে—যেখানে (আইনের রাজত্ব, "Rule of Law" নাই—সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার নামে—আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা-মদ-মত্ত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে অপব্যবহার ও অত্যাচারে পরিণত করে মাত্র। আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার এক উপায়—দমন-নীতির প্রয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের এই অযথা হিংসামূলক দমন-নীতির প্রয়োগকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। যেমন আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের পক্ষ হইতে হিংসামূলক রাজদ্রোহিতাকেও ঘৃণা করি। আমি গবর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা দায়িত্ব অনুভব করিতেছি যে, অযথা দমন-নীতির প্রয়োগ রাজ্য-শাসনের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। অতি অল্পসময়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহার বলে—আপন ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি আশা করি, Lord Birkenhead মনে মনে বুঝিতে পারেন যে—এ উপায়ে রাজ্যশাসন চলিবে না।

যাহা হউক—জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনা আমি করিয়াছি। হিংসা-মূলক রাজ-দ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, এই উপায় প্রথমতঃ নীতিবিরোধী; দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। ইহা নীতি-বিরোধী; কেন না, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না, কারণ, ইহা করা যাইতে পারে না যে, আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলভারের গুলীতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।

তার পর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন—তবে 'মুক্তি কোন্ পথে?' কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব? খুব বিজ্ঞতার সহিত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, Reform Act অনুযায়ী গবর্ণ-মেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিলেই স্বরাজ একেবারে আমাদের হাতের

মুঠোর মধ্যে। ইহার উত্তরে আমার যাহা বলিবার—তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া আবার আমি আপনাদিগকে বলিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি না যে কেহ এই প্রসঙ্গে আমার অভিপ্রায়কে অস্পষ্ট-দোষে দোষী করেন। আমি যদি বুঝিতাম, এই Reform Actএ সত্যিকার কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য্য করিতেস্বীকৃত হইয়া Council Chamber এর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীদিগকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই। Reform Act যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা আবার আজ আপনাদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার করিব না। আপনারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশ ইহা আপনাদিগকে দেখাইয়াছে। দেখাইতে পারিয়াছে। আপনারা যদি এ সম্বন্ধে যুক্তি চান—বিচার করিতে চান—তবে আমি আমার আমেদাবাদ কংগ্রেসের বক্তৃতা আবার আপনাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে বলিব মাত্র, যদি আরও নিঃসংশয় হইতে চান, তাহা হইলে Muddiman committeeর সমক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহা আর একবার পাঠ করিবেন এবং এমন সমস্ত লোক ঐ সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, স্বয়ং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের ধীরতা ও রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় করিতে পারেন না। বর্ত্তমান Reform Actএর আসল কথা হইতেছে এই যে, গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিদিগকে বিশ্বাস করে না। অবিশ্বাস করে এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্রে কাজ করিবার কথা মুখেও আনা যায় না। তথাপি গবর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করা সম্বন্ধে আমার মত আমি সুস্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। আমি আশা করি, বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলন আমার সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতই প্রকাশ করিবে। আমার কথা এই যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই—কেবল যদি গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোন বাধা না দেন। তবে এই একত্রে কাজ করাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের আমাদের

প্রতি মনের ভাব যথার্থরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া চাই,—দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে এমন ভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।

আমি বরাবর বলিয়াছি যে, গঠন-মূলক কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে, স্বাধীনতালাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান, খুব বেশী সময় নয়। অবশ্য সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজলাভের ভিত্তি যদি এখনই প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের ও গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। আমি জানি, আপনারা বলিবেন—'মনপরিবর্ত্তন' একটা সুন্দর কথা মাত্র। উহার কোন অর্থ নাই, প্রকৃত কাজে উহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য—এবং আমিও ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাজে পরিচয় দিবার জন্য, রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি প্রয়োজন। এই আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে—যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া একটা মিট-মাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয় দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয় দলেই অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীর ও শান্ত-ভাবে সত্য যদি কোন আপোষের প্রস্তাব হয়—তবে তাহার সার্থকতার জন্য, আমি মনে করি, সেই আপোষের সর্ত্ত (terms) গুলি অপেক্ষা, ঐ সমস্ত সর্ত্তের (terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয় পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলতার কোন সদুপায় আমি ত দেখি না। বর্ত্তমান অবস্থায়—এখনই আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে কোন সর্ত্ত (terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সত্যি কর্ত্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আসে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া—শান্তভাবে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, তবে আপোষের সর্ত্তগুলিকে স্থিরনিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অধিক কালবিলম্ব হইবে না।

বাঙ্গলা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি—তাহাতে আভাসে কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণ-

স্বরূপ—রাজনৈতিক বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার কোন নড়চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ—পূর্ণ স্বরাজ লাভের পূর্ব্বে—ইতিমধ্যে যখনই—আমাদের শাসন-যন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজলাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন পূর্ণ স্বরাজলাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে, কোন্ দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিট-মাট প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে এবং এই কথাবার্ত্তা কেবল যে গবর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের ইউরোপীয় ও Anglo-Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে। আমার গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি।

আমি এ কথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গবর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটা সর্ত্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাব-ভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না,—অবশ্য এখনও দেই না—এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেন না, বাঙ্গলার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোন দিনই রাজদ্রোহমূলক কোন প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্তিত হইলে—তাহার ফলস্বরূপ:ই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্ত্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাস এইমাত্র দিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে,—রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না এবং যে শক্তি ও সামথ্য ভ্রান্তপথে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।

তার পরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ।

আমরা গত দুই বৎসরকাল যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছি—সেই পথে—সেই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে—গবর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন—স্বাভাবিক নিয়মে—শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বাজেটের প্রস্তাবে বাধা দিবার নাকি আমাদের নৈতিক অধিকার নাই। কেননা, তৎপূর্ব্বে আমাদের নাকি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট অহিংসামূলক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পর্য্যুদস্ত আমরা—আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্ব্বপ্রথমেই পাশুপাত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই—কোন বীরই তাহা করে না,—আমরাও সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে,—শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না—ভীত হইব না, কেন না, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাহারি যুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত—কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। এক দিকে বর্ত্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞান-সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ—অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মান অগণন ৩০ কোটি নর-কঙ্কাল। ক'টিমাত্র বস্ত্র আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ—ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া, আমাদিগকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।

হে আমার দেশবাসী ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, সত্যি আমাদের বর্ত্তমান ঘাত-সংঘাতের কোন প্রতিধ্বনি কোন জাতির অতীত ইতিহাসে দেখা যায় না।

বাজেট প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার যদি অনুরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই আপনাদের এত আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিব। আপনারা কি জানেন না যে, ষ্টুয়ার্টদিগের রাজত্বকালে যখন প্রজারা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পার্লামেণ্টে প্রজাশক্তির প্রতিনিধিগণ বাজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন? অহিংসামূলক অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার উপায়, গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে বাধ্য করা। আমরা বাজেট প্রস্তাবে বাধা দিয়া সফল হইলেই গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে ট্যাক্স আদায় করিতে উদ্যোগী হইবে এবং সেই সময় যদি নিতান্তই আসে, তবে আমরা আমাদের দেশবাসীকে ঐরূপ অবৈধ উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

তবু আমি আশা করি—সেই সময় হয় ত আসিবে না। কেন না, চারিদিকেই মনের একটা পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যদি আপোষের সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়—সকল ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবাসীকে অহিংসামূলক অবাধ্যতা (Civil Disobedience) গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই ব্রহ্মাস্ত্র সুযোগ বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আপনাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, Civil Disobedience শুধু মুখের কথা নয়। Civil Disobedience করিতে হইলে—

—দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় রকমের একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

—আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা ধারণ করিতে হইবে।

—ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইবে।

আমার আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য্য পূর্ণ রকমে সফল না হইলে Civil Disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি আমাদের আদর্শকে সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। কেন না, যে রকমেই হউক, স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

তবে আমি বলিতেছি যে—আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি।

সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি—বিচ্ছিন্ন মানব জাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহা-মিলনে ভারতবর্ষ খুব বেশী সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে—মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। ব্রিটিশ রাজ-নৈতিকগণ কি পথের কণ্টক হইবেন। আমি আশা করি না। তাঁহাদিগকে আমি বলি যে, তোমরা শান্তিলাভ করিতে পার—যদি আপোষ কর। আপোষের সর্ত্তগুলি তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক হইবে। ভারতের ইংরাজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিমজাতির বংশধর—আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না—? আমরা ত এ দেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্ব্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গলার উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে আমি বলি যে—তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে—এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ—বহু কষ্ট পাইয়াছ—তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আসে নাই,—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন-মন্দিরে—সমুন্নত-শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি—। তোমরা তখন সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়। মিলন-মন্দিরে যাত্রীরা যেন তোমাদের দেখিয়া বলিতে পারে—এরা সেই সমস্ত যোদ্ধা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়কে পরাজিত করিয়াছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, আবার যুদ্ধাবসানে জয়মাল্য গলে—ইহারা বিনয়ে ও সৌজন্যে শত্রুকে অধিকতর পরাজিত করিয়াছে।

জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এই জন্য

প্রয়োজন যে—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয় এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্ত্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহুত হইবে—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ, তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্ম্মের—আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগিভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।

—ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট অঙ্গের মত অবস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

—প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।

—জাতিতে জাতিতে মিলন—পৃথিবী-পৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।

বন্দে মাতরম্।

আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ সভায় অভিভাষণ

যে মহামিলনের সাগরসঙ্গমে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, আজিও আমাদের সে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই। বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ভারতীয় মহাজাতি জগতের কোন্ প্রয়োজন সাধনে গড়িয়া উঠিতেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া দেখিলে হয় ত আমরা তাহার কিঞ্চিত আভাষ পাইতে পারি। সভ্যতার ইতিহাসে শৈশবকাল হইতে ভারতে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সবগুলি ভারতকে একীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

যে সুন্দর মালাটি দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের দেবতাকে বরণ

করিতে হইবে তাহার প্রতি পুষ্পটি আজিও সংগৃহীত হয় নাই! এক একটি করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই কুসুমরাশি সংগৃহীত হইতেছে। ভারতের ইতিহাস যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেই কুসুম চয়ণ করিয়া চলিয়াছে, জানি না কবে আমাদের পূর্ণ মিলনের মালাগাছি গ্রহণ করিয়া বিধাতা আমাদের জীবন সার্থক করিবেন।

সে মিলনউষার পাখী ডাকিয়াছে। কত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া সেই মিলন-সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি যেন আজ কাণে আসিয়া মরমে পশিতেছে, আজ সকল বৈচিত্র্যকে সার্থক করিয়া একের অখণ্ড মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিতেছে।

কত রাজা, রাজধানী এই ভারতে উত্থিত হইল, পতিত হইল; কত দেশ বিদেশের কত জাতি এই ভারতে আসিল। আর্য্য, অনার্য্য, শক, সিমীয়, গ্রীক, হূণ, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান মায়ের কোলে স্থান লাভ করিয়া স্নেহধন্য হইল।

এক একটা জাতি আসে, এক একটা ভাবের বন্যা আসে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ ভাসাইয়া দিয়া সে পুণ্যস্রোত ভারতকে একতার অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। অনার্য্যের সহিত আর্য্যের সংযোগে এক মহত্তর জাতির সৃষ্টি হইল—তারপর একে একে কত জাতি আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। নিজের যাহা কিছু দিবার ছিল, তৎসমুদয় দান করিয়া জাতির মহত্তর জীবন নাশ করিয়া নিজের প্রয়োজন সার্থক করিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্ম—সকলই ভারতকে একটা বৃহত্তর জীবন লাভে সাহায্য করিয়াছে। কাহাকেও নষ্ট করিয়া এই জীবন ফুটে নাই—প্রত্যেকের বৈচিত্র্যকে বজায় রাখিয়া, যথাস্থানে তাহাকে স্থাপিত করিয়া সমগ্রের সমাবেশে এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে বাণী শুনাইয়া, যে মন্ত্রের উদাত্তস্বরে জগতকে মাতাইয়া ভারতের জাতীয় জীবন সার্থকতা লাভ করিবে, এতদিন ভারত কত বিপ্লব সহিয়া যাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে আজ বোধ হয় সেই শুভদিনের প্রভাতীগান আরম্ভ হইয়াছে।

"শ্মশানকুকুরদের কাড়াকাড়িগীতি" চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী কামানের শব্দের অন্তরালে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কলের নিষ্পেষণে মানুষের প্রাণ আজ মরমের যাতনায় আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে—প্রলয়ের বেদনায় ধরিত্রী আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মরণের এই কোলাহলের ভিতর কে আজ মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত করিয়া মানব স্বাধীনতার নবযুগের উদ্বোধন করিবে? সে সাধনা জগতে আর কোন্ জাতির আছে?

ভারতের এতদিনের প্রতীক্ষা আজ বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলন সেই উদ্বোধনের পূর্ব্বে নিজের পবিত্রীকরণ। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি আজ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে—নিজের মনের দেউলে নিজের দেবতার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইবে। তবেই ত আমরা নববলে বলিয়ান হইয়া মুক্তির মহামন্ত্র ঘোষণা করিয়া জগতের নূতন জীবন-সঞ্চার করিতে পারিব।

আজ আমাদিগকে দেহে মনে বাক্যে শুদ্ধ হইতে হইবে; ভেদাভেদ, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের সত্যিকার নিবিড় আলিঙ্গনে এক হইতে হইবে। তাই আজ মায়ের নামে প্রেমের জোয়ার দেশ ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এ জলতরঙ্গ রোধিতে পারে জগতের এমন শক্তি নাই।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে ছিল না। টোডরমল্ল, বীরবল, যশোবন্ত সিংহ, মানসিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। এখন হায়দরাবাদে যেখানে হিন্দু প্রজা বেশী, রাজা মুসলমান; অথবা কাশ্মীরে যেখানে মুসলমান প্রজা বেশী, হিন্দু রাজা; সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বৃটিশশাসনে। কিন্তু আজ ভারতমাতার দুটি সন্তান হিন্দু মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক—বিদেশীর স্বার্থ, উভয়কে বিভিন্ন রাখা।

তাই মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত আজ এমন করিয়া হিন্দুর বাজিয়াছে; মুসলমানের পক্ষে এইটি যেমন ধর্ম্মের কথা—হিন্দুর পক্ষেও তাই। প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্ম এই, কোনও ধর্ম্মকে নিপীড়ন না করা এবং নিপীড়িতকে পীড়নের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সাহায্য করা। জগতের যে কোনও ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের যোগস্থাপনে সহায়তা করে। কোনও ধর্ম্মকে নষ্ট করা অপর কোনও ধর্ম্মের সার্থকতা নহে। ভগবান কত ছন্দে কত লীলায় সংসারে দেখা দিতেছেন—কত ধর্ম্ম, কত ভাবের ভিতর দিয়া নিজের মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন—মানব তাহা কি বুঝিবে? সে কেবল তাঁহার মহতী লীলার বিষয়ীভূত হইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে।

একজনের যে ভাব, আর একজনের ঠিক তাহা নহে। বৈচিত্র্যে বিরোধ নাই। সমগ্রের সামঞ্জস্যেই সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। পরস্পরকে শ্রদ্ধার ভাবে না বুঝিলে নরমাঝে নারায়ণের এই অপূর্ব্ব লীলার কিছুই উপলব্ধি হইবে

না। তাই আমাদের পরস্পরকে বুঝার এত দরকার; এই বুঝার অভাবেই এত বিরোধের সৃষ্টি।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট এই বিরোধ নাই—তাঁহার বিরোধ অধর্ম্মের সহিত। মৌলানা মহম্মদ আলীকে একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হিন্দু মুসলমানে মিলন কি সত্য হইবে? দুই ধর্ম্ম এক তৃতীয় ধর্ম্মে মিলিত না হইলে এই মিলন কি টিকিবে?" এই কথার উত্তরে আলী সাহেব বলিয়াছিলেন—"আমাদের এই আন্দোলন অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে—এখানে একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে অধর্ম্মীর দল—যুদ্ধ এই দুই দলে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বলিয়া নহে। সেই জন্য খেলাফৎ, সেইজন্য—মুসলমান-ধর্ম্মস্থান রক্ষকের বিপদত্রাণের জন্য—হিন্দুও এ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। যাহারা বলে ইহা একটি রাজনৈতিক চাল—তাহারা মিথ্যাবাদী। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজনৈতিক চালের উপর স্থাপিত হয় না—সেটা প্রাণের জিনিস, প্রাণের অনুভূতি প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস না হইলে আবার হয় না। অনেকে বলেন খিলাফৎ সমস্যা মিটিয়া গেলেই মুসলমান এই আন্দোলন ত্যাগ করিবে। আমি এইরূপ আশঙ্কার কারণ দেখি না। মুসলমান একথা নিশ্চয়ই জানেন যে স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ সৈন্য লইয়া পবিত্র জাজিরত-উল-আরব ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। স্বরাজ নাই বলিয়াই ইংরাজ ভারতের ৮ কোটি মুসলমানের বুকে আঘাত করিয়া তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছে।

আজ যদি খিলাফৎ সমস্যা কতকটা মেটে—আমরা যদি কিছু পাই—সে পাওয়া সার্থক পাওয়া হইবে না। আজিকার অনুগ্রহের দান কালই আবার চলিয়া যাইতে পারে—ভিক্ষার দান আমরা চাই না। আমরা আমাদের প্রাপ্য যোগ্যতার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া লইতে চাই—সেই পাওয়াই আমাদের স্থায়ী পাওয়া হইবে।

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ,
কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?

ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। "যেচে মান" পাওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আর আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কই? আমার আহার জুটে না। বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা হয় না। আমার স্ত্রী-পুত্রের পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়—আমার দেশবাসীকে কীট-পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে

হয়, আমার ধর্ম্মের ইজ্জত থাকে কই ?

সে কারণ স্বরাজ আমাদের চাই-ই চাই। বীরের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে—মানুষের মত সে স্বরাজ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সেখানে মুসলমান মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে শেষ করিবে। হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিয়া শান্তির সহিত, প্রেমের সহিত, সুখের সহিত, সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবে। সেখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নয়—কথা মানুষের, কথা ধার্ম্মিকের। তাহাতে বিরোধ নাই, অসামঞ্জস্য নাই।

এই যে খিলাফৎ কমিশনকে ডাকা হইয়াছে, ইহার ভিতরকার মতলব বোধ হয় হিন্দু-মুসলমানে আবার একটা বিরোধ সৃষ্টি করা। মুসলমান খেলাফৎ সম্বন্ধে যাহা চায়, তাহার কতকটা দিয়া তাহাকে বুঝানো হইবে—এই ত তোমার নালিশ মিটিয়া গিয়াছে, তুমি আর গোলমাল করিও না, হিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া আর স্বরাজ চাহিও না।

এইরূপ কথার ভিতর কতকটা অসদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে। অনেকে হয় ত কথাটা তলাইয়া না বুঝিয়া ভুল করিতে পারেন। তাই আমি সময় থাকিতেই সাবধান করিয়া দিতেছি।

মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর বাঁচিতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগতকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব ? সে জন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে।

হিন্দু মুসলমান সকলকে এক হইয়া মহা বোধনের পূজারী হইতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের ধর্ম্ম রক্ষার্থে—আত্মার বল সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই আত্মবল সংগ্রহের আয়োজন মাত্র। সেই আয়োজনে সকলের ত্রুটি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে—নূতন জীবনের স্নিগ্ধ উষাতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া গহন পথে যাত্রা করিয়া মরণকে জিনিতে হইবে।

শ্রীহট্ট টাউনহল প্রাঙ্গণে

প্রথম কথা যা আমার মনে হচ্ছে, আজ আপনারা আমাকে এই শ্রীহট্ট নগরে কেন নিয়ে এসেছেন, কিসের জন্য এত কষ্ট করে আমার আসবার জন্য এত আয়োজন করেছেন? এমন করে আহ্বান করবার আগে প্রাণের মধ্যে কি বুঝেছেন কেন আপনারা আমাকে ডেকেছেন, কেন আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে এসেছেন? আমি কে? কেন আমাকে ডেকেছেন? এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন, স্বরাজের জন্য যে আন্দোলনে সমস্ত জাতি সাড়া দিয়েছে—শান্তিময় সংগ্রামক্ষেত্রে দেশের সকলে নেমেছে, সেই কার্য্যের সহায়তা করবার জন্য কি আপনারা আমাকে ডেকেছেন? না শুধু দেখবার জন্য? যেমন একটা অপূর্ব্ব জানোয়ার এলে লোকে তাকে দেখতে যায় তেমনি একবার দেখবার জন্য? আগে তাই বুঝুন, কেন ডেকেছেন। আপনারা কি স্বরাজ চান—বাস্তবিক কি স্বরাজ চান? আমি এর উত্তর এই সভার কাছে চাই। আপনারা কি স্বরাজ চান? ('চাই' 'চাই') স্বরাজ চাইলে আপনারা ঐ কলেজে কেন ছাত্র রেখেছেন? কেন ঐ কলেজের ছাত্রদের উপর শ্রীহট্টের কলঙ্ক নিশান এখনো উড়ছে? যে শুধু মুখে জয়ধ্বনি করে, যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভেজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? দুটো সভায় গেলাম, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়?' চীৎকার করে বললাম তাতেই কি হলো? তাতেই কি বুঝব স্বরাজলাভ হবে? যখন দেখব আদালত শূন্যপ্রায়—উকীলেরা আদালত ছাড়ছেন, যখন দেখব স্কুল কলেজ শূন্য হয়ে গেছে—যখন দেখব যুবকেরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে লোকের হিতসাধনে ব্রতী হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে কৃষকের এই পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা করছেন, তখনই বুঝব আপনারা স্বরাজ চান। এই জয় কিসের জয়? মহাত্মা গান্ধীর জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত কি একজনের জয় চায়? ভারত আজ চায় ভারতের জয়। মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে যখন গগন বিদীর্ণ করছি তখন মনে হয় সেই জয় এখনও আসে নাই—কিন্তু সেই জয়ের সম্ভাবনাতে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাই বলি 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়'। যখন আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন—যখন স্কুল, কলেজ, আদালত শূন্য হয়ে যাবে—যখন প্রাণের অশান্ত চেষ্টা স্বরাজলাভের জন্য একাগ্র হবে—তখনই

বুঝব আপনারা স্বরাজ চান, তখনই মহাত্মা গান্ধীর জয় পূর্ণ হবে। মনের মধ্যে তাহাই বুঝে দেখুন। অসার কল্পনায় মত্ত হয়ে উঠবেন না। স্বরাজ বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়বে না। সেই সাধনা এখনই আরম্ভ করতে হইবে। যদি না করে থাকেন, যদি সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয়ে থাকেন তবে বলি আপনাদের এ স্বরাজ চাওয়া মিথ্যা কথা—এ প্রাণের চাওয়া নয়। বিধাতার জগতে যে যা চায় সে তাই পায়। আমার জীবনে দেখেছি আমি যখনই প্রাণ দিয়ে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। প্রাণের সাধনা না হলে কোন মূল্যবান জিনিস লাভ হয় না। যখন দেখব আপনাদের এই চাওয়াটা অশান্ত পাখীর মত পাখা ঝাপটাতে থাকবে তখনই বুঝব আপনারা বাস্তবিক স্বরাজ চান। আপনারা কি স্বরাজ চান? আপনারা কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন? আপনারা না ডাকলেও আমি আসতাম,—কেন এসেছি? আমি এখন বলব কেন আমি বাঙ্গলা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমি বাঙ্গলার সহরে ঘুরছি আমার হৃদয়ের একটি উদ্দাম আবেগে—যে ডাক হৃদয়ের মধ্যে শুনছি সেই ডাক আমাকে ঘুরায়ে ঘুরায়ে নিচ্ছে যতদিন স্বরাজ না পাব—যতদিন এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা না হয়েছে তত দিন ক্রমাগত আপনাদের ডাকব—ডেকে ডেকে অস্থির করব, ততদিন আপনাদের বিশ্রাম করতে দেব না, বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস যেখানে থাকি ক্রমাগত বলব, স্বরাজ চাই, আসুন—আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য স্বরাজ চাই। অনেকে এই কথায় ভীত হয়ে উঠেন। অনেকে বলেন আমরা স্বরাজ চাই না। আমি এতে ভুলব না, আমি বিরত হব না যতক্ষণ না আমি পারছি স্বরাজের আবেগে প্রত্যেকের হৃদয় প্লুত করতে ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত থাকব না, আমি আজ এসেছি, আবার আসব, আপনাদের প্রাণের মধ্যে বেদনা জাগিয়ে তবে ছাড়ব।

গত ২০ বৎসর যাবৎ সামান্যভাবে দেশের কথা ভেবেছি। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের প্রতি অবিচারের পর জীবন পণ করে স্বরাজের জন্য লেগেছি। আমার প্রাণে কে যেন অলক্ষ্যে লিখে দিয়েছে স্বরাজ ছাড়া জীবন রাখা বৃথা। শ্রীহট্টে কে স্বরাজ চায়? আমি চাওয়াতে এসেছি। আমি ডাকছি আসুন, দেশমাতৃকার বুকে আসুন, এই ভারত-শ্মশানে কি কেউ স্বরাজের সাধনা করবে না? কে চাও স্বরাজ? ('আমি' 'আমি')—তবে এস, মায়ের নামে ঐ গোলামখানা সকলে ত্যাগ কর। বল মা! যতদিন তোমার পায়ে শৃঙ্খল থাকবে ততদিন স্কুল কলেজ চাই না।

আমার মায়ের পায়ে বেড়ী, আমার এই শিক্ষা-দীক্ষায় লাভ কি? শ্রীহট্টে কে চায় স্বরাজ? আমার ডাক শুনবেন না? আমি ত রেহাই দেব না, আমি ডেকে ডেকে হয়রাণ করব। আবার ডাকি, মায়ের বেদনা কার প্রাণে লাগে? ('আমার' 'আমার') কে মানুষ আছ, এস। ঐ মায়ের পতাকা উড্ডীয়মান, এই পতাকার নীচে দাঁড়াও। বাঙ্গলা দেশে কি মানুষ নাই। কৈ, যে অন্ধকার দেখি? কে আছ এস, দাঁড়াও। মায়ের শৃঙ্খল ছোটাবার জন্য, এস। বাঙ্গলা দেশের কৃষক, তারা স্বরাজের মর্ম্ম বুঝে, তারা স্বরাজ চায়। বাঙ্গলা দেশের অনেক জায়গায় গিয়ে তা বুঝেছি। আর আমরা সভ্যতার নেতা, শিক্ষিত—আমরা কি স্বরাজ চাই? দেশের কৃষক আমার কাছে চিরদিন নমস্য। কত কষ্ট করে তারা ক্ষেত্র কর্ষণ করে আর আমরা তাদের কত অত্যাচার, অসম্মান করি। চাষা যে সেও ত মানুষ।

আর আমরা শিক্ষিত, আমরা কি মানুষ? কবে বুক ফুলিয়ে বলব, আমরাও মানুষ; যে শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের অমানুষ করেছে তা ধ্বংস করা চাই তবেই আমরা আবার মানুষ হতে পারব। Principal অপূর্ব্ববাবু বলেছেন Destruction-এর পূর্ব্বে Construction-এর দরকার। আমি নাকি destroy করতে এসেছি। আমি কি ধ্বংস করতে এসেছি? যেটা আমাদের অমানুষ করেছে—যে আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বুঝতে দেয় না; সেটা ধ্বংস করতে এসেছি। শিক্ষালয় কোথায়? কোন্ শিক্ষক প্রাণে বুঝে বলতে পারেন তাঁরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রকৃত শিক্ষা? এ শিক্ষালয় দাস্যালয়—এ গোলামখানা। আমি যদি এই শৃঙ্খল মুক্ত করতে এসে থাকি তাই কি আমার অপরাধ? সেই জন্যই কি শ্রীহট্টের ছাত্রেরা আমার কথা শুনবে না? "মানুষ! মানুষ! ওরে খুঁজে দেখ না ক'টা মানুষ।"—মানুষ হওয়া বড়ই ভার, আমি তোমাদের কলেজের যে Principal অপূর্ব্ববাবু তাঁর কথাই বলছিলাম, তিনি বলেন যে আমি এখানে শিক্ষা ধ্বংস করবার জন্য এসেছি, শিক্ষা প্রণালীর Continuity চাই। আমি প্রথমেই বলেছি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছে। আমরা মনে করি মানুষের মন যেন পায়রার খোপের মত—একটা ধর্ম্ম, একটা শিক্ষা, একটা রাজনীতি, এইরূপ নানা খোপে বিভক্ত। সেটা ভুল। যেদিন দেখব বাঙ্গালী বুঝতে পেরেছে এ সমুদয় বিভাগ বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়—তখনি বুঝব বাঙ্গালীর চৈতন্য হয়েছে। তখন কে দেখবে এই সব একমিলে নানাদিকে নিজ শক্তি প্রকাশ করবে। নানা বিষয়, নানা খোপ—এটা বিলাতী ভুল।

আমার কাছে এই যে রাজনীতি, এই যে স্বরাজের বারতা নিয়ে দেশে দেশে ঘুরছি—তা ধর্মের বারতা, ভগবানের বাণী। যে কার্য্য ভগবানের লীলার সহচর না হয় তা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। অপূর্ব্ব বাবু আমার বন্ধু। বিলাতে অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম। তাঁকে বলেছি দেশময় প্রাণের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের দুর্গ দিয়ে তা বাঁধবার চেষ্টা বিধাতার বিধানে ভেসে যাবে, কিছুই টিকবে না। Destruction-এর পূর্ব্বে Constuction এটা যুক্তি, না ওজর? Construction করবে কারা? শ্রীহট্টবাসী না বিলাত হতে সাহেব এসে? এই গোলামখানার খরচ দেয় কারা? ভারতবাসী। এই গোলামখানা রাখতে—গোলাম তৈরী করতে গবর্ণমেণ্ট ২০ ভাগের ১ ভাগ দেয়, বাকি সব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা মাহিনা দিয়ে যোগায়। তোমরা যদি খরচ দিতে পার তবে কি তোমরা কলেজ তৈরী করতে পার না? 'তবে আগে Construction তার পর Destruction' এই কথার মানে কি? এর মানে এই আমরা বেশ সুখে আছি, যতদিন না আমাদের স্কুল কলেজ হয়েছে আমরা ততদিন বেশ আরামে থাকি, যখন আকাশ হতে ঐসব স্কুল কলেজ খসে পড়বে তখন অপূর্ব্ববাবু বলবেন গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ভেঙ্গে যাক। এ যে ভাবের ঘরে চুরি।

Construction, destruction আমি বুঝি না। আমি চাই গোলামখানা হতে ছেলেদের মুক্ত করতে। এই গোলামখানা ভেঙ্গে পড়ুক, ধ্বংস হয়ে যাক। ছেলেদের গোলামখানায় রেখে, গোলাম হতে দিও না, ইহা পাপ। যে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় সে অপরাধী। আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি যে আজ শ্মশান। তুমি কি দেখনা এই জাতি আর জাতি না। মায়ের পায়ের শৃঙ্খল কি চিরদিনই থাকবে? যদি তাই হয় বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হওয়া সেটাও ভাল। যে জাতি স্বাধীনতা জানে না, যে নিজের ভাবনা ভাবতে পারে না তার ধ্বংস হউক। মিথ্যা তর্কশাস্ত্রের যত আবর্জ্জনা দূর করে যখন তোমরা বলতে পারবে আমরা স্বাধীন তখন একমুহূর্ত্তে স্বাধীন হবে। একবার মনের মধ্যে বল, আমরা স্বাধীন! যদি তোমার মনের মধ্যে নিজের কিছু না থাকে, যদি বিদেশীর নিকট তোমার প্রাণ ও মন বিলিয়ে দেও, তবে আল্লার পায়ে কি দিবে? তোমার মন-প্রাণ যে তোমার নয়। জষ্টিস উড্রফ বলছেন "This is the cultural conquest of the West." আজ ইংরেজ শুধু বাহিরে নয়, আমাদের মনকে জয় করেছে। তাই আমরা দাস অপেক্ষা আরো হীন দাস। আর এই গোলামখানায় হীন দাস

তৈরী হচ্ছে। যে মনে প্রাণে স্বাধীন নয়, যে নিজের মনকে নিজের অধিকারে না আনতে পারে তার বিধাতাকে দিবার কিছু থাকে না। সে তা বল্লে মিথ্যা কথা। স্বরাজের কথা ভাল করে ভাব, মনের মধ্যে তোলপাড় কর, মিথ্যা যুক্তির প্রশ্রয় দিও না। বিধাতার বাণী শুনতে চেষ্টা কর। বিধাতার বাণী যে শুনতে চায়, সে শুনতে পায়, যদি কলেজে গিয়ে কানে তুলো দিয়ে থাকতে চাও তবে থাক। 'গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী' গোলাম ত গোলামই থাকবে। আর যদি তা না চাও, তবে ঐ শুন স্বরাজের বাণী। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দাও। যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, মায়ের জন্য সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও। যার ইচ্ছা কেরাণী হবে সে সেই ইচ্ছাকে বলি দাও, সেই অর্থের লোভ, মিথ্যা সম্মানের লোভ ভগবানের পায়ে, স্বরাজের নামে বলি দাও। আর বল স্বরাজ চাই—আমরা স্বাধীন। প্রত্যেক মনুষ্যজাতি স্বাধীন। মনে প্রাণে, সকালে সন্ধ্যায় বল আমরা স্বাধীন। আমরা কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে চাই না, কিন্তু অন্য কোন জাতি যেন আমাদের প্রকৃতিগত উন্নতির পথ রোধ না করে। তাই বল, আমরা স্বাধীন। যারা বল্লেন আমরা স্বাধীন তারা স্বার্থ বলিদান দিন, মায়ের নামে জয়ধ্বনি হউক, বল 'মায়ের জয়'! যারা আমাদের দেশের নেতা, কোর্টে যাঁরা যান, তাঁরা কি স্বার্থ বলিদান দিবেন না? তাদের কাণে কি মায়ের ডাক পৌঁছে না? এই কয়টা মাসের কষ্ট কি এত বেশী, থাবার পরবার কষ্ট কি এত বেশী, যা যাবে তার শতগুণ পাবে। এই অত্যাচার নিপীড়িত ভারতবর্ষে এই জীবন-নিস্পেষণকারী আমলাতন্ত্রের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর। সৈন্য নিয়ে এসে প্রহার কর তোমরা গায়ের জোরে। আমি হাত সরিয়ে নিয়ে আসব, তোমাদের কিছু করে তোমাদের সাহায্য করব না; তোমাদের কোন কাজ করব না—এতো আমার অধিকার। আমি ওকালতি করব না এ কি এতই কঠিন? এতদিন তোমরা সবের নেতা হয়ে, সকলকে হাতে ধরে টেনে তুলেছিলে। কি বলবে দেশ; আজ কি বলবে পৃথিবী এই civilized world যারা এতদিন agitation করছিল এখন যখন স্বার্থের বলিদান আবশ্যক হল আর তাদের পাওয়া গেল না। ভাবতেও লজ্জা হয়, চোখে জল আসে, এই শ্রীহট্টে কি এমন উকীল নাই যারা ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে ইচ্ছুক? প্রত্যেক শিরায় শিরায় বিধাতার বাণীর স্বার্থকতা আমাকে জানিয়ে যায়—তোমরা যদি না পার, সরে যাও। আমার দেশের ঐ চাষা মুটে মজুর তাদের বুকে ধরে আমি স্বরাজের পথে চলব। বক্তৃতা চাই না, কার্য্য চাই। এইটুকু ভাই কি দিতে পারবে না? দেশ

ডাকছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ তোমার মা ডাকছেন। ভারতবর্ষ চিরকাল ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত। আর তোমরা এতটুকু ত্যাগ করতে পারবে না? এইটুকু স্বার্থ কি এত বেশী হলো? বিধাতার বাণী কি বিফল হবে, স্বরাজের চেয়ে কি তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বড়? প্রাণ খুলে দেখাতে পারলে দেখাতাম আজ কি আঘাত তোমরা দিলে।

এস ভাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, এস চাষার সঙ্গে, যাদের ঘৃণা করতাম তাদের সঙ্গে। বাঙ্গলা ত্যাগমন্ত্রে এক হউক। জগতকে দেখাই ভারতে ত্যাগেরই জয়, ভোগের জয় কখনো নয়। দলে দলে ছেলে বেরোও, দেশে দেশে যাও। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সমিতি খুলুক। চরকার কাজে লাগ। চরকার পুনরুত্থানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হবে। এই যে নর-বিগ্রহ সব আমার সামনে দেখিতে পাই, তোমরা বিধাতার সম্মান অটুট রাখ, প্রত্যেক কাজে। এসেছি আমি ভিক্ষা করতে—ভিক্ষা দাও। শুধু অর্থের ভিক্ষা নয়—প্রাণের ভিক্ষা। প্রাণ নিতে এসেছি, প্রাণ চাই। প্রাণের স্রোতে দেশ ভেসে যাক। কি দিবে ভাই আমায়, তোমার ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও। এসো, স্বরাজের জয়ধ্বনি হোক, স্বরাজের জয় পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হউক।

লর্ড লিটনের বক্তৃতার প্রতিবাদ

দেশবন্ধুর অখণ্ড যুক্তি।

"উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আমি এই অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়াছি এবং আবার এখানে প্রতিবাদ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। আমাদের আইন অমান্য করিবার ইচ্ছা নাই। আমাদের প্রতিবাদ করিবার হেতু, গবর্ণমেণ্টের বে-আইনী কার্য্য আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, দেশবাসীগণের জবরদস্তী নহে, গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তীই বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। জোরজবরদস্তী কিরূপ, তাহা আমি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি প্রাতে উঠিয়াই দেখিবেন যে, আপনার বাড়ী পুলিস-প্রহরী পরিবেষ্টিত, যেমন আপনি বাড়ীর বাহির হইবেন, অমনি আপনি গ্রেপ্তার হইবেন। আপনি যদি গ্রেপ্তারের

কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে উত্তর পাইবেন, ৩ রেগুলেশন। আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন—আমি কি করিয়াছি? ইহার আর উত্তর কিছু পাইবেন না। তৎপরে আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নীত হইবেন। আপনি হয় ত পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু আপনি কিছুতেই কোন উত্তর পাইবেন না। আপনি তখন অবনত হইতে বাধ্য, কারণ সেখানে পুলিস ও সশস্ত্র ফৌজ বিদ্যমান—ইহা কি পাশবিক শক্তি নহে?

লাটের বক্তৃতা বিশ্লেষণ

"আমি বড়লাট এবং বঙ্গের লাটের বক্তৃতায় বিস্মৃত হই নাই। বড়লাট অর্ডিনান্সের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, লর্ড লিটনও নিজ ভাষায় প্রতি ক্ষেত্রে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। লর্ড লিটন কলিকাতায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কলিকাতার বাহিরে গিয়া মালদহ ও দিনাজপুরে সেই এক বক্তৃতাই করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় বলিয়াছিলেন,—দেশের বিপ্লববাদীদের একটি দল হইয়াছে এবং যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহারা স্বরাজ্য দলভুক্ত বলিয়া নহে,—পিস্তল খরিদ, এবং বোমা নির্ম্মাণে জড়িত থাকার জন্যই গ্রেপ্তার হইয়াছে। মালদহে গিয়াও তিনি এই এক বক্তৃতাই করিয়াছিলেন। তিনি তথায় বলিয়াছিলেন আমাদের কার্য্য সঙ্গতই হইয়াছে, কারণ যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারা বিপ্লবে লিপ্ত ছিল। দিনাজপুরে গিয়াও লর্ড লিটন গ্রেপ্তারের এই একই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তফাতের মধ্যে অধিকতর জোরের সহিত বলিয়াছিলেন। তাহার পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একই কথা কেবলমাত্র অধিকতর ওজস্বিনী ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেন। সুতরাং লর্ড লিটন ঐ সকল লোক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই কথাই জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন! পুনঃ পুনঃ বলার জন্যই কি তিনি মনে করেন যে, জনসাধারণ তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে?"

কোন লোক আসিয়া আপনাকে বলিল, 'আমি ভূত দেখিয়াছি।' আপনি তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সে আবার বলিল, 'আমি ভূত দেখিয়াছি' আপনি এবারেও তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন লোকটি জোর গলায় পুনরায় বলিল, 'আমি ভূত দেখিয়াছি।' লোকটি তখন ভাবিল, যখন

বারবার বলিয়াছি, বিশেষ শেষে এত জোরে বলিয়াছি, তখন এইবার তাহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছে।

সুতরাং লাট সাহেবের বক্তৃতার উপর আমার উত্তর 'না, না, না, তাহারা কখনই বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নহে।'

কেহ বিশ্বাস করিবে না

"লাট সাহেবকে আমি স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত না আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার একজন মাত্র লোকও বিশ্বাস করিবে না যে, ঐ সকল লোক বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ভারতের সমুদয় গবর্ণর একযোগে যদি চীৎকার করেন—তাহা হইলেও জনসাধারণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিবে না।

স্বাধীনতার ক্ষুধা

লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে, দেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বিদ্যমান, আমি এ কথা স্বীকার করিয়াছি। হাঁ, আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি এবং এখনও স্বীকার করিতেছি কিন্তু আমলাতন্ত্রের বে-আইনী আইন ইহার দমন করিতে পারিবে না। আমি বলিতেছি, ইহা স্বাধীনতার ক্ষুধা ; ইহাই এই আন্দোলনের মূলে অন্তর্নিহিত। স্বাধীনতা ব্যতীত ইহার দমন কেহই করিতে পারিবে না। অর্ডিনান্সে এবং বে-আইনী আইনে ইহা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হউক, একজনের পর আর একজন করিয়া ৩ রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার হউক—তখন ভগবানের কৃপায় একদিন আমলাতন্ত্র দেখিতে পাইবে যে, আমার কথাই ঠিক, আর সমগ্র বৃটিশ আমলাতন্ত্র ভ্রান্ত।

'আমলাতন্ত্র, তুমি বলিবে, দমন আইনের ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের অবসান হইয়াছিল। তুমি কি ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর ? তবে অনেক পুরাতন রাজবন্দী ৩ রেগুলেশন অনুসারে আবার কেন গ্রেপ্তার হইলেন ? তবে কি গ্রেপ্তার ভুলক্রমে হইয়াছে, না তোমার

কথাটাই ভুল? আমার কথা এই, বিপ্লবমূলক আন্দোলন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে এবং কখনও ইহার অবসান হয় নাই, এখনও বর্ত্তমান আছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এ আন্দোলন জীবিত থাকিবে।

বঙ্গের মন্ত্রিত্ব

"লর্ড লিটন বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। আমার বক্তব্য, তিনি আমাকে কোন দায়িত্ব দিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন, মন্ত্রিত্ব দিতে। লাট সাহেবের প্রতি আমার উত্তর, দায়িত্ব প্রদান না করিলে কোন আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা কিসের জন্য সংগ্রাম করিতেছি? দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভের জন্যই আমাদের এই সংগ্রাম। আমাকে যদি দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে কি আমি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতাম? আমি কর্ত্তার কথা অনুসারে চলিতে সম্মত নহি। কারণ আমার ব্যক্তিগত এবং ভারতীয় জাতীয়তার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান। লর্ড লিটন গবর্ণরের কার্য্যে অনভিজ্ঞ। যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বলিব, তাঁহার এখনও শিখিবার জিনিস বাকী অনেক। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় জাতীয়তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে— ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করা নিরাপদ নয়। আমি লর্ড লিটনকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, দমনমূলক আইনের ফলে এই শিশু জাতীয়তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিবে। লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় লর্ড লিটনও বঙ্গে জাতীয়তাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

(কলিকাতা খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।)

দেশবন্ধুর বক্তৃতা

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ! প্রস্তাবের অনেক বিষয়ের সহিত আমার মতের মিল নাই; কিন্তু অন্যান্য দল হইতে যে প্রকার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, সেই জন্য আমি ইহা সমর্থন করিতেছি।

স্বরাজ্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলায় যে অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যদলের সহিত এই দুঃখ বরণ করিতে সকল সম্প্রদায়ই এখন সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রস্তাবের মধ্যে পৃথকভাবে স্বরাজ্যদলের যে নামোল্লেখ করা হয় নাই, সেইজন্য আমি সমবেত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত লিবারল দলকে অর্ডিনান্স স্পর্শ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্যাপারটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা সত্য, তাহাকে যদি স্বীকারোক্তি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, আমার দৃঢ় ধারণা, বাঙ্গলার বিপ্লব-বাদীদলের অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব আছে। ইহা স্বীকার করিলেই অর্ডিনান্সের আবশ্যকতা আছে, ইহা আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। বরং এই অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে সরকারের এই সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত ছিল। কারণ ইহাতে বিদ্রোহী দল শক্তিসম্পন্ন হইবে মাত্র। অতঃপর তিনি ডাক্তার বেসান্ত বড়লাটের স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন মোটর ডাকাতি মামলায় প্রমাণ ব্যতীতই আসামীর দণ্ড হইয়াছিল। জুরী ও সাক্ষীদিগের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছিল বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। পোষ্টমাষ্টার খুন ও গোপীনাথ সাহার মামলায় যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, ও যাঁহারা জুরীর কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভারতীয় ছিলেন, এই সকল স্থানেও কি প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছিল? মির্জ্জাপুর বোমার মামলা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীযুক্ত দাস বলেন, এই মামলার আসামী শান্তিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রায় দুই মাস হাজতে রাখা হইল। তারপর বিচারে সে অব্যাহতি লাভ করে। ইহার পরেই উহাকে খুন করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড দ্বারা বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণিত হয়? এই সম্পর্কে সন্দেহই বা হয় কি রকম? লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ একদল লোক হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু

হিংসায় কোন কাজ হয় না। তবে মানুষের প্রকৃতি মানুষেরই প্রকৃতি বটে। বঙ্গভঙ্গের যুগে মুসলমানরা যখন উৎসাহিত হইয়া মন্দির ধ্বংস করিত ও তাহাদিগের বাড়ীঘর কলুষিত করিত, সেই সময় জনসাধারণ অহিংস থাকিবে ইহা কি আশা করিতে পারা যায়? পুলিসের অনাচারের জন্যই সেই সময় কেহ কেহ অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদলের অস্তিত্ব এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি

যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই স্বাধীনতার জন্য জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত, এমন অনেক যুবক থাকিবে। তাহারা স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা বর্জ্জন করিবে, ইহা আপনারা আশা করিতে পারেন না। সরকারের বিদ্রোহদ্যোতক চালবাজীর নিন্দা না করিয়া বিদ্রোহী দলের নিন্দা করা হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রস্তাবের মধ্যে অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও আমি সম্মিলনকে ইহা সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন

আমি আপনাদের নিকট আমার দলের কার্য্যপদ্ধতির কথা বলিব। আমাদের দলের উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বরাজ লাভ করাই স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য। কি প্রকারের স্বরাজ হইবে তাহা লইয়া গণ্ডগোল করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের নিজেদের শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করিতে চাই।

সাম্রাজ্যের বাহিরে না ভিতরে ?

অনেক সময় আমার নিকট এই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, আমরা যে স্বরাজ লইব তাহা সাম্রাজ্যের ভিতরে না বাহিরে হইবে। ঐ কথা জানিবার জন্য অনেক লোক অনেক সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি স্পষ্টভাবে সকল কথা জানাইতে চাই। আমি মুক্তি চাই। আমি স্বাধীনতা চাই। সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া যদি তাহা পাওয়া যায় তাহা হইলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিতে আমার কোন আপত্তি নাই। সাম্রাজ্য অপেক্ষা স্বাধীনতাকে আমি অধিক ভালবাসি ; কাজেই সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করা না যায়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইব। কাজেই, ভবিষ্যতের সে কথা লইয়া এখন চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

অসহযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি ইতিপূর্ব্বে বহুস্থানে বহুবার বলিয়াছি। অসহযোগ অর্থে লোকে কি বুঝে, তাহা আমি জানি না। সর্ব্বত্র অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে স্বরাজলাভ করিতে হইবে।

ব্যুরোক্রেসীর শাসন এখানে অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য আমরা সর্ব্বত্র বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন করিয়াছি—তাহাতে অহিংস অসহযোগ নীতি কখনও ক্ষুণ্ণ করি নাই।

আমরা ব্যুরোক্রেসীর শাসন-যন্ত্র শেষ করিয়া দিতে চাই, সেই জন্যই বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা অন্যায় হয় নাই। আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যুরোক্রেসীর প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিতে হইবে।

স্বরাজ লাভের উপায়

আমি আমার কার্য্যপদ্ধতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই। যে কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের স্বার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হইব না। সরকারকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া

দিতেছি যে, আমাদের অধিকার প্রদত্ত না হইলে আমরা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে দিব না। সেই জন্য আমরা সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমাদের বাধা প্রদান নীতি চালাইয়াছি। মধ্যপ্রদেশে আমরা আমাদের নীতি চালাইয়া সরকারী শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছি। বাঙ্গলাতেও আমরা ঐ নীতি চালাইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস এখানেও শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে।

শাসন-সংস্কারের কথা

আমরা যে আন্দোলন চালাইতেছি তাহা বৈধ কি না—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে।

দেশের লোক শাসন-সংস্কার লইতে সম্মত হয় নাই। তাহা ধরিলে এ নীতি বৈধ হয় না—কিন্তু সংস্কার আইন মানিয়া লইলে—এ আন্দোলন সম্পূর্ণ বৈধ।

আমরা মন্ত্রি বেতন প্রস্তাব নামঞ্জুর করিব। তখন সরকার যেরূপ পথ অবলম্বন করিবে, আমাদেরও সেইরূপ পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

সময় ও অবস্থা বুঝিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমরা এদেশ হইতে দ্বৈত-শাসন তাড়াইব। যতক্ষণ না সরকার আমাদের দাবী গ্রাহ্য করে, ততক্ষণ আমরা ঐ নীতি চালাইতে থাকিব।

আপনারা সকলেই পড়িতেছেন যে, শাসন-সংস্কার কমিটিতে মন্ত্রিরা মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন। কাজেই, সরকারের হস্তান্তরিত বিভাগগুলি যদি সংরক্ষিত বিভাগের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মন্ত্রির পদ উঠাইয়া দিয়া সরকারকে যদি শাসন পরিষদের দ্বারা সকল কাজ চালাইতে হয়, তাহাতে কাহারও দুঃখ করিবার কারণ নাই, বরং সকলের সুখী হওয়া উচিত।

মিশরে জনগণের দাবী রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আজ যদি ইংরাজ দ্বৈত-শাসন উঠাইয়া একই লোকের দ্বারা দুই ভাগের শাসন কার্য্য চালান, তাহা হইলে সরকারের ভিতরের রূপ প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং আমরা বুঝিব যে, স্বরাজ লাভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

কার্য্যপদ্ধতি

দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে দল গঠন করিবার সময় আমরা যে কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়াছিলাম, তদনুসারে স্বরাজ্যদল কাজ করিয়াছেন। আমাদের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে না—কারণ সরকার মধ্যে মধ্যে নিয়ম বদলাইতেছেন—আমাদেরও তদনুসারে কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা কখনও সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হইব না। যাহা দ্বারা স্বাধীনতার সংগ্রাম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে বাধা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বৈত শাসন মারা গিয়াছে—যদি তাহা আবার বাঁচিয়া উঠে, তাহা হইলেও আমাদের আবার প্রমাণ করিতে হইবে যে, দ্বৈত শাসন মরিয়া গিয়াছে। সরকার সে কথা জানে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহা বলিতে সাহস করে না। আমরা জানি যে ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা উৎকোচ গ্রহণ ও অসৎনীতি অনুসারে কাজ করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই ভাবেই সত্যকথা চাপা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্যই এরূপ কথা বলা হয়।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলি ঐ প্রকারের গুজব রটাইয়া ঐ প্রকারের জাল ও মিথ্যা সংবাদ বিলাতে পাঠাইয়াছিল। তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল কাজই করিতে পারে।

আমি ঐ মিথ্যা গুজবকে ভয় করি না। আমি ঐ সকল গালাগালি খাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি জানিতাম যে, সরকারের কাজে বাধা দিতে গেলেই অন্যদিকে নানাপ্রকার কথা সহ্য করিতে হইবে।

আপনারা সকলেই সাধ্যমত স্বরাজ্যদলকে সাহায্য প্রদান করুন। আমি জানাইতেছি যে, স্বরাজ্যদলের কেহ কাউন্সিলে সার্থসিদ্ধির কোন চেষ্টা করিবে না। যদি দেশের লোক স্বরাজ্যদলকে সাহায্য প্রদান করে, তাহা হইলে আমরা ব্যুরোক্রেসীর হাত হইতে সকল অধিকার কাড়িয়া লইতে পারিব। আমি গত ২০ বৎসর ধরিয়া যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়াছি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানের কৃপায় তাহা যেন লাভ করিতে পারি—ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন।

তারকেশ্বর মন্দির সত্যাগ্রহ

তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুধু বাঙ্গালী জাতিরই সংগ্রাম নহে, সমগ্র ভারতবাসীরই ইহাতে যোগদানের অধিকার আছে। অনেকে সত্যাগ্রহ এই নামটার একটা আপত্তি তুলিয়াছেন, আমি ইহাকে সত্যাগ্রহ না বলিয়া সত্যাশ্রয়, ধর্ম্মাশ্রয় বলিতেও প্রস্তুত আছি। বাঙ্গলার হিন্দু, আজ তোমার দেবতার মন্দিরে তোমাদের প্রবেশাধিকার নিষেধ, তোমাদের তীর্থক্ষেত্র বিপন্ন, কলুষিত, এখনও কি তোমরা নির্জ্জীব নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিবে? ধর্ম্ম-সংগ্রামে যোগদানের জন্য আজও কি তোমাদের অসাড়তা নির্জ্জীবতা ভঙ্গ হয় নাই? দেবতার আহ্বান আজও কি তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই? আজ তারকেশ্বরে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে শুধু মানুষ চাই—প্রাণ দিতে পারে, অকাতরে অম্লানবদনে সহস্র অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারে এমন মানুষ চাই। এ সংগ্রামে বাঙ্গালীকে তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে, জীবন দিয়াও এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। আমরা হিংসার নীতি অবলম্বন করিতে চাই না, আমরা নিরুপদ্রব নীতিকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া থাকিয়া এই সংগ্রাম পরিচালনা করিতে চাই। আমি আশা করি বাঙ্গালী আজ জাগিয়াছে--ধর্ম্মের উপর অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার বাঙ্গালী আর সহ্য করিবে না। এখনও যদি না জাগিয়া থাক—তবে এমন একদিন আসিবে যেদিন বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। যদি আপনারা আমায় আদেশ করেন তাহা হইলে আমি নিজে জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি, জীবন দিয়াও এ আন্দোলন চালাইতে হইবে। ভয় কি? ধর্ম্মের জন্য আত্মদানে এত কুণ্ঠা, দ্বিধা, আশঙ্কা কিসের! মানুষ চাই, এমন গোটা মানুষ চাই যে অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারে এ প্রাণ বিধাতার দেওয়া, বিধাতার কার্য্যেই উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। বাঙ্গলা দেশে কি মানুষ নাই? আজও কি ধর্ম্মের এ আহ্বান কেহ শুনিতে পাও নাই? যদি তা না পাইয়া থাক, তবে শোন, জাগো, ওঠ, যার প্রাণে শক্তি আছে। শক্তি চাই —শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও—তবেই সব চেষ্টা সিদ্ধ হইবে।

(তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত ১লা আষাঢ় সন ১৩৩১, মির্জ্জাপুর পার্কে এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল। সেই সভায় তিনি এই বক্তৃতাটি তাঁহার স্বভাবিক ওজস্বিণী ভাষায় প্রদান করেন।)

লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে

বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড লিটন চুঁচুড়ায় বক্তৃতাকালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। জানিনা, পাশ্চাত্য রাজনীতিক চালবাজীতে সত্যের কতখানি অপলাপ করিবার সীমা নির্দ্দেশ করা আছে, আমি কিন্তু এ কথা স্বীকার করিবই যে, লাট বাহাদুরের বক্তৃতা আমাকে অতি মাত্রায় বিস্ময়চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। দেবস্থানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হিন্দুদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর যে সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত সেই সত্যাগ্রহ এক "বিরাট উপহাস" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং এই বিরাট বিদ্রূপাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠাতা দেশের কতকগুলি অব্যবস্থিতচিত্ত রাজনীতিক। এ দেশের ইংরাজের সংবাদপত্র আমাকে ইহার পূর্ব্বে বহুবারই অকথ্য গালি বর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং এ আমার পক্ষে কিছু নূতন নহে। কিন্তু এ প্রদেশের গভর্ণরের পক্ষ হইতে আমার গালি বর্ষণ এই নূতন। আমি জানি না গভর্ণর বাহাদুর খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী কিংবা অন্য ধর্ম্মে আস্থাবান—কিন্তু আমি হিন্দু, আমার ধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে এবং আমি আমার সেই ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমার জীবন-পাত করিতে প্রস্তুত। যে কংগ্রেস কমিটির উপর এই আন্দোলন চালাইবার ভারার্পণ করা হইয়াছে, তাহার সদস্যবর্গ ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু। আমাদের শক্তি সামর্থ্য যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে আমরা কখনই এই অপবাদ সহ্য করিব না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে গভর্ণর সাহেবও রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই মিথ্যা অপবাদ ঘোষণার জন্য জনসাধারণ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছে।

এ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে কেবল নিরপেক্ষ দর্শক—এ কথাও সত্য নহে। কারণ গভর্ণমেণ্ট মোহান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অন্যায় এবং বে-আইনী। ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করিলেন কিন্তু মোহান্তের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাঁহাদের প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে আক্রমণ করিয়াও অব্যাহতি লাভ করিল। তাহাদের নামে অভিযোগ পর্য্যন্ত আনা হইল না। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ যে সম্পূর্ণ অবৈধ তাহা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলার বিচারকালে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই

সকল ঘটনার পরও কি গবর্ণমেণ্ট বলিতে চান তাঁহারা এ ব্যাপারে "মর্ম্মাহত দর্শক মাত্র।" এ সকল ঘটনা কি লাট বাহাদুরের শ্রুতিগোচর হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহারা দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের উপর এই অপবাদ এবং তিরস্কারের বোঝা চাপাইবার আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির পূর্ব্বে ঘটনার বিগত শত বর্ষ ধরিয়া সাধারণের সম্পত্তি ভাবিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে; সে সংবাদ কি লাটবাহাদুর রাখেন? এখন এই মন্দিরে সাধারণকে পূজার্চ্চনা করিতে প্রতিবন্ধকতা করায় কি ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না? এক্ষণে মোহান্ত, রিসিভার বা অন্য কর্ম্মচারী যদি এই দেবস্থানকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করে, তবে তাহাই কি যথেষ্ট হইবে? আমার বিশ্বাস লাট বাহাদুর শত চেষ্টা করিলেও এই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বা প্রাসাদ যে মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এ কথা একজন হিন্দুকেও বিশ্বাস করাইতে পারিবেন না। হিন্দুমতে যাহার আস্থা আছে এমন কোন ব্যক্তিই তারকেশ্বর দেব বিগ্রহের সম্পত্তির এমন অপব্যবহার কথনই সহ্য করিতে পারিবেন না। পুলিস কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে মন্দির প্রবেশে বাধা দেওয়াতে, সরকারের যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় হউক, উহার প্রতিবাদ করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হইবে না।

লাট সাহেব হয় ত ভাবিয়াছেন কিংবা হয় ত তাঁহার পরামর্শদাতৃগণের সুপরামর্শে বুঝিয়াছেন যে যখন রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছে, তখন সত্যাগ্রহীদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা রিসিভার বা আইন আদালতের ধার ধারে না এবং তাহারা জানে দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে যাহার অর্থ আছে—পরিণামে আদালতে তাহার পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ লাট সাহেব সত্যাগ্রহ কথার অর্থ অবগত নহেন। যদি জানিতেন, এই আন্দোলনের উপর এ ভাবে কটূক্তি বর্ষণ করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিতেন।

লর্ড লিটন বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, আমার মতে তাহা দেশবাসীর পক্ষে বড়ই অপমানের কথা। আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা যেন মুক্তকণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত বলেন, আমরা আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ হস্তক্ষেপ চাহি না—তাহা সে হস্তক্ষেপকারী যত বড় লোকই হউক না কেন?

(সন ১৩৩১, ২২শে আষাঢ় রবিবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লর্ড লিটনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ প্রকাশ করেন।)

মির্জ্জাপুর পার্কে বক্তৃতা

কংগ্রেস তারকেশ্বর আন্দোলন-ভার গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণসভা কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কেন? কংগ্রেস কি হিন্দুরও প্রতিষ্ঠান নহে? দেশবাসীর ধর্ম্মের সহিত কংগ্রেসের কি কোনই সম্পর্ক নাই? কংগ্রেস কি হিন্দু ছাড়া? তারকেশ্বরের আন্দোলন-ভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? ব্রাহ্মণসভা বলিয়াছেন আমি হিন্দু নই, হিন্দুর ধর্ম্মান্দোলনের পরিচালনভার গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই। আমি বলিব আমার হিন্দুত্ব মারে কে? যাঁহারা আজ হিন্দুত্বের, ব্রাহ্মণত্বের বাজে বড়াই করেন, কই তাঁহারা ত এ আন্দোলনের পরিচালভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই?

এ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ ত তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তবে কেন হিন্দুত্বের গৌরব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে তারকেশ্বরে যাইয়া আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন নাই? আমি যে হিন্দু, আজ তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন তাঁহারা আজ তীর্থস্থানকে অত্যাচারের কবলমুক্ত করিবার জন্য যে শাস্তি বরণ করিবেন আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি বরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আজও যদি তাঁহারা এই আন্দোলনের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সানন্দে সে ভার তাঁহাদের করে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছে। আজ ব্রাহ্মণ সভা বা যে কোন হিন্দু প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের ভার গ্রহণ করুন, আমি সানন্দে তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কাজ করিব এবং তাঁহাদের আদেশ পাইলে স্বয়ং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আত্মাহুতি প্রদান করিব। আমি মোহান্ত রাখার প্রথা তুলিয়া দিতে চাই বলিয়া চারিদিকে একটা জনরব উঠিয়াছে। এই জনরব একেবারে ভিত্তিহীন। মোহান্ত রাখার প্রথা তুলিয়া দিতে চাই না, আমি চাই—শুধু অত্যাচারী উৎপীড়ণকারী মোহান্তকে দূর করিয়া দিতে—হিন্দুর জন্য পীঠস্থানকে কলুষমুক্ত করিতে। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সাধনার ভিতর যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, সে সমস্তের উপর অন্য কাহারও অপেক্ষা আমার কম সহানুভূতি নাই। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জীবন্ত সত্য। লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হিন্দু মাত্রেরই আছে। ব্রাহ্মণ

সভার কোন সভ্য কি এ অধিকারকে অস্বীকার করিতে চান? এ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণ সভার কোন সভ্য কি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইতে গিয়াছিলেন? বাঙ্গলার লর্ড লিটন কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, সত্যাগ্রহকে বিদ্রূপ করিয়া অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এমন অযোগ্য শাসনকর্ত্তা সসম্মানে লাটগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করুন। আর হিন্দু, তোমরা যদি লাটের এ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তির অহঙ্কারিতা আত্মম্ভরিতার প্রকৃত উত্তর দিতে চাও ত দলে দলে যাইয়া তারকেশ্বরে গ্রেপ্তার বরণ কর, দেখাইয়া দাও বাঙ্গলার অযোগ্য শাসককে যে, এ আন্দোলন colossal hoax নহে, বাঙ্গলার—বাঙ্গালীর তথা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণের আন্দোলন।

(গত ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩৩১, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মির্জ্জাপুর পার্কে এই বক্তৃতাটি প্রদান করেন।)

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা আমার স্বার্থত্যাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যেটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছি, তাহার তুলনায় দেশবাসীর নিকটে যে ভালবাসা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি, তাহা কি অধিকতর স্পৃহনীয় নহে? তবে আমার স্বার্থত্যাগ হইল কোথায়? কাহার কাহার মতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি পৃথক পৃথক জিনিস—একের সহিত অন্যের কোনই সম্পর্ক নাই, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস ইহারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত—একটাকে অন্যটা হইতে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ইহাদিগকে ভিন্ন রকম বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। আসলে কিন্তু ইহারা এক। একটা অন্যটার উপর নির্ভর করে। ক্রীতদাসের কি সমাজ কিংবা ধর্ম্ম আছে? নিশ্চয়ই না। যাহারা স্বাধীন, তাহাদিগেরই মাত্র ধর্ম্ম বা সমাজ আছে। আপনারা যদি আমাদের ধর্ম্ম কিংবা সমাজকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বাধীন হইতে হইবে। কাজেই আপনি যদি ধার্ম্মিক হইতে কিংবা সমাজের উপকার করিতেই ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি রাজনীতি বাদ দিতে পারেন না। তাই বলিতেছি ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোন্‌টা যে আগে ও

কোন্‌টা যে পিছনে, তাহা বলা দুরূহ। দিন রাত্রির পূর্ব্বাপর ঠিক করা যে প্রকার দুষ্কর, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব কি প্রকারে? উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, দেশবাসীর সম্মুখে যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাদন করিতে হইবে। আপনারা ক্রীতদাস না হইয়া মানুষ হউন। দেশের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্পাদন করুন। স্মরণ রাখিবেন, স্বাধীনতা অর্জ্জন ও দেশের উন্নতির যাহারা পরিপন্থী হইবে সর্ব্বত্র তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কাউন্সিলের মধ্যেই হউক কিংবা বাহিরেই হউক, সে যুদ্ধ আমাদিগকে করিতেই হইবে। কাউন্সিলের কাজের পরিপূরক হইবে—বাহিরের গঠনমূলক কাজ। আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি হইয়াছে একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা। গ্রামে আমরা কি প্রকার কাজ আরম্ভ করিতে পারি, সেই প্রকার কার্য্যপদ্ধতির একটা খসড়া আমি ইতঃপূর্বে সংবাদপত্রে বাহির করিয়াছি। প্রথমে আপনারা কোন জিলার একশতখানা গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ৬।৭ টা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর গ্রামবাসীর দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে আরম্ভ করুন। অল্পমূল্যে তাহাদিগকে তৈল, লবণ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করুন।

(২৪ পরগণা জিলা সম্মিলনের বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিনন্দন পত্রের উত্তরে সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বক্তৃতাটি প্রদান করেন।)

দেশবন্ধুর বক্তৃতা

"আমি একজন আসামী"

অদ্যকার এ সভায় আমার আর নূতন কিছু বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সভাপতি মহাশয় যখন আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি সংক্ষেপে গোটাকয়েক কথা বলিতে চাই। আমি সরকারের একজন নির্ব্বাচিত আসামী! কিন্তু সেজন্য আমি ভয় করি না, সরকারের আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

বিপ্লববাদ কেন হয় ?

বাঙ্গলা দেশে বিপ্লববাদের বিভীষিকা দেখিয়া সরকার যে বে-আইন চালাইয়াছেন, দেশের কয়েকজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে বিপ্লববাদ কেন হয় ? ইহার মূল কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া দেখিয়াছেন কি ? বাঙ্গলা দেশে বিপ্লববাদ আছে এ কথা আমিও একেবারে অস্বীকার করিতে চাহি না, কিন্তু কেন থাকে এই বিপ্লববাদ ? এ কথার উত্তর আর কিছুই নাই, এদেশের একদল যুবকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, দেশকে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহাদের প্রাণে অদম্য আকাঙ্খা দেখা দিয়াছে। সরকার তাহাদের সে আশা-আকাঙ্খাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করিয়াছেন কি ? ভাবিয়াছেন কি কোনদিন—কেন এদেশে বিপ্লববাদ গজাইয়া উঠে ? সে প্রচেষ্টা তাঁহারা কোনদিন করেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের আশা আকাঙ্খাকে দমননীতির প্রয়োগে দমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ দমননীতির ফলে বিপ্লব বিদূরিত হইতে পারে না, জাতির আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করিয়া রুদ্রনীতি প্রবর্ত্তন করিলে তাহাতে বিপ্লবের বীজ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে না। দেশবাসীর ভিতর আজ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে উদগ্র আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে—দমননীতির প্রয়োগে তাহা কোন দিন তিরোহিত হইবে না পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। দেশের মুক্তি কামনা ও সাধনা যদি বিপ্লববাদ হয়, তবে সে বিপ্লববাদ প্রশমন করিতে হইলে দমননীতি নহে—চাই স্বাধীনতা, স্বরাজ—স্বায়ত্ত-শাসন।

দমননীতি ও অসহযোগ

বাঙ্গলায় নূতন করিয়া এই যে দমননীতি আরম্ভ হইয়াছে ইহা নূতন নহে—বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত দমন নীতির অপ্রচুরতা ত কোনদিনই দেখা যায় নাই। যখনি দেশবাসী একটু সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রাণে দেশ-মাতৃকার মুক্তিকামনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তখনি ব্যুরোক্রেসীর দল কঠোর হস্তে

রুদ্রনীতি চালাইয়াছেন। রাউলাট আইন, প্রেস আইন, রাজদ্রোহ, সভা বন্ধের আইন, প্রভৃতি নিত্য নূতন দমননীতিমূলক আইনের উদ্ভব হইতেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও সরকার দমননীতি চালাইতে কসুর করেন নাই, কিন্তু তাহাতে অসহযোগ ধ্বংস হইয়াছিল কি? আপনারা হয় ত বলিবেন অসহযোগের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে—কিন্তু আমি বলি, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব একটুও কমে নাই—কমিতে পারে না। অসহযোগ আন্দোলন জাতির জাতীয় আন্দোলনের জীবন্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি আজ কেবল রূপান্তরিত হইয়া স্বরাজ্য আন্দোলন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই স্বরাজ্যদল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতি পদে বাধা দান করায় গবর্ণমেণ্ট অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন, তাই স্বরাজ্যদলের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য স্বরাজ্য-দলকে ধ্বংস করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবের অজুহাত দেখাইয়া আবার দমননীতি চালাইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু স্বরাজ্যদলের প্রভাব ইহাতে নষ্ট হইবে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই দমননীতিও তোমরা এতদিন চালাইয়া আসিতেছ, কিন্তু তাহাতে এ জাগরণের স্পৃহা—স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে কোনদিন দলিত করিতে পারিয়াছ কি? পারিয়াছ কি কোনদিন বাঙ্গালীকে জাতীয় আন্দোলন হইতে পশ্চাৎপদ করিতে?

কি ফল লভিলে হায়!

এই যে বিপ্লব দমনের অছিলায় তোমরা বাঙ্গলা দেশটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিলে, এক কলিকাতা সহরেই ৫৪খানা বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিলে—জিজ্ঞাসা করি, এ তল্লাসীতে তোমরা বিপ্লবের নিদর্শন কি পাইয়াছ? গোলাগুলী, বোমা-বারুদ ত দূরের কথা একখানা ছোট খাটো অস্ত্রশস্ত্রও কোথাও পাইয়াছ কি? কি প্রমাণে তোমরা বিপ্লববাদের নিদর্শন দেখাইতে চাও? ৫৪খানা বাড়ী উলট পালট করিয়া তোমরা লইয়া গিয়াছ কি? না দু'চারখানা বোলশেভিকদের ইতিহাসাবলি। বোলশেভিকদের এই ইতিহাসই কি বাঙ্গলার বিপ্লববাদের নিদর্শন? যাহাদের সহিত আজ তোমরা সখ্যতা ও সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাদের ইতিহাস পাঠ করিলেই কি

অমনি বিপ্লব জাগিয়া উঠিবে? তোমরা যাহার সহিত মিতালী করিতেছ তাহাদের ইতিহাস পাঠ করাও কি আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? আর এই যে সারা বাঙ্গলা দেশটাকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বিপ্লববাদী সন্দেহে ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছ—যদি এদেশে প্রকৃত বিপ্লববাদীই থাকে, তাহা হইলে এই ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করিলেই কি তাহা প্রশমিত হইবে?

ভয় করি না চোখ রাঙালে।

মোট কথা, দমননীতির সে চক্র তোমরা যতই চালাও না কেন, দেশবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে প্রশমিত করিতে পারিবে না—জাতির আশা আকাঙ্খাকে দাবাইয়া দমাইয়া রাখিতে পারিবে না। ৭০ জন কেন সমস্ত বাঙ্গলার যুবকগণকে গ্রেপ্তার করিলেও এ আন্দোলন বন্ধ হইবে না। কর না তোমরা যত পার গ্রেপ্তার, জেল খাটিতে বা জেলে যাইতে বাঙ্গালীর ছেলে আর ভয় পায় না, আর ভয় পায় না তোমাদের ঐ দমননীতির হুমকিতে। আজ তাহাদের ভিতর প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। দেশের মুক্তি কামনা যদি বিপ্লববাদ হয় তাহা হইলে সে বিপ্লববাদী নয় কে? আমি নিজেও তাহা হইলে একজন বিপ্লববাদী—আমাকে তোমরা একজন আসামী সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছ, আমি ত সেই জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

জাগিয়ে দে মা জাগিয়ে দে।

দেশমাতৃকার মুক্তি কামনার জন্য দেশবাসীর ভিতর এই যে স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, ব্যুরোক্রেসীর আমলাতন্ত্রের রুদ্রনীতিতে সে স্পৃহা প্রশমিত হইবার পরিবর্ত্তে অধিক বলবতী হইয়াই উঠিতেছে, সে স্পৃহা একদিন না একদিন ফলবতী হইবে। জানি না তত দিন বাঁচিয়া থাকিব কি না, কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সাফল্যের সে দৃশ্য যেন দেখিয়া যাইতে পাই।

জগজ্জননী মা! জাগিয়ে দে মা জাগিয়ে দে। বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্খা জাগিয়াছে তাহাকে আরও দ্বিগুণতর করিয়া জাগিয়ে দে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

যদিও আমি বাজেট আলোচনার শেষদিনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি, তথাপি লম্বা বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার্থে কতকগুলি কার্য্যকর পরামর্শ দেওয়া। আমার কার্য্যের সমালোচকগণ বলেন যে, আমি ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রধান সংহারকর্ত্তা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যাঁহারা রাজনীতি লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করেন, তাঁহারা কখনও এই প্রকার উক্তিতে প্রতারিত হইবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কখনও ধ্বংস ব্যতীত কি পূর্ণ গঠন হওয়া সম্ভব? আমি গঠন করিতে চাই বলিয়াই ধ্বংস করিতে চাহিতেছি। আমি সহযোগে বিশ্বাস করি বলিয়াই অসহযোগী হইয়াছি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, এদেশে প্রথমে অসহযোগ আরম্ভ না করিলে সহযোগ করা অসম্ভব। এখন সরকারের সহিত সহযোগ করা ঠিক প্রভুর সহিত ভৃত্যের সহযোগ করা। তাহা কখনই অভিপ্রেত নহে। বন্ধু প্রভাসচন্দ্র মিত্র সেদিন বলিলেন যে, যখন তিনি মন্ত্রি ছিলেন, তখন অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় সরকার আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। সরকারের যদি ইহা অভিপ্রেত হয় যে, জনসাধারণ তাঁহাদের সহিত সহযোগ করুন, তাহা হইলে সরকারকে সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের দাবী ও অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সরকার যখন আমাদের এই সমস্ত ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করিতেছেন, যখন এই দেড়শত বৎসরেরও অধিক আমাদের অর্থ লইয়া খেলা করিতেছেন, তখন সে সরকারের সহিত সহযোগ করা অসম্ভব।

আমি কার্য্যকর প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহি, কিন্তু শরীর কম্পিত হইতেছে—সরকার এখনও আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত বৃটিশ শাসনের ইতিহাস কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ইতিহাস।

তারপর বাজেট সম্বন্ধে কথা। যতদূর আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে নূতন ট্যাক্সে সরকার ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেদিন বলিয়াছেন যে, সরকার ঐ টাকা হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য ব্যয় করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমরা সে দিন শুনিলাম যে, ঐ টাকা হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য নহে—উহা অন্য কাজে ব্যয়িত হইবে। আমার

ইচ্ছা—সরকার যদি উহা অপব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা উহার দুই তৃতীয়াংশ অপব্যয় করুন ও বাকী এক তৃতীয়াংশ হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য ব্যয় করুন। সরকার যদি শতকরা ৬ টাকা সুদে ৫ কোটি টাকা ধার করেন এবং ব্যবস্থামত প্রতি বৎসর সুদ দিয়া যাইলে ২০ বৎসরে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ঐ টাকা হইতে ১ কোটি টাকা শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারেন। যদি ১ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, ৩০ লক্ষ মুসলমানদের বিশেষ শিক্ষার জন্য, ৩০ লক্ষ তথাকথিত অনুন্নত জাতির শিক্ষার জন্য, (আমার মতে তাহারা অনুন্নত নহে, তাহারা সরকারের দ্বারা প্রপীড়িত), ১ কোটি গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য, ১ কোটি ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের জন্য, এবং ৪০ লক্ষ টাকা কৃষি-কর্ম্মের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু সরকার কি তাহা কখনও করিতে রাজী হইবেন? আমার বিশ্বাস ইহা কখনই কার্য্যে পরিণত হইবে না। জাতি-গঠন বিভাগ আমাদের হাতে দিয়া বলা হয় যে, আমরা স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছি। কিন্তু ইহা কি প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন? জাতি-গঠন বিভাগে সরকার কি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন? যাহা হউক, আমি উক্ত টাকা সরকারকে ধার করিতে পরামর্শ দিই।

(গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ কটনের সভাপতিত্বে বাজেট আলোচনা সম্বন্ধে এক সভা হয়। উক্ত সভায় মাননীয় সভাপতির অনুরোধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বক্তৃতা করেন।)

ভারতের আহ্বান

ভারতের যে বাণী—সে বাণী সমস্ত পৃথিবীর। ভারতে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তারা সে বাণী পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করবে—তার জন্য ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে, তার জন্য যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে। তারই জন্য বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পাবে কি না পাবে সকলে আজ ছুটে আসছে। আমাকে ভারতের ইতিহাস ডেকেছে। যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে—সে শঙ্খধ্বনি তোমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ। আমি কেহ নই। আমি কে? আজ আমি সামান্য কর্ম্মীমাত্র—তোমাদের সেবক,—তার বেশী অহঙ্কার আমার

নাই। তোমাদের সেবায়—আমার স্বদেশবাসীর সেবায়—আমি আজ কর্ম্মে নিযুক্ত। কাল হয় ত ভগবৎ কৃপায়—এমন অবস্থা হবে—আমি আর সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারবো না। আমাকে এখনই হয় ত তিনি অন্ত কোন জায়গায় সরিয়ে নেবেন, নয় ত আমাকে মরণের দেশে যেতে হবে।

এই যুগধ্বনি তোমাদের প্রাণে বেজেছে! একবার ধ্যান কর—একবার চোখ বুজে মনের মধ্যে চক্ষুকে তাড়িত কর—দৃষ্টিকে পাতিত কর, তখন দেখতে পাবে কি? দেখতে পাবে শুনতে পাবে কি? যা দেখবে তাই শুনতেও পাবে। মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আলোক ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে—সেটা দেখবার জিনিস—সেটা শুনবার জিনিস—সেটা বুঝবার জিনিস। ইন্দ্রিয়ের ভোগ সেখানে নাই। সেখানে তোমাদের দেখা, শোনা, আস্বাদকরা, পান করা সব এক কথা। সেখানে এই পঞ্চেন্দ্রিয় এক,—একই আধার সে কি? মুক্তি। সে কি? ধ্যান। সে সব—সে সন্ধ্যার মন্ত্র, জীবনের সব। সেটা দেখতে হবে, দেখতেই হবে, কেউ কারো ছেড়ে নয়। আজ যে ঘৃণা করে, মানুষকে বঞ্চিত করে বলে সব বাতুল—কাল তাকেও আসতে হবে। যুগ-শঙ্খ বেজেছে। এ যুগে ভারতে এমন নরনারী থাকতে পারে না যে বিধাতার যুগশঙ্খ ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করবে। তাকে শুনতে হবে—আজ না হয় কাল। লীলাময়ের সময়ের ত অন্ত নাই। আজ না হয় দু'দিন পরে শুনতে হবে—দেখতে হবে, ওরূপ দেখতে হবে! মনকে বাঁধতে হবে, মনের সেতার ঐ সুরে বাঁধতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই যে প্রেমের বন্যা—এতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কে ছুটবে বল। যদি আমি প্রাণ দিতে পারি—কে ছুটবে বল। বিশ্ব আর তাকে কি আবদ্ধ করতে পারবে। বিধাতা যদি সে প্রেম আমার হৃদয়ে দেন, আমি যদি সে প্রেম ঢেলে দিতে পারি, যতই যুক্তি কর, তর্ক কর—থাকতে পারবেনা। পথে বেরুতে হবে। দেখতে পারছনা ভগবানের দুই বাহু সমস্ত দেশকে ঘিরে রেখেছে। দেখতে পারছনা? —চোখ খোল—অন্ধের মত থেকনা! ধ্যানে শুনতে পাওনা? দৃষ্টিহীন, সাধনাবিহীন চোখ বুজে ভগবানের কৃপাভিক্ষা কর। দিনের পর দিন যুক্তি তর্কের মধ্যে বদ্ধ-জীবের মত আবদ্ধ থেকনা। মনটিকে খুলে দাও—আকাশ বাতাসের স্পর্শ নেও। সাধনাতে স্পর্শ কর। দেখবে সব বন্ধন টুটে যাবে। একথা আমি অহঙ্কার করে বলছিনা। আমার কিছুই নাই। ভগবৎ প্রসাদে একথা বলবার অধিকার ভগবানই আমাকে দিয়েছেন। আমার আর বাহ্যিক কোন বস্তুর আকাঙ্খা নাই।

যে স্বাধীনতার বাণী ভগবৎ কৃপায় আমি শুনেছি—তাতে নিজেকে স্বাধীন করেছি—আমার স্বরাজ আমি পেয়েছি। ভাইরে; মনে করোনা আমি অহঙ্কার করে বলছি। যদি অহঙ্কার করে বলি—তবে আমার মাথা তোমার পায়ে ছোঁয়াই। আমি অবনত মস্তকে তোমার পায়ের স্পর্শ নেব।

আজ আমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে সেইটাই আমি বলছি। ইচ্ছা করে আমার সমস্ত ভাইদের দুই হাত আমার বুকের উপর রেখে সেই অনুভূতি তাদের দিই। সত্য মিথ্যার কথা বলছি না। আমি স্বরাজ পেয়েছি—আমার ভাবনা নাই—ভয় নাই। আমি যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে এই স্বরাজের আকাঙ্খা বাঙ্গলার সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে জাগাতে না পারি ততদিন আমার বিশ্রাম নাই—আমার বিরাম নাই। এ কাজ করতে হবে। যদি আমি অক্ষম হই—বিধাতার ইচ্ছায় যদি আমার চেয়ে আর কেহ বেশী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, আমি সরে যাব। আমি মাটিতে নুয়ে থেকে ধূলায় লুণ্ঠিত হব। কিন্তু ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে চরণ স্পর্শ করে যতদিন পর্য্যন্ত না এই স্বরাজের স্বাধীনতার বার্ত্তা দেশে আমার ভাই বোনদের মনে না জাগাতে পারব ততদিন আমার বিরাম নাই।

বিবিধ

সম্পাদকের নিবেদন

'নারায়ণ'—৫ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া আসিতেছি। অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ বাদানুবাদের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এই কালের মধ্যে বাঙ্গলায় সাহিত্য ও জীবনে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে। নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও বাঙ্গলা আবার তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চক্ষু হইতে মোহের অঞ্জন এখনও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। এই ঘনান্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা এখনও আমাদের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিতেছে। তথাপি আশা হয় এ মোহ কাটিবে, বাঙ্গলা একদিন তাহার

স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। বাঙ্গালী তাহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া,—জীবনে ও সাহিত্যে নব নব রূপের সৃষ্টি করিতে পারিবে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে আমরা স্ব-ভাবে ফিরাইয়া আনিতে চাহি। কৃত্রিমতা ও সর্ব্ব প্রকার পরানুকরণের মোহ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে, আমাদের জীবনকে বিষে জর জর করিয়া দিয়াছে। বিষ পরিপাক হয় না। পাশ্চাত্যের বিষ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই এই শ্রেণীর সাহিত্য ও জীবনকে আমরা 'নারায়ণে'র পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই। আমাদের জীবন স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া না আসিলে, সাহিত্য কি করিয়া স্বাভাবিক হইবে? সাহিত্যও জীবন ছাড়া নয়। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনকে তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিয়া দিবে, এতবড় জীবন ত আর দেখি না। তথাপি আমাদের ভিতরে ও বাহিরে এই নব জাগরণের চাঞ্চল্যকে অস্বীকার করিব কিসের স্পর্দ্ধায়? কেহ আসিবেন—কিছু ঘটিবে, যাহাতে বাঙ্গলার স্ব-রূপ রূপে ও সুরে আবার দেখা দিবে। এই আশায় এই অকিঞ্চনেরা সাহিত্যের তপোবনের এক পার্শ্বে বসিয়া সন্তর্পণে অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের সেবায় যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে,—ত্রুটি হইয়াছে জানি,—তবে তা'র জন্য আজ নূতন বৎসরের আরম্ভে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যাঁহারা আমাদের মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর যাঁহারা ধর্মবুদ্ধিতে সময় সময় আমাদের আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিকটেও আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। কেননা, তাঁহারা আমাদিগকে আরও নানাদিকে চিন্তা করিবার জন্য সহায়তা করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে যত বড় বড় যুগ-বিপর্য্যয় দেখা গিয়াছে—সেই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালী-প্রধানেরা কখনই আত্মহারা হন নাই। তাঁহারা বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম্মরূপ পরশমণির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সঙ্কট হইতে জাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরাও বাঙ্গালীকে আজ এই দুর্দ্দিনে সেই পরশমণির পরশ. ভিন্ন আমাদের বাঁচিবার আর পথ কি? 'নারায়ণ' আমাদিগকে সেই পথে চালিত করুন! আমরা যেন মরিতে মরিতেও এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই।

রাজা রামমোহন রায়ের

"তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন"

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার সংস্কারে হাত দিবার কিছু কাল আগে, সম্ভবতঃ যখন রঙ্গপুরে বাস করিতেন, তখন 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনা করিয় প্রচার করেন। গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায়, আর ফারসী ভাষায় তাহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কেননা আজাম প্রদেশের অধিবাসীগণ ওই ভাষা বেশী বুঝিতে পারে। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণবাবুর অনুরোধে মৌলবী ওবায়েদ উল্লা মহোদয় এই গ্রন্থ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিয়াছেন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণগণ গত এক শতাব্দীরও বেশী এই গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদের কোন প্রয়োজনই দেখেন নাই, অথচ এই গ্রন্থ লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানা বিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরোধী দলের পরস্পর মতের বিভিন্নতার মাঝে একদল বলেন যে, ইহাই রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাঁহারা আরো বলেন যে, রাজা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদের প্রমাণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে আবার কেমন করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সেই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য ত বটেই বরং দুঃখের কথা এই যে 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীনের' অত্যুন্নত যুক্তিবাদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, রাজা শাস্ত্রালোচনার কালে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অধিকতম উন্নতিশীলদল এই গ্রন্থের যুক্তিবাদকেই ধর্ম্মসংস্থাপনের ভিত্তি করিয়া, রাজা পরবর্ত্তী যে শাস্ত্রমীমাংসা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আর একদল বলেন, ইহা রাজার মানসিক ইতিহাসের একটা ধাপমাত্র, রাজা এই যুক্তিবাদ ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত—এই গ্রন্থ রচনার সময়ে রাজার মনের ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নাই, পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রমীমাংসায় যাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের উভয় দলের অভিমত সম্বন্ধেই আমরা কোন বিশেষ বিচার না করিয়া, বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্যই ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

অনেক ব্রাহ্মসাহিত্যিকগণ এমনও বলেন যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অল্পবয়সে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্মজীবনের বিকাশে তাঁহাদের উভয়েরই অনেক বিভিন্নতা ও মতান্তর দেখা গিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায়ের তাহা হয় নাই। আমরা কিন্তু দেখিতেছি ও পরস্পর-বিরোধী দুই দলের উক্তিতে ইহাই বুঝিতেছি যে, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-জীবনের ইতিহাসে উন্নতি ও অবনতির বিরাম ও অবসর আছে।

আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, রাজা রামমোহনের গ্রন্থাদি ও তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ আলোচনা বাঙ্গলা দেশে অতি অল্পই হইয়াছে।

অনেক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর মতে বর্ত্তমান যুগ—রামমোহন যুগ। সেই জন্য রাজা রামমোহনের জীবন ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই বিশেষরূপে আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান যুগ বাঙ্গালীর কাছে এক মহা সমস্যার মত দাঁড়াইয়াছে। এই যুগের যে বিশিষ্ট সাধনা, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণের যোগ আছে, কি নাই, কি কতটা আছে, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। —**নারায়ণ সম্পাদক**

নারায়ণ—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা [অগ্রহায়ণ, ১৩২৬]

বঙ্কিম-প্রতিভা

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এক জন ব্যক্তি নহেন—যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিমসাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নামগন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comteএর Positivism থাকিতে পারে। Europeএর দুর্দ্ধর্ষ Nation idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাচিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপকাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ক্রটি থাকিতে পারে—পারে কি, হয় ত আছে; কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—যে

অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শের, এমন কি, ভ রতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europeএর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম-সাহিত্য—আত্মস্থ, সমাহিত, তেজঃপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্রবিশেষ।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক, বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই য়ুরোপের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গলার—এমন কি, জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই, যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক-নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক রচয়িতৃগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে, তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা লইতেছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপ্রয়োগ হউক—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গলায় তাহাই করিয়াছে—যাহা ফরাসীদের Voltaire, Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে কেহ শীঘ্রই লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন না, আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গলায় Voltaire ও Rousseau.

বিয়োগে

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি তাঁহাকে ইহলোকের সামান্য সম্বন্ধের সূত্রে জড়াইব না। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার অপমান করিব না, পিতা পুত্র বা স্বামী বলিয়া তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া গৃহের কোণে টানিয়া আনিব না। আজ তাঁহাকে অনুভব করিব, তাঁহার প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিব; আজ তাঁহাকে অনন্তলোকে সর্ব্বচরাচরে ব্যাপ্ত দেখিব। আমরা কাঁদিব না; অশ্রুসিক্ত মলিন নয়নে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ, সামান্য অভাব বড় করিয়া তুলিলে সেই অনন্ত অমর, অবিনাশী আত্মার সন্ধান পাইব না। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ' এই যে অব্যয় অনন্ত মুক্ত আত্মা, আমাদিগের শোক-দুঃখ-জরাবেষ্টিত মৃত্যুভয় জড়িত খেলাঘরে আবদ্ধ হইব না। আজ প্রাণকে প্রশস্ত করিতে হইবে; হৃদয়কে শান্ত করিতে হইবে এবং সুখ দুঃখের শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া অনন্ত আনন্দময়ের আনন্দলোকে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।

মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে কি কাড়িয়া লইয়াছে? যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম, তিনি আজ স্পর্শাতীত হইয়া গিয়াছেন। বিপদে পড়িলে যাঁহার কাছে আসিতাম, আজ ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাই না; খুঁজিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যে ঘরে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতাম সে ঘর আজ শূন্য বলিয়া বোধ হয়। যে গৃহ সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল সে গৃহ আজ মলিন। দিবস শেষে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যাঁহার কোমল বাক্যে স্নেহদৃষ্টিতে শরীর মন জুড়াইয়া যাইত, আজ তিনি আমাদের নয়নাতীত, শ্রবণাতীত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ শুধু আমাদের স্বার্থের ক্রন্দন, শোকের অধৈর্য্য, ক্ষুদ্র অন্তরের আত্মঅভিমান। শান্ত মনে শুদ্ধচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, মৃত্যু লইয়াছে দুদিনের সুখ, সামান্য স্নেহ, ইহলোকের ক্ষণিক আশ্রয়, দৃষ্টির আরাম, স্পর্শের আরাম। কিন্তু মৃত্যু দিয়াছে কি? সত্যের আনন্দ, বিশ্বাসের বল, এবং অনন্তের জ্ঞান। যাহা কিছু মিথ্যা তাহা সরিয়া গিয়াছে, যাহা সত্য তাহা সম্মুখে আসিয়াছে। যাহা ছোট ছিল তাহাকে বড় করিয়াছে। যাহাকে মলিন করিয়া ধরিয়াছিলাম তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত জীবন হইতে অনন্তলোকের আভাসগুলি একত্র করিয়া

আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। সেই যে সকল কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখা, সেই যে জীবনের কাজকেই বড় করিয়া আপনাকে ছোট করিয়া ধরা, সেই যে দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ আড়ম্বরহীন স্বার্থশূন্য জীবন, সেই জীবনের প্রতি কাজের নিগূঢ় সত্য ও অনন্ত মহিমা—আজ আমাদের প্রাণে কেমন পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাকে সাংসারিক সম্বন্ধ দ্বারাই শুধু চিনিতাম, যিনি আত্মীয়তা বান্ধবতার গণ্ডীতে শুধু আবদ্ধ ছিলেন, যাঁহার স্নেহপ্রেম দয়াদাক্ষিণ্য আমাদের একমাত্র বন্ধনের সূত্র ছিল, জীবিত অবস্থায় যাঁহাকে মোহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মৃত্যুতে সে আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে ; আজ তাঁহার পিতৃত্বে জগৎপিতাকে দেখিতেছি, তাঁহার পতিত্বে জীবনস্বামীকে দেখিতেছি, তাঁহার স্নেহ মমতায় সেই বিশ্বপ্রেমের আস্বাদ পাইতেছি। তিনি যে জীবনে সকল বন্ধনের ভিতর দিয়া সকল সম্বন্ধের মধ্যে সেই অনন্ত সম্বন্ধ উপলব্ধি করাইতেছিলেন এতদিন তাহা বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি, মানব-জীবন মাত্রই অসীমের পূজা। সে জীবনের প্রতি কার্য্য, প্রতি অনুষ্ঠানের দ্বারা নীরবে সেই মহাপুরুষের পূজা করি। জীবনের সকল কর্ম্ম, সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই অনন্তের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। পূজা অন্তে ভক্ত যেমন নির্ম্মাল্যের ডালি মন্দিরের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেবতার চরণে প্রণাম করেন, তেমনি মানবজীবনের কর্ম্ম অন্তে আপনার দেহ বর্জ্জন করিয়া নূতন লোকে নূতন কর্ম্মের মধ্যে নূতন পূজার আয়োজন করিতে চলিয়া যায়।

এতদিন এই মহান সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এতক্ষণ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার স্বামী, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, এইরূপে তাঁহাকে স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম এবং আপনারাও বাঁধা পড়িয়াছিলাম। আমাদের জীবনে অনন্তের আহ্বান শুনিতে পাই নাই। সেই জন্যই তাঁহার জীবনে অনন্তের আভাস লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কোন ভাল কাজ করিলে মনে করিতাম, আমাদের আত্মীয় ভাল লোক, অমনি গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইত। আদর পাইলে মনে করিতাম, কত ভালবাসেন, যত্ন পাইলে মনে করিতাম, কি কোমল স্বভাব! আমাদের কত যত্ন করেন! একথা কখন মনে করি নাই যে এই স্নেহ ভালবাসার কোমলতা স্বার্থহীনতা—ইহার সহিত অনন্তরাজ্যের নিত্য সম্বন্ধ—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আমাদের জ্বালাইয়া উর্দ্ধমুখীন সে অমর আত্মা আপনার মহিমা নিঃশব্দে অলক্ষিতভাবে বিস্তার করিতেছিল। আমরা মোহে অন্ধ, তাই দেখিতে পাই নাই। এত দিন যাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, মৃত্যু

তাঁহাকে আজ চিনাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু এ কাহার বিধান? মৃত্যুর ভিতর অমর আত্মার সন্ধান এ কাহার লীলা? দুঃখ শোকের ভিতর আনন্দস্পর্শ! এ কাহার করুণা? যিনি মঙ্গলময় বিধাতা, সকল মঙ্গলের আকর, সকল বস্তুর সার, সকল প্রশ্নের উত্তর, সকল আনন্দের ভিত্তি, সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষই আমাদের মৃত্যুর ভিতরে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বব্যাপী অনন্ত আনন্দমূর্ত্তির ভিতর আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি, তাঁহাকে পূর্ণতরভাবে দেখিতে পাইতেছি।

হে পরলোকবাসি, মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও তোমার মুখে কোন ভীতির চিহ্ন দেখি নাই। তুমি বীরের ন্যায় অকাতর চিত্তে শান্ত মনে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলে! তুমি কোথায় আছ জানি না, কোন লোকে আজ তোমার বিজয়নিশান উড়িতেছে আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু তুমি আছ, তাহা জানি। যে অনন্ত সত্বায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, যে অনন্ত সত্বা নীরবে আপন অলক্ষিতে জীবনে উপলব্ধি করিতেছিলে সেই অনন্ত সত্বায় গ্রথিত পুষ্পের ন্যায় বিরাজ করিতেছ। আজ তোমার কাছে, শোক দুঃখের আবেদন লইয়া আসি নাই। আজ তোমাকে ভ্রাতা বলিয়া অবমাননা করিব না। তোমাকে স্বামী বলিয়া, পিতা বলিয়া আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের কোণে টানিয়া আনিব না। হে অমর হে অবিনাশি, তুমি ইহলোকে সেই অনন্ত পুরুষকে ব্যক্ত করিয়াছ! তুমি পরলোকেও সেই মহাপুরুষকে ব্যক্ত করিতেছ। ভগবান তোমার সহায় হউন। আমরা আজ তোমাকে যে নিত্য সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছি, তাহারই উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করি।

হে আনন্দময় বিধাতাপুরুষ, তুমি আজ আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বান

স্বরাজ-সপ্তাহে দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

আমলাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের দেড়শত বৎসরাধিক শাসনের ফলে আত্মবিস্মৃত দেশবাসী আজ মৃতকল্প। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অশন-বসন সর্ব্ব বিষয়ে জাতি পরাধীন। নিজের ঘরের শস্যে তাহার কোন অধিকার নাই—প্রাণ

খুলিয়া মনের দুঃখ প্রকাশেও অনধিকারী—অনাহার, অর্দ্ধাহার, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সহস্রপথে জাতি দ্রুতগতিতে মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারে সক্ষম একমাত্র গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু ব্যুরোক্রেসী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ পরস্পরের স্বার্থ বিপরীত। তাই, এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে—জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে—আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দেশ স্বাবলম্বনের পথে যত অগ্রসর হইবে, ব্যুরোক্রেসী তত কঠোর দমননীতি লইয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইবে। জাতীয় জীবনে যে, নূতন স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেই সরকার অতিশয় বিচলিত হইয়াছে। তাই বাঙ্গলার উপর সরকারের রুদ্রনীতির তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে, বিনা বিচারে তিন আইন ও দমননীতির আর এক অস্ত্র নূতন অর্ডিনান্স আইনে বাঙ্গলার কতকগুলি অহিংসা অসহযোগে কৃতী সন্তানের অবরোধই তাহার পরিচয়। এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে চাই একতা,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি চাই অবলম্বন। যদি সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম্যসমিতি স্থাপন করিয়া স্কুল, চতুষ্পাঠি, মোক্তব, নৈশ বিদ্যালয়, সালিশী, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতঃ সেই সেই গ্রামের চাষ আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, ঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিবাদ বিসম্বাদ দলাদলি মিটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, প্রতি গৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত সূত্রে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উচ্চ নীচের ব্যবধান ভুলিয়া, হিন্দু মুসলমান পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে, তবে সমস্ত স্বাবলম্বী গ্রামগুলির সমবায়ে একটি বিরাট স্বাবলম্বী দেশ তৈয়ারী হইয়া অতি সহজে এই পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের এই প্রচেষ্টাকে আমলাতন্ত্র সরকার নির্ব্বিবাদে সাফল্যলাভ করিতে দিবে না, প্রতিপদে প্রতি কার্য্যে নানা উপায়ে বাধা প্রদান করিবে, তাহার জন্য কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি আমলাতন্ত্র সরকারের সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রগুলিকে দখল করিয়া দেশের কাজে লাগাইয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজেদের জাতির জীবন দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতঃ আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যথেষ্ট একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও অর্থের আবশ্যক।

সমস্ত বাঙ্গলা দেশের গ্রামের সংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না। প্রত্যেক গ্রামেই এক সময়ে কার্য্য আরম্ভ করাও অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক জিলায় অন্ততঃ একশতখানা গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতেই হইবে, চার পাঁচখানি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র করিয়া, এই গ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে কার্য্য করিতে হইলে প্রত্যেক জিলায় প্রথমতঃ অন্ততঃ পক্ষে ২০ জন কর্ম্মী দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মীকে অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি টাকা করিয়া না দিলে তাহার পক্ষে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সমস্ত বাঙ্গলা দেশে এইরূপ ভাবে ৬০০ শত কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইবে—ইহাদের জন্য প্রতিমাসে ১২০০০ টাকা দরকার। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় প্রথমতঃ প্রত্যেক কেন্দ্রেই কিছু টাকা দিতে হইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রত্যেক জিলার কেন্দ্রসমূহের জন্য অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারিলে বাকী প্রয়োজনীয় সব টাকা সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রবাসী স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিবে। এই বিরাট কার্য্যের আরম্ভের জন্য এখনই অন্ততঃ দের লক্ষ টাকা চাই। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক খরচ আছে, সমস্ত খরচের তালিকা এখানে এখন দেওয়া অসম্ভব। মোট কথা—এই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এককালীন তিনলক্ষ টাকা ও মাসিক বিশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে।

উপরোক্তভাবে পল্লীসংগঠনে, নূতন আইনে ধৃত দেশের সুসন্তানগণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণপোষণ—প্রয়োজন হইলে এই বে-আইনি আইনে ধৃতব্যক্তিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থন এবং কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার করিতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠনের অনুকুল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, দুস্থ অসহায় বিধবাগণের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও বহু অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্ত কার্য্য করাই আমার জীবনের ব্রত। সেই জন্য আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ (১লা হইতে ৭ই) আমি **স্বরাজ সপ্তাহ** নামে অভিহিত করিয়াছি, ঐ সপ্তাহে আমাদের কর্ম্মীবৃন্দ প্রত্যেকের নিকট শীলকরা বন্ধ বাক্স লইয়া উপস্থিত হইবে। আশা করি, প্রত্যেক ব্যক্তি জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য—জাতীয় জীবন সংগঠনের উদ্দেশ্যে—অন্ততঃ পক্ষে একটি টাকা দান করিয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইতি—

নিবেদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

১

গান

কেন ডাকো এমন করে
    ওগো আমার প্রাণের হরি,
কেমন করে যাবো বল,
    ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !
প্রথম ডাক বিহান বেলা
শয়ন ছেড়ে চম্‌কে উঠি,
সারারাতের শিশির ধোওয়া
    ফুলের মত থাকি ফুটি।
আবার ডাকো দুপুর বেলা
বিজন আমার আঁধার ঘরে,
পেতে পেতে পাই না তাই—
হৃদয় ছাপি নয়ন ঝরে।
আবার ডাকো সাঁঝের বেলা—
করুণ তব গগন তলে,
পরাণ বেয়ে কি জানি গো—
    চোখের কোণে ছলছলে।
আবার ডাকো আবার ডাকো
    গভীর ঘন আঁধার রাতে,
হৃদয়-ভরা করুণ-ব্যথা
    উছলে উঠে আঁখির পাতে।
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার পাগল করা !
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার সকল হরা !
আবার ডাকো আবার ডাকো
    ওগো আমার পাগল হরি !
কেমন করে যাবো বল
    ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !

২

কীর্ত্তন

ওগো আমার উজল বরণ !
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
আমার মেঘ কাটে না হে !
মনের মাঝে ওই সেজেছে,
কাটে না হে, কাটে না হে
আমি চেয়ে আছি, তোমার পানে
সারা বেলা সকল সাজে !
তবু মেঘ কাটে না হে !
চোখের জলে, চেয়ে আছি
তবু দেখতে পাই না হে !
ওগো আমার উজল বরণ
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
ওই যে তুমি কাছেই আছ
ওই যে তব নূপুর বাজে !
আমার কানের কাছে বাজে হে !
আমার প্রাণের মাঝে বাজে হে !
সকল কাজে সারা বেলা
মনের মাঝে বাজে হে !
ওই যে তুমি কাছেই আছ !
ওই যে তব নূপুর বাজে !
আমি দেখতে নারি শুনতে পাই
ওই যে তব নূপুর বাজে !
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে !
ওগো আমার সোহাগ-রতন !
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
ওগো আমার উজল-বরণ !
একবার তবে দেখা দাও।
আমার মনের মেঘ থাকবে না হে !

ওগো আমার সোহাগ-রতন
একবার তবে দেখা দাও!—
আমি সোহাগভরে ডাকছি কত,
একবার তবে দেখা দাও!
একবার তবে বঁধু বঁধু হে!—
দাঁড়াও এসে চোখের কাছে
বঁধু বঁধু হে, বঁধু বঁধু হে!
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
একবার তবে বঁধু বঁধু হে!
দাঁড়াও তুমি চোখের কাছে।
ওই যে তোমার গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল বনের মাঝে!—
আমার মনের মাঝে হে!
আমার মন-বনের মাঝে।
বঁধু বঁধু হে! বঁধু বঁধু হে!
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।
একবার দেখি বঁধু বঁধু হে!
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!

৩

কীর্ত্তন

এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস আমার সজল আঁখি,
এস এস এস এস হে!

মান ক'রে আর থেক না হে!
ঐ দূরে দাঁড়ায়ে থেক না হে!
ওই যে তোমার সজল নয়ন,
কেমন করে পরাণ রাখি।
এস এস এস এস হে!
এস এস এস এস হে!
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।
সকাল সন্ধ্যা দিবস যামি,
আর কারো পানে চাইনি আমি!—
ওগো আমার আঁধার বরণ,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
বুকের ব্যথা বুকে করে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
এই অনুরাগ চেপে চেপে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
লাজের ভয়ে নীরবে হে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।
এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস তোমায় বুকে রাখি!
(আর) লাজের বাধা মানবো না হে!
এই অনুরাগ চাপ্‌বো না হে,
সকল জীবন খুলে দিব,—
কিছুই আর ঢাক্‌বো না হে!
এস এস এস এস হে!
মান ক'রে আর থেক না হে!
ওই শুন আমার প্রাণের কান্না,
এই হের আমার সজল আঁখি।
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।

৪

অন্ধকারে

কেন মালা এমন ক'রে
আপন হাতে পরাইলে ;—
তোমার ছোঁয়া ফুলের বাসে,
পরাণখানি মাতাইলে।

কেন সেই প্রভাত বেলা,
এমন সুরে গাহিলে,
আমার এই হৃদয় মাঝে,
তারে তারে বাজাইলে !

আমি গরবে হ'নু সারা,
আমি সোহাগে মাতোয়ারা !

আজি এই আঁধার রাতে,
মালার ফুল শুকায়েছে,
তোমার সেই গানের সুর,
কোথায় জানি হারায়েছে !

চারি দিকে অন্ধকার !
সুর-হারা গানের ভার,
কঠিন এক শিলার মত,
চাপ্‌ছে প্রাণে অবিরত।

সুর হারাণ অন্ধকারে,
মরা ফুলের মালার ভারে।

৫

গান

তেমনি করে হেসে হেসে
এস, এস, এস হে!
সকল ব্যথা জুড়িয়ে যাবে
মধুর তব পরশে!
সকল দুঃখ ডুবিয়ে দেব,
নীরব তব হরষে!

চোখের জল ফুলের প্রায়
ঝরবে তব পদ-তলায়!
হাস্‌ব আমি আরো হাস্‌ব
তব হাসির ঢেউয়ে ভাস্‌ব
আমি সারাজীবন ছড়িয়ে দেব
মধুর তব পরশে!
তবে তেমনি করে হেসে হেসে
এস, এস, এস হে!

৬

গান

কোন্ তারেতে বাজবে বল
ওগো প্রাণের বাজনদার!
প্রাণের মাঝে রাখ্‌ব বেঁধে
সইতে তব সুরের ভার!
একটুখানি আভাষ পেলে।
কঠিন কোমল সকল সুরে
ঝরবে তবে মধুর ধার-।

আমি সোহাগ নিব সোহাগ দিব,
ওগো আমার সোহাগ-রতন!
এই যে আমার রাঙা রাঙা
আঁচল-ঢাকা লাজের ফুল
দেয় যে বাধা প্রেমের পথে
হৃদয়ে আনে শতেক ভুল ;
লওগো ছিঁড়ে প্রেমের ভরে,
ওগো আমার প্রেমের জন!
কিসের লজ্জা তোমার কাছে,
ওগো আমার লজ্জা-হরণ!
ঘুচাও সকল সাজ-সজ্জা,
সয়না আর ঢাকাঢাকি
হৃদয়ে মনে সকল অঙ্গে
হোক্‌না প্রেমে মাখামাখি ;
লেংটা মনে লেংটা প্রাণে
দেওয়া নেওয়া মনের মতন!
ভাসা-ডোবা প্রেম-তরঙ্গে,
ওগো আমার হৃদয়-রমণ!

৭

গান

লুকিয়ে কেন পাগল কর
ওগো আমার পাগল করা!
ধর্‌লে কেন পালিয়ে যাও,
ওগো আমার সকল-ধরা!
এই যে ছিলে কোথায় গেলে,
এই যে আছ, এই যে নাই ;
এই যে থামে বাঁশীর ধ্বনি,
এই যে আবার শুন্‌তে পাই।

এবার এলে ছাড়বনা হে,
ধরব প্রাণে প্রাণের ধরা ;
আবার গেলে সঙ্গ নিব,
ওগো আমার সকল-হরা।

৮

লোকে বলে চাই চাই
এরে ওরে তাহারে
প্রাণ জানে কেঁদে কেঁদে
চায় প্রাণ কাহারে !—
সে যে আমার আধেক দেখা
মেঘের মত আঁধারে।
পরশ নিতে পারিনি যে
হৃদয় মন-মাঝারে !
দাঁড়ায়ে সে যে মাঝে মাঝে
ছায়ার মত দুয়ারে !
ধরতে গেলে দেয় না ধরা
মিলিয়ে যায় আঁধারে !
কোথা হতে ডাক যে তবু
কোন্ বনের মাঝারে !
তাই ত প্রাণ দিবস যামি
খুঁজে মরে তাহারে !

৯

অপ্রকাশিত গান

ডাক

কেন ডেকে পাগল কর, ওগো আমার প্রাণের হরি !
কেমন করে যাব বল, ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !

প্রথম ডাক বিহান বেলা
শয়ান ছেড়ে চম্‌কে উঠি।
সারা রাতের শিশির-ধোয়া
ফুলের মত থাকি ফুটি!
আবার ডাক দুপুর বেলা
বিজন আমার আঁধার ঘরে!
পেতে পেতে পাই না, তাই
হৃদয় ছাপি' নয়ন ঝরে।
আবার ডাক সাঁঝের বেলা
করুণ তব গগনতলে!
পরান বেয়ে কি জানি গো
চোখের কোণে ছল ছলে॥
আবার ডাক আবার ডাক
গভীর ঘন আঁধার রাতে
মরম ভরা করুণ ব্যথা
উছলে উঠে আঁখির পাতে!
আবার ডাক আবার ডাক,
ওগো আমার পাগল করা,
আবার ডাক আবার ডাক,
ওগো আমার সকল হরা!
আবার ডাক আবার ডাক,
ওগো আমার পাগল হরি।
কেমন করে যাব বল
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি!

১০

কোথা তুমি?

এই তো বুঝি সন্ধ্যা হলো—
কোথা তুমি প্রাণেশ আমার!

এই তো আমি কুঞ্জে বসে,
কোথা তুমি প্রাণাধার !
এই তো আঁখি চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে অনিবার !
সারা দিনের পথ চাওয়াতে
আঁখি বুঝি হলো আঁধার !
চাইলে তোমা দেখতে নারি,
শক্তি নাই দেখিবার ।
সকল আশা বিফল হলো,
জীবন হলো অন্ধকার !
ঘুচাও তুমি আঁখির ঘোর,
এস কাছে প্রাণ আমার
সকল আঁধার আলো করে
ফুটে ওঠ প্রাণাধার !

১১

গান

বসনের ভার সইতে নারি,
ঘুচাও হরি ! আবরণ !
সকল অঙ্গে চাই যে পরশ,
ওগো আমার পরশ-রতন !
আজ আমায়ে লেংটা কর,
ওগো আমার প্রাণের ধন !
